নবম দশম

১৬ জুন ১৯৮১

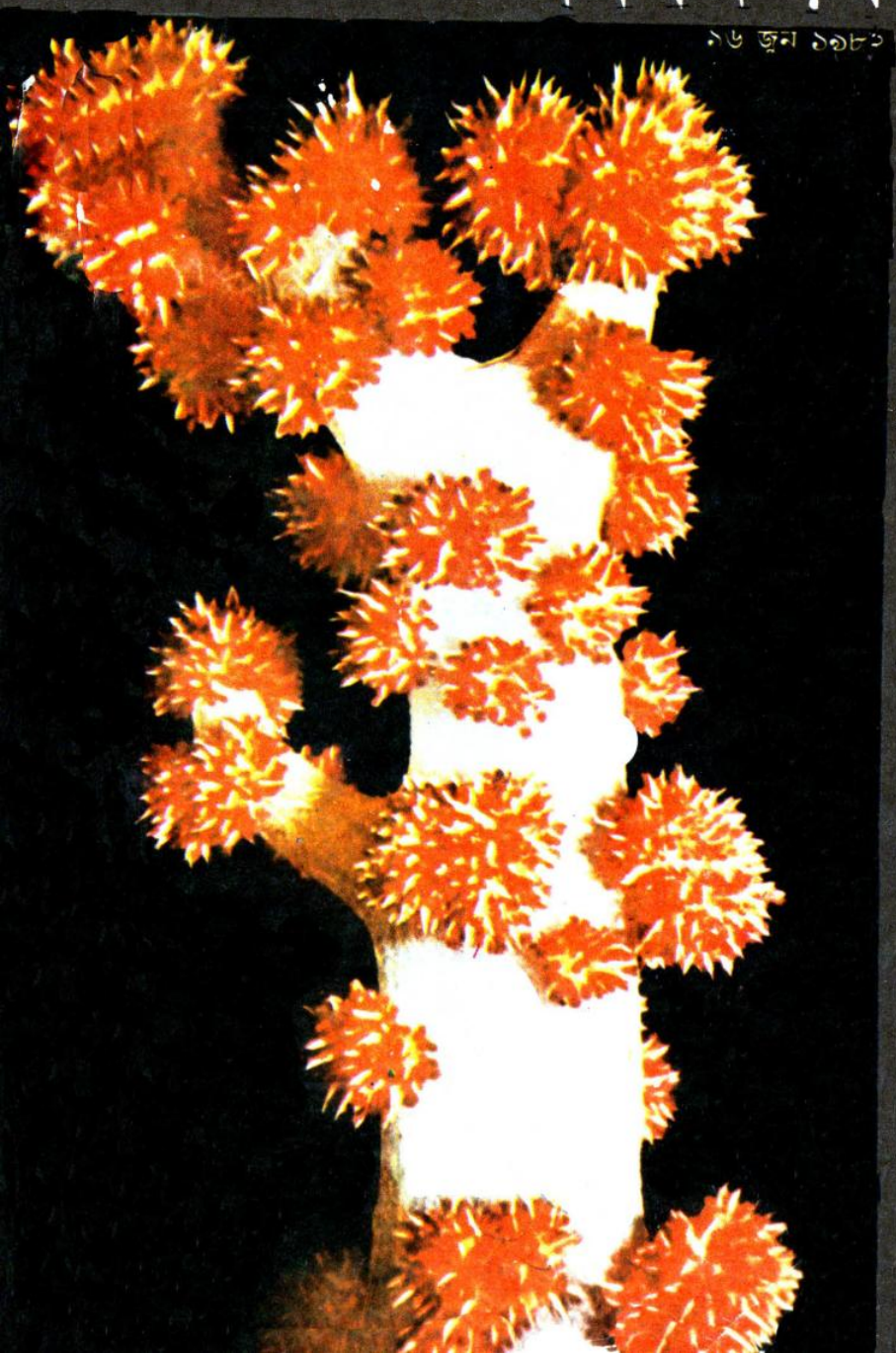

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : অনির্বাণ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

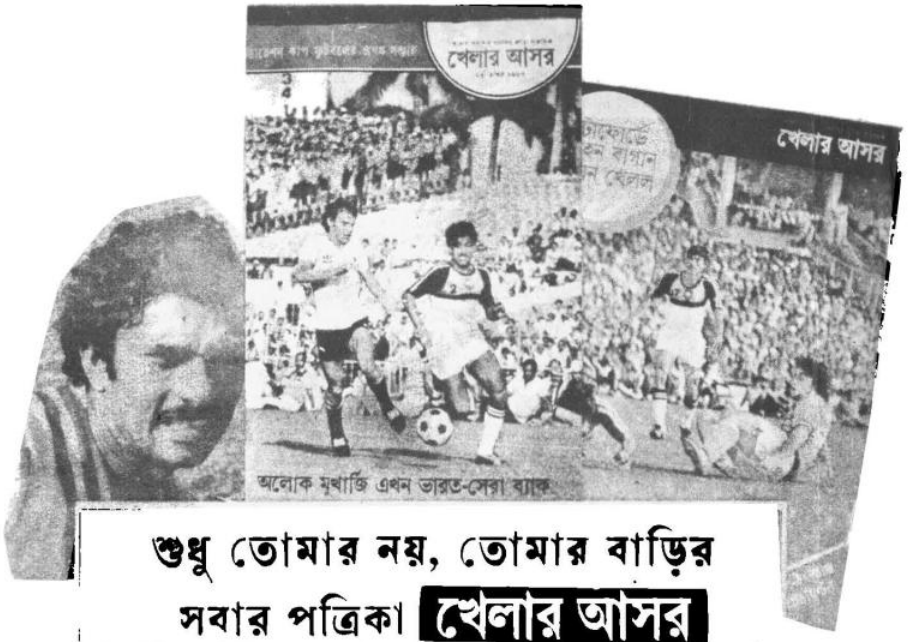

শুধু তোমার নয়, তোমার বাড়ির সবার পত্রিকা **খেলার আসর**

কলকাতা ময়দানে যত খেলাই হোক, ফুটবল বিশেষ করে কলকাতা লিগ ফুটবলে যত উত্তেজনা এমনটা আর কোন খেলায় হয় কি ? মে মাসের প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করে দুপুর থেকেই কলকাতা সরগরম। কিন্তু সে উত্তেজনার আঁচ তো পায় কেবল কলকাতার দর্শক। অথচ কলকাতা আর কতটুকু, সারা দেশ জুড়ে রয়েছে অগণিত ফুটবলপ্রেমী। তাদের সবার কাছে সেই খেলার জীবন্ত ছবি আর ছবির মত রিপোর্ট পৌঁছে দেয় খেলার আসরই।

শুধু ফুটবলই নয়, দেশ বিদেশের ক্রিকেট, হকি, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, দাবা, কবাডি, জিমন্যাস্টিক্স, ভলিবল, বাস্কেটবল—যে খেলার খবরই চাও না কেন, সব কিছুই আছে খেলার আসরে

তাছাড়া মাঠে ও মাঠের বাইরের কড়চা, অলীক সংবাদ, পাঠকদের সম্পূর্ণ নিজেদের বিভাগ পাঠকের কলমে ও বিতর্ক, গ্রামে গঞ্জের এবং অন্য রাজ্যের খেলার খবরের আলাদা বিভাগ মফঃস্বলে ও অন্য রাজ্যের মত আবর্ষণীয় নিয়মিত সব বিভাগ তো আছেই।

খেলার খবর মানেই খেলার আসর

খেলার আসর

ঠিক যেমনটি তুমি চাও

বিশ্বের ফুটবল অনুরাগীদের মন এখন স্পেনে—যেখানে চলছে বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দখলের রুদ্ধশ্বাস লড়াই। সেই লড়াইয়ের পুরো খবর আর জীবন্ত ছবির জন্য সকলেই আগ্রহী বলে 'খেলার আসর' স্পেনে পাঠিয়েছে তিনজন প্রতিনিধি এবং পূর্ব ভারত থেকে মাত্র এই তিনজনই গেছেন ফিফার স্বীকৃতি নিয়ে। এঁরা ঃ অতুল মুখার্জি, অশোক চৌধুরী ও অমিয় তরফদার। আরও গেছেন খেলার আসরের মস্কোর প্রতিনিধি ডঃ হিতাংশু দাশগুপ্ত।

তাছাড়া ভারত-ইংল্যাণ্ড টেস্ট এবং উইম্বলডনের খবর দেবার জন্য ইংল্যাণ্ডে গেছেন সুব্রত সরকার।

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অমৃতলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭২

নবম দশম

প্রথম বর্ষ ● দ্বাদশ সংখ্যা ● ১৬ জুন ১৯৮২ ● দাম ৫ টাকা
বিমান মাশুল : পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ৪০ পয়সা

সূচীপত্র

পাঠক্রম বিভাগ

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য
(পুনরনুশীলন)
● প্রথম পত্র/কুমার চট্টোপাধ্যায়/৫
● দ্বিতীয় পত্র/নির্মল লাহিড়ী/২০

দ্বিতীয় ভাষা : ইংরাজী
(পুনরনুশীলন)
● শৈবাল সেন/৩২

ভারত ও ভারতবাসী
(পুনরনুশীলন)
● ইতিহাস/নারায়ণচন্দ্র চন্দ/৪৯
(হর্ষবর্ধন)
● ভূগোল/গৌতম মল্লিক/৫৫

বিজ্ঞানপর্ব
(পুনরনুশীলন)
● ভৌত বিজ্ঞান/অমৃতসূ দাস/৬৯
● গণিত/দীপক সেনশর্মা/৮৬
● জীবন বিজ্ঞান/দেবাশিস বিশ্বাস/১০৪

কর্মশিক্ষা পর্ব
● কর্মশিক্ষা/
পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়/১১৬
● শারীর শিক্ষা/অমিয় সাহা/১২০

সহপাঠক্রম বিভাগ

প্রবালের জীবনচক্র/অরুণ আইন/১২৫,
আমাদের বাবা নজরুল ইসলাম/
কল্যাণী কাজী/১৩১

বিদ্যালয় পরিচিতি/মালদা জিলা স্কুল/১৩৬
তাপসকুমার ভট্টাচার্য/
জনজঙ্গল/বুদ্ধদেব গুহ/১৩৯
নতুন পথে এভারেস্ট শীর্ষে/
অতীন সরকার/১৪৫

সাম্প্রতিক সংবাদ/১৪৯
তিন বিদেশী ও বাঙলা ভাষা/
অনিলকুমার দলুই/১৫০
দেশবিদেশের জাতীয় সংগীত/সুরজিত ধর/১৫২
সন্ধানী প্রতিযোগিতা/১৫৩
বুদ্ধির খেলা/১৫৬
এবং জবাব/১৫৮

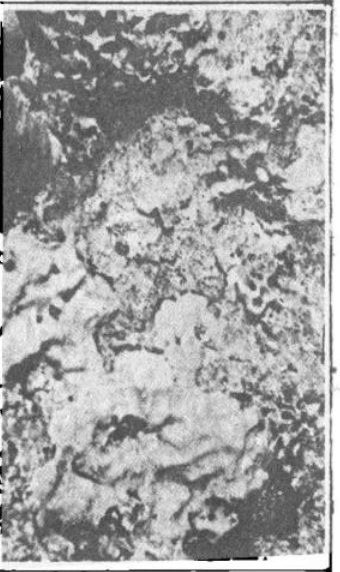

প্রথম প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ
উলের বলের মত এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী, ছড়িয়ে থাকে নরম প্রবালের উপর। সমুদ্রের একশ ফুট গভীরে এদের দেখা যায়।

সম্পাদক ঃ অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক ঃ ড: নীরদ হাজরা
শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ

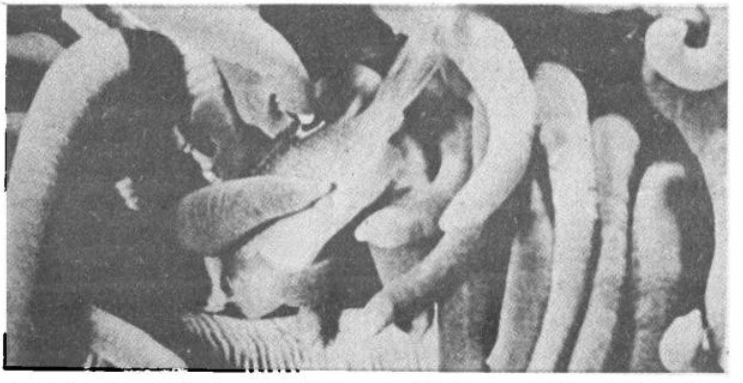

ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০০৭২, ফোন ২৭-২১৬১।

সম্পাদকীয়

আজকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে বসলাম অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। আজ এই প্রবন্ধে তোমাদের কাছে দু'টি বেদনাদায়ক সংবাদ পরিবেশন করব।

নবম দশমের শিক্ষা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার দু'টি বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ১. বেতারে প্রতি রবিবারে ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে দশটা পর্যন্ত একটি করে পাঠ্যসূচী বিষয়ক নাটিকা প্রচার। ২. একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা, যার জন্য কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের বর্ষব্যাপী (দশমাস ধরে) নবম দশম সাম্মানিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। নানা কারণে আমরা দুটি পরিকল্পনাই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম।

'বিতর্ক প্রতিযোগিতা' বিষয়ে আমরা প্রতি পদক্ষেপে সন্দেহ ও অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের এই সাধু অভিপ্রায়কে বহু বিদ্যালয় দুরভিসন্ধিমূলক ভেবেছেন। বহু বিদ্যালয় সংগঠক কর্মীকে সহযোগিতা করেননি। নতুনকে কেউই সহজে গ্রহণ করে না। বিরোধিতার মধ্যে দাঁড়িয়েই তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। আমরা বিশ্বাস করি দু'এক বৎসরের মধ্যেই আমরা এই বিরোধিতা কাটিয়ে নবম দশমের শিক্ষা সম্প্রসারক ভূমিকা সম্পর্কে সর্ব শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকের মনে সাগ্রহ সমর্থন সংগ্রহ করতে পারব। এ পরিকল্পনা সেইদিনের জন্য মুলতুবি রইল।

নাটিকা নিয়েও বিভ্রম সৃষ্টি কম হয়নি। 'বিজ্ঞাপনী প্রচার' করবার জন্য অর্থের বিনিময়ে আকাশবাণী থেকে অনুষ্ঠান প্রচারের সুযোগ আছে। এ বিষয়ে ওদের বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে আমাদের অনুষ্ঠান করতে হত। আমরা মাত্র ১৫ মিনিট সময় পেয়েছিলাম। তার ১২ মিনিট হত নাটক। তিন মিনিট বিজ্ঞাপন। কেউ কেউ এতে রুষ্ট হয়েছেন। বিজ্ঞাপন কেন? আসলে ঐ বিজ্ঞাপনটুকুর আবরণেই আমরা নাটিকা প্রচারের সুযোগ পেয়েছিলাম।

শেষ অসুবিধা দাঁড়াল সময়। যে সময়ে আমরা প্রচারের সুযোগ পেলাম, তখনই 'ক'তে চলছে ছায়াছবির গান। বড়রা দখল করে রইলেন রেডিও। শিক্ষার্থী পেল না শোনার সুযোগ। অন্যদিকে আগে থেকেই বড় বড় কোম্পানী দখল করে আছেন ভাল সময়। তাঁরা না ছাড়লে আমরা ভাল সময়ের সুযোগ পাচ্ছি কই? তাই যতদিন ভাল সময়ের ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততদিনের জন্য এ অনুষ্ঠানও মুলতুবি রইল।

আমরা এ বিশ্বাস রাখি যে, যে বাধাই আসুক, কোন সৎ ও নিষ্ঠ কর্ম প্রচেষ্টার সামনে তা বিধ্বস্ত হতে বাধ্য। তোমরা প্রার্থনা কর, আশু যেন আমাদের পথ বাধামুক্ত হয়।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য • প্রথম পত্র

পুনরনুশীলন

পাঠ সংকলন ঃ পদ্যাংশ

আমরা গত সংখ্যায় কৃত্তিবাস-বিরচিত 'শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন' নামক কবিতাংশের পুনরনুশীলন করেছি। এবারে আমরা একই সঙ্গে মধ্যাহ্নে এবং হাট কবিতার পুনরনুশীলন করব।

এই দুটি কবিতার ব্যাপারে এত চিঠিপত্র আসছে যে আমরা বুঝছি কবিতা দুটির বিষয়ে তোমাদের মনে বহু সংশয় আছে এবং সংশয়গুলো সৃষ্টি করেছে বাজার প্রচলিত কোন কোন নোট বই—কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষিকাও ঐ সব নোট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাই, আমরা পুনরনুশীলনের সূচনাতেই ঐ সংশয়গুলো দূর করে দিতে চাই।

'মধ্যাহ্নে' কবিতায় তোমাদের সংশয় 'কুলবধূ কাকে দেখে থমকাল'—এই প্রশ্নের উত্তরে। কোন কোন নোট বই লিখেছে কুলবধূ দূরের পথিক দেখে চমকে উঠল। একথা তাঁরা যে কোন হিসাবে বললেন তা আমাদের মাথায় ঢুকছে না। প্রথমত লেখক কার্যকারণ সম্পর্কিত কোন ঘটনা পরম্পরা বর্ণনায় ব্যস্ত নন। অর্ধ-সমাহিত অবস্থায় কবি ছিন্ন ছিন্ন ঘটনা দেখছেন। অতএব দূরের পথিকের গুটি গুটি যাওয়া আর কুলবধূর লাজে চমকে ওঠা ছিন্ন ঘটনা হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, দূরের কিছু দেখে কেউ কি লজ্জায় চমকে ওঠে?

মূল ছবিটি কল্পনা কর। সাধারণভাবে নদীর দু পাড় এক রকম থাকে না। এক পাড় হয় ভাঙা—নদীর খাদের পরেই হঠাৎ সুউচ্চ পাড়, অন্য দিকের পাড় ক্রমশঃ ঢালু হতে হতে এসে মুখ ডুবিয়েছে জলের তলায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে কবি নিজে ভাঙা পাড়েই বসে আছেন বট গাছের তলায়। তিনি প্রথমে কুলবধূকে দেখতে পাননি, কুলবধূও কবিকে দেখেননি। কিন্তু কেন? মনে হয় ভাঙা পাড় দিয়ে কোন জায়গায় নামবার পথ আছে, সেখান দিয়ে নিচে নেমে জলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন বধূটি। কি ভাবছিলেন তা তিনিই জানেন। পাড়ের আড়ালেই দুজন ছিলেন দুজনের আড়ালে। বটগাছটাও দুজনের দৃষ্টির অন্তরাল হতে পারে। যাই হোক, কোন এক সময় কুলবধূ জল নিয়ে নিশ্চিন্ত মনেই পথ দিয়ে গৃহে ফিরছিলেন। পথটি গেছে কবি যেখানে বসে আছেন তার পাশ দিয়ে। কুলবধূ গাছের আড়াল কাটিয়ে বা পাড় দিয়ে ওপরে উঠে হঠাৎই কবিকে (অপরিচিত পুরুষকে নির্জনে) দেখে চমকে উঠলেন। লক্ষ্য কর, এ চমকান আতঙ্কে নয়—লজ্জায়। এবং লজ্জার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে সে দ্রুত পার হয়ে গেল কবিকে।

এতএব, আমাদের সিদ্ধান্ত ঃ কুলবধূ

কবিকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন। দূরের গুটি গুটি যাওয়া পথিককে দেখে চমকে ওঠা বা লজ্জা পাওয়া—দুই-ই অস্বাভাবিক।

তোমাদের দ্বিতীয় সংশয় দূরের পথিক গুটি গুটি যাচ্ছে কেন? আমরা বলেছিলাম, দূরের জিনিসের আপেক্ষিক অপসরণ বেগ কমই মনে হয়। পথিকেরা যথাগতিতেই যাচ্ছে। কিন্তু কবির মনে হচ্ছে তারা চলেছে শম্বুক গতিতে।

আমাদের এ ব্যাখ্যা কোন এক কিশোরের পছন্দ হয়নি। সে লিখেছে যে দ্বিপ্রহরের তপ্ত আতপে ক্লান্ত বলেই পথিকেরা গুটি গুটি যাচ্ছিল। এ ব্যাখ্যাটি আগের বাতিল ব্যাখ্যার মত অতদূর কল্পনাপ্রসূত নয়। তবু এ ব্যাখ্যাও কি পরিপূর্ণ সত্য? মাথার ওপরে যখন সূর্য জ্বলে দারুণ তেজে, তখন ক্লান্তম পথিকটিও কি দ্রুত আতপদগ্ধ অঞ্চল পার হয়ে ছায়ার সন্ধানে ছোটে না? আমাদের বিশ্বাস, অনুরূপ পরিবেশ যদি আবিষ্কার করতে পার তবে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই তোমরা বুঝবে যে আমাদের ব্যাখ্যায় কোন বিভ্রান্তি নেই।

তোমাদের তৃতীয় সংশয় 'ছায়া ছায়া কত ব্যথা ঘোরে ধরাধামে' এই বাক্য নিয়ে। এখানে 'ছায়া' শব্দটা দুবার ব্যবহার করা হয়েছে কেন? আমরা নানা কারণেই এক্ শব্দ দুবার ব্যবহার করে থাকি। যেমন ধর, 'কাজ করে করে ক্লান্ত' বা 'বলে বলে মুখ ব্যথা' বলতে বারংবার করা এবং বলা বোঝান হয়েছে। 'বড় বড় বাঁদরের বড় বড় পেট' এখানে বহুবচন বোঝাতে বিশেষণের দ্বিত্ব হয়েছে আবার 'গাছে গাছে ফল' বলতে বহুবচনের অর্থে বিশেষ্যেরই দ্বিত্ব হয়েছে। অন্য ক্ষেত্রে দেখ, 'জ্বর-জ্বর' আর 'জ্বর' বলতে পার্থক্য কি? 'জ্বর' বলতে জ্বরের নিশ্চিন্ততা আর 'জ্বর-জ্বর' বলতে 'প্রায়-জ্বর' বোঝাচ্ছে।

তাহলে মনে রেখ নানা অর্থে শব্দ দ্বিত্ব হয়ে থাকে। ব্যাকরণ বইতে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখে নিও। এখানে, 'প্রায়-ছায়া' অর্থে শব্দ দ্বিত্ব হয়েছে। কবি আত্মসমাহিত হতে চাইছেন—মনে এক অলৌকিক কাব্য-জগৎ গড়ে তুলতে চাইছেন। এখন মনের নিটোল ভাবাবেশ নামেনি—নামতে চলেছে। তাই মনের সেই জগতের সব-কিছুই এখন ছায়া-ছায়া। বুঝলে ত!

এবারে তাহলে আমরা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু করি।

মধ্যাহ্নে

বড় প্রশ্ন

১. 'চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে' কবি কি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, মধ্যাহ্নে কবিতা অনুসরণে বল। 'ছায়া ছায়া কত ব্যথা ঘুরে ধরাধামে' কথাটির তাৎপর্য কী? [৬+৪] মা-৮১

উঃ সঃ লক্ষ্য করে দেখ প্রশ্নটির দুটি অংশ। প্রথম অংশটির জন্য ৬ নম্বর দ্বিতীয় অংশের জন্য ৪ নম্বর। স্বভাবত প্রথমাংশের উত্তর বড় আর দ্বিতীয়াংশের উত্তর ছোট হবে।

প্রথমাংশের উত্তরের জন্য মূলত কবি যা যা দেখেছেন তার বর্ণনা দিতে হবে। কিন্তু তার আগে একটি বাক্যে কবির পারিপার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেবে।

দ্বিতীয়াংশের উত্তরের জন্য বল ঃ রোমান্টিক কবি মাত্রেই দুঃখবিলাসী। অক্ষয়কুমারের কাব্যগুরু বিহারীলালও সারদা-বিরহে প্রমত্ত হয়ে কাব্য রচনা করতেন। অক্ষয়কুমারও মনে মনে তেমনই এক অলৌকিক বেদনাময় কল্পলোকে আত্মসমাহিত হতে চাইছেন। এখনও গাঢ়

তন্ময়তা জন্মেনি। তাই কবি বলছেন যে তাঁর মানসমণ্ডলে বেদনার মূর্তিগুলো এখনও অস্পষ্ট ছায়া ছায়া,—তারা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেনি। এখানে ধরাধাম বলতে কবির মনোলোকের সেই অলৌকিক জগৎকেও বোঝান হয়েছে।

২. 'মধ্যাহ্নে' কবিতায় মধ্যাহ্নকালীন যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর। মধ্যাহ্নকালীন কবিমনের যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, বর্ণনা কর।

[৬ + ৪]

উঃ সঃ এ প্রশ্নেও দুটি অংশ। নম্বর বিভাজন আগের মতই। স্বভাবত প্রথমাংশের উত্তর বড় হবে, দ্বিতীয়াংশের উত্তর ছোট।

প্রথমাংশের উত্তরের জন্য প্রথমে নদীর পাড়, ভাঙ্গা তীর, কবির বসবার ভঙ্গী ইত্যাদি বর্ণনা করবে। পরে কবি যা যা দেখছেন তা-ও যোগ করবে। তবে যেহেতু মধ্যাহ্নকালীন চিত্র তুমিই বর্ণনা করছ, অতএব কবি কি কি দেখলেন—এমনভাবে বর্ণনা করবে না।

দ্বিতীয়াংশের উত্তরের জন্য কবি কভাবে ক্রমেই আত্মসমাহিত হয়ে চলেছেন -প্রথমে মনের দ্রুত সঞ্চারশীলতা, ক্রমে গতিহীনতা অবশেষে ছায়া ছায়া অলৌকিক জগৎ গড়ে ওঠার কথায় উত্তর শেষ হবে।

৩. মধ্যাহ্নে কবিতায় কবি কোন কোন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন? অলস-স্বপনজাল কবিকে কিভাবে আবিষ্ট করেছে? কবিতার নামকরণ কি ঠিক হয়েছে? [৩ + ৪ + ৩]

উঃ সঃ এই প্রশ্নের তিন অংশ। মাঝের অংশের গুরুত্ব অন্য অংশ দুটির চেয়ে কিছু বেশি। উত্তর দৈর্ঘ্য প্রায় সমান।

প্রথমাংশের জন্য ওপরের প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তরই লিখতে হবে।

দ্বিতীয়াংশের উত্তরের জন্য আগের প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের উত্তরের বক্তব্যকে গুছিয়ে লেখ।

নামকরণের সার্থকতা বোঝাতে নামের অর্থের সঙ্গে বিষয়বস্তুর মিল দেখাতে হবে। এ সম্পর্কে প্রথম সংখ্যাতেই বিশদ আলোচনা আছে। মনে না থাকলে পড়ে নাও। এখানে যা বলতে হবে তা হল এই যে মধ্যাহ্নের প্রাকৃতিক শোভা অর্থাৎ মধ্যাহ্নকে বর্ণনা করা কবির অভিপ্রায় নয়। কোন মধ্যাহ্নে কবির মনে কিভাবে কাব্য-আবেশ নেমেছিল—তারই বর্ণনা করা হয়েছে এই কবিতায়। তাই 'মধ্যাহ্ন' না বলে 'মধ্যাহ্নে' বলে কবি নামকরণ আরও স্পষ্ট ও অর্থময় করে তুলেছেন।

আলোচনা ঃ এই প্রশ্ন তিনটি থেকে বোঝা যায় যে আমরা যদি মধ্যাহ্নে থেকে চারটি প্রশ্নাংশ তৈরি করে রাখি তবে কোন প্রশ্নকর্তাই ঠকাতে পারবেন না। প্রশ্নটি হল—

১. মধ্যাহ্নে কবির পরিবেশ।
২. কবির দেখা দৃশ্যাদি।
৩. কবির মনে কাব্যাবেশ নামবার ক্রম।
৪. নামকরণের সার্থকতা।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

'মধ্যাহ্নে' কবিতা থেকে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের শেষ বারো চরণ অর্থাৎ শেষ তিনটি শ্লোকের যে কোন চরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ঐ সব চরণ উদ্ধৃত করে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, সেগুলো আবার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই আমরা মধ্যাহ্নের ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতির জন্য ছাত্রছাত্রীদের সময় ব্যয় করতে নিষেধ করব। নিচে বহু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হল, ওগুলোর উত্তর জানা থাকলে কোন ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নেই কেউ আটকে যাবে না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. 'ছায়া ছায়া কত ব্যথা ঘুরে ধরাধামে' কোন কবিতার অন্তর্গত ? ছায়া ছায়া ব্যথা বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন বলে তোমার ধারণা ? [১+২]

২. 'মধ্যাহ্নে' কবি বলিয়াছেন নিঝুম মধ্যাহ্ন কাল এবং উহা বুঝাইতে কয়েকটি নিসর্গ চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন ঐরূপ দুইটি চিত্রের এখানে উল্লেখ কর। [৩]

৩. 'ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি কাঁপিছে সমীরে'—'ঝুরু ঝুরু' অর্থ কী ? কোন সময়ে পাতাগুলো কাঁপিতেছে ?

৪. 'কুলবধূ দ্রুত গেল লাজে চমকিয়া —কোন কবিতায় পড়েছ ? কুলবধূর এইরূপ আচরণের পেছনে কী যুক্তি বুঝিয়ে বল ? [১+২]

৫ 'পড়িছে গভীর শ্বাস গানের বিরামে।'—কোন কবিতার অন্তর্গত ? মূল ভাবটি পরিস্ফুট কর ? [১+২]

৬. 'মনে পড়ে কত গাথা'। -কিরূপ পরিবেশে, কার মনে পড়ে ? গাথা মানে কী ? [২+১]

৭. 'চাতক কাতরে ডাকে'--চাতক কখন ডাকে ? উহার কাতরতার কারণ কি ? ঐ সময়ে আর কোন্ পাখী কী করে ? [৩]

৮. 'মনে পড়ে কত গাথা।'—কোন্ সময় কাহার গাথা মনে পড়িয়াছিল ? 'গাথা' শব্দের অর্থ কি ? 'গাথা'র প্রায় সমোচ্চারিত একটি ভিন্নার্থক শব্দের উল্লেখ কর। [১+১+১]

অথবা, 'মনে পড়ে কত গাথা।—কার মনে পড়ে ? 'গাথা' ও 'গাঁথা'-র মধ্যে পার্থক্য কী ? [১+২]

আলোচনা ঃ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই। মূল কবিতা পাঠনের সময় আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছি। তবে তিন নং প্রশ্নের 'ঝুর ঝুর' কথাটির অর্থ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ঝুরু ঝুরু বাতাস বা ঝির-ঝিরে বাতাস—বলা হয়। বুঝি মৃদু মন্দ বাতাসকে। কিন্তু এখানে 'ঝুরু ঝুরু' শব্দদ্বৈতটি পাতার বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কপালের ওপর ঝুলে থাকা সিঁথি বহির্ভূত ছোট ছোট অলককেও 'ঝুরু ঝুরু অলক' বলা হয়। কিন্তু বটগাছের পাতা ত খুব ছোট পাতা নয়। তাই তাকে ঝুরু ঝুরু পাতা বলা ঠিক হবে না। তবে সুখপ্রদ লঘু বায়ু প্রবাহে পাতাগুলো কেঁপে ঝির ঝির শব্দ তোলে। ঝির ঝির শব্দ তোলা পাতাগুলো অর্থে ঝুরু ঝুরু পাতাগুলো অর্থেই এখানে শব্দদ্বৈতটি ব্যবহৃত হয়েছে।

মন্তব্য ঃ এখানে কবি প্রয়োগটির অর্থ স্পষ্ট নয়। ছবি ও গানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ঝুরু ঝুরু কাঁপে গাছপালা'—অর্থ স্পষ্ট, ঝুরু ঝুরু শব্দে গাছপালা কাঁপে। রঙ্গমতীতে নবীনচন্দ্র লিখেছেন, 'ঝুরু ঝুরু বহে সমীরণ'—এখানেও অর্থ অস্পষ্ট নয়। এখানে খুবই মৃদুগতিতে প্রবাহিত সমীরণকে বোঝান হয়েছে।

হাট

'হাট' কবিতা থেকে আমরা মোট পাঁচটি বিশেষ বড় প্রশ্নের সন্ধান টেস্ট পেপারে পেয়েছি। নিচে প্রশ্নগুলো দিলাম। কিন্তু প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা যে সূত্রগুলো পাই তার সংখ্যা বেশি নয়। ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে—

১. হাটের পরিবেশ—অর্থনৈতিক গুরুত্ব।
২. হাটের বসা, জমে ওঠা এবং ভাঙার চিত্র — অর্থাৎ সারাদিনের চিত্র।
৩. হাটের রাত্রির অবস্থা।
৪. হাটকে কেন্দ্র করে কবির দার্শনিকতা বা দুঃখবাদ।

এই চারটি সূত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রাখ। আমাদের পূর্বের আলোচনায় এ সম্পর্কে তথ্যের অভাব নেই। সংগ্রহ পাঠ প্রস্তুত থাকলে এ কবিতার প্রশ্নে তোমাকে পিছু হটান সম্ভব হবে না।

বড় প্রশ্ন

১. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বর্ণিত হাটটি কীরকম জায়গায় অবস্থিত। সেখানকার সন্ধ্যা ও রাত্রির পরিবেশ কী প্রকার। হাটের দৃশ্য দেখে কবি কী ভেবেছিলেন।
[২+৪+৪]

২. হাট কবিতাটি অবলম্বনে 'নির্জন হাটে রাত্রি'র দৃশ্যের সঙ্গে দিনের পরিবেশের পার্থক্য বর্ণনা কর। 'উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন। [৭ + ৩]

৩. মানুষের সঙ্গে হাটের প্রকৃত সম্পর্কটা কি? কবির বর্ণনা অনুযায়ী কর্মমুখর হাটের একটি চিত্র অঙ্কন কর। কবিতার উপসংহারে কবি কোন সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। [৩+৩+৪]

৪. কবি বর্ণিত হাটের অবস্থান কোথায়? হাট চলাকালীন তার অবস্থা বর্ণনা কর। হাট ভাঙলে তার অবস্থা কিরূপ হয়? এই হাটের সঙ্গে আর কোন কিছুর তুলনা চলে কি? যদি চলে, তবে তুলনা কর। [২+৩+১+১+৩]

৫. 'দিবসরাত্রি নতুন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা।' 'দিবসরাত্রি'র 'নতুন যাত্রী' কাহারা? ইহাদের যাত্রী বলা হইয়াছে কেন? এই যাত্রীদের ক্রিয়াকলাপকে 'নাটের খেলা' বলিবার কারণ কি? এই খেলা নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে কিভাবে? গ্রাম্য হাটের রূপকের আড়ালে কবি আসলে কিসের বর্ণনা করিয়াছেন?
[১+২+২+২+৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

এই কবিতা থেকে সাধারণত নিচের পংক্তিগুলোকে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়—

১. বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পুবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট !

২. নিশা নামে দূরে শ্রেণী-হারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড়-শাখে।

৩. বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ বাঁশি
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

৪. হানাহানি করে কেউ নিল ভরে,
কেউ গেল খালি ফিরে ;
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে।

৫. পঞ্চম স্তবকের যে কোন অংশ।

এই ব্যাখ্যাগুলো লিখতে যে সব তথ্য দরকার তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা রয়েছে পংক্তিগুলো সম্পর্কিত আলোচনায়। এ জন্য আমরা নূতন করে আর আলোচনা করলাম না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ নির্দেশের সময় ঠিক কোথা থেকে অংশটি উদ্ধৃত, অর্থাৎ কবি কি বলতে এ কথা বলেছেন—তা বলবে। বলবে কবির ও কবিতার নাম। এই সাধারণ রীতি যেন স্মরণ থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. 'সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ'—'সেথা' বলতে কোন স্থানকে বোঝান হয়েছে? সেখানে প্রদীপ জ্বলে না কেন এর ভেতর দিয়ে কাদের কি মনোভাব প্রকাশিত হয়?
[১+১+১]

উঃ সঃ তৃতীয় অংশের জন্য : গৃহস্থ মানুষের স্বার্থপর ও আত্মসর্বস্ব মানসিকতা ফুটে ওঠে।

২. 'বকের পাখায় আলোক লুকায়'—কোন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? কিভাবে বকের পাখায় আলোর লুকান সম্ভব? [১+২]

৩. 'হাটের দোচালা মুদিল নয়ান'—দোচালা কি? দোচালার নয়ানই বা কি আর তা মুদ্রিত করাই বা কাকে বলে? [১+২]

বা, বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বল। 'নয়ান' শব্দটির ব্যবহারগত তাৎপর্য দেখাও।

উঃ সঃ 'নয়ান' শব্দটি হিন্দী নয়না শব্দ থেকে বর্ণ-বিপর্যয়ে উৎপন্ন বা বাঙলা নয়ন থেকে উচ্চারণ বিকারে নয়ান শব্দটির সৃষ্টি। তবে শব্দটি প্রাচীন বাঙলা থেকে আধুনিক বাঙলায়ও কবিরা ব্যবহার করে আসছেন। যেমন—

১. ভাঙা ধনু ভঙ্গি ঠাম
নয়ান কোণে পূরিত বাণ
হাসিতে খসায়ে সুধারাশি।
—চণ্ডীদাস

২. 'মুখশশী সজল নয়ান'—বিদ্যাপতি

৩. 'ছলছল দু' নয়ান'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. 'শত হাতে সহি পরখের ছল'—কাদের সহ্য করতে হয়? 'ছল' বলবার তাৎপর্য কি? [১+২]

বা, শত হাতে পরখ কেন? পরখকে ছল বলা হল কেন? অবশেষে কি হয়? [১+১+১]

৫. 'নিত্য নাটের খেলা'—নাটের খেলা কি? এখানে কাকে নাটের খেলা বলা হয়েছে? তা নিত্য কেন? [১+১+১]

৬. 'কেহ কাঁদে কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।'—দুই শ্রেণীর ভাগ্যের পার্থক্যের কারণ কি? [৩]

৭. হাট কাকে বলে? হাট ও বাজারে পার্থক্য কি? বাঙলাদেশের হাটের সাধারণ চিত্র কি? [১+১+১]

৮. কবি বর্ণিত হাটের অবস্থান কোথায়? একে কি একটি সাধারণ চিত্র বলা যায়? [২+১]

উঃ সঃ নদীর পাড়ে গাছের ছায়ায় দশ-বারো খানি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে হাট বসে··সাধারণ চিত্র ত বটেই। আগে সব হাটই বসত নদীর পাড়ে। নদীই ছিল যাতায়াতের ও পরিবহণের শ্রেষ্ঠ পথ। এখন অবশ্য নদী থেকে দূরেও হাট বসে।

৯. 'যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায়।' —কারা কখন ঘরে ফিরে যায়? যেখান থেকে ফেরে তখন সেখানকার অবস্থা কি হয়? [২+১]

১০. 'ছুটে এপারের ক্রেতা'—কখন ছোটে? কেন ছোটে? ছুটাছুটির ফল কি হয়? [১+১+১]

উঃ সঃ ওপারের লোক পসরা নিয়ে এলে এপারের লোক ছুটে আসে। ওপারের লোকের পসরা সর্বপ্রথম ধরে কম দামে কিনে নেবার জন্যই এত আগ্রহ। ফলে কেউ বা লাভ করে কেউ ঠকে।

১১. কেহ কাঁদে কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।' —কে কাঁদে? কেই বা গাঁটে কড়ি বাঁধে? [২+২]

উঃসঃ এখানে হাটের ক্রেতা-বিক্রেতার লাভালাভের কথা বলা হয়েছে ওপারের (জন্মের ওপার থেকে আসা) বিক্রেতা (নবজাতক) এসে পৌঁছলেই এপারের (আগেই জন্মেছে যারা) ক্রেতা (সামাজিকেরা) পসরার মূল্য নির্ণয় করতে বসে। যে লাভ করে সে গাঁটে কড়ি বাঁধে, যে লাভ করতে পারে না অর্থাৎ লোকসান করে সে কাঁদে।

অনুবাদ

গত সংখ্যায় প্রদত্ত অনুচ্ছেদ অনুবাদ অনুশীলন দিয়ে এবারের অনুবাদ-পর্ব শুরু করা যাক।

প্রাথমিক অনুবাদ

আমরা সকলে। প্রবেশ করলাম। গুহা।। এটা ছিল। একটি বড়। বাতাস-ওয়ালা স্থান। সঙ্গে ছিল ছোট্ট ঝরণা। পরিষ্কার জলের। ওপর ছাওয়া ছিল গাছে।। মেঝে ছিল বালু।। মস্ত আগুনের সামনে শুয়েছিল ক্যাপটেন স্মোলেট। এবং দূরের এক কোণে। ঝলকানির সামান্য আলোতে। আমি দেখতে পেলাম। সোনার টুকরোর মস্ত পাহাড় এবং স্বর্ণদণ্ডের মিনারগুলো।। ঐটিই ছিল ফ্লিণ্টের রত্নাগার—যা খুঁজতে আমরা এত দূরে এসেছি। এবং। যাতে খরচ হয়েছে। ইতিমধ্যে। হিস-প্যানিওলার সতের জনের জীবন।

খসড়া অনুবাদ

আমরা সকলে গুহায় প্রবেশ করলাম। এ স্থানটি ছিল বেশ বড় এবং হাওয়া-বাতাসযুক্ত। সঙ্গে ছিল একটি পরিষ্কার জলের ছোট্ট ঝরণা। আর তা ছিল গাছে ছাওয়া। মেঝে ছিল বালুময়। মস্ত আগুনের সামনে ক্যাপটেন স্মোলেট শুয়ে ছিলেন আর সেই আগুনের ঝলকানির মৃদু আলোতে গুহার অন্য এক দূরের কোণে দেখলাম স্বর্ণখণ্ডের মস্ত পাহাড় আর স্বর্ণদণ্ডের স্তম্ভ। ঐটিই ছিল ফ্লিণ্টের রত্নাগার। ওরই সন্ধানে আমরা এতদূর এসেছি আর ওরই জন্য ইতিমধ্যে হিস-প্যানিওলা সতের জনের জীবন খরচ হয়ে গেছে।

চূড়ান্ত অনুবাদ

আমরা সকলে ঢুকলাম সেই গুহায়। জায়গাটা বেশ বড় এবং খোলামেলা—গাছে ছাওয়া একটি স্বচ্ছ জলের ঝরণাও ছিল সেখানে। গুহার মেঝে ছিল বালুতে ঢাকা। একটা মস্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে শুয়ে ছিলেন ক্যাপটেন স্মোলেট। সেই আগুনের ঝলকানির মৃদু আলোতে দূরের এক কোণে দেখলাম স্বর্ণখণ্ডের বড় বড় পাহাড় আর স্বর্ণদণ্ডের স্তূপীকৃত স্তম্ভ। এই-ই তাহলে ফ্লিণ্টের রত্নভাণ্ডার। এরই সন্ধানে আমরা এতদূর এসেছি আর এরই জন্য হিসপ্যানিওলা জাহাজের সতেরজন ইতিমধ্যেই প্রাণ দিয়েছে।

অনুশীলনীর জন্য

A poor woman once came to Buddha to ask him whether he could give him any medicine to restore her dead child to life. The holy man, touched by the great sorrow of the woman, told her that there was only one medicine which could revive her son. 'Can you bring a handful of mustards-eeds from a house where death had never entered?' The sorrowing mother went from door to door, seeking the mustardseed but returned with a heavy heart to the holy man. Then Buddha told her tenderly that she must not think much of her grief, since sorrow and death are common to all.

ভাব সংকোচন

গত সংখ্যায় প্রদত্ত দীর্ঘ অনুচ্ছেদ তিনটি বিদ্যাসাগর মশাই-এর রচনা থেকে গৃহীত। এটি ভাব-সংকোচনের জন্য যেমন তোমাদের সামনে দেওয়া হয়েছে তেমনি দেওয়া হয়েছে আদর্শ অনুচ্ছেদের উদাহরণ দেখবার জন্যও। যুক্তি এবং তথ্যে পূর্ণ এই অংশটি সংক্ষেপ করতে শুধু উদাহরণগুলো বাদ দিলেই চলবে।

প্রথম অনুচ্ছেদে লেখক কৃষিজ বা খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে শিল্প দ্রব্যের পার্থক্য বুঝিয়েছেন।

এবার বলেছেন যে শিল্পের উন্নতিতেই দেশ সম্পদশালী হয়।

শেষ অনুচ্ছেদের মূল কথা : আমাদের দেশও এককালে শিল্পোন্নত ছিল। পুনর্বার উন্নতির জন্য সর্বপ্রকারে যত্নবান হওয়া উচিত। তিন অনুচ্ছেদেরই মূল বক্তব্য উদ্ধার করা গেল। এদের একত্রিত করলেই ভাব-সংক্ষেপণ হল।

উত্তর : এক

কৃষিকার্যাদি দ্বারা যে বস্তু লাভ হয় তাহাকে পুনর্বার পরিশ্রম ও কৌশলের দ্বারা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়। এইরূপে ব্যবহারযোগ্য করাকেই শিল্পকর্ম বলে। যে দেশ শিল্পে যত উন্নত, সে দেশ তত সমৃদ্ধ। পূর্বকালে আমাদের দেশও শিল্পে উন্নত ছিল—এখন নাই। পুনর্বার উন্নত করিবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা উচিত। (৪৬)

উত্তর : দুই

কৃষিকার্যাদির দ্বারা একবারের পরিশ্রমে যেসব বস্তু পাওয়া যায় দ্বিতীয়বারের পরিশ্রমে ও কৌশলে তাদের ব্যবহারোপযোগী করে নিতে হয়—একে বলে শিল্প-কর্ম। শিল্পোন্নতির ফলেই দেশ সমৃদ্ধ হয়। আমাদের দেশও একদা শিল্পোন্নত ছিল—বর্তমানে শিল্পোন্নতির সার্বিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। (৩৬)

অনুশীলনীর জন্য প্রদত্ত

সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরে পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়।

এজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ কিছু হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্য ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে। আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন

সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে। এই জন্য সুখ বাহিরের নিয়মের মধ্যে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনি সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ,

দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুই-ই সমান।

প্রবন্ধ রচনা

আমরা ঋতু বিষয়ক যে প্রবন্ধগুলো দেব তার মধ্যে চারটি প্রবন্ধ (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত) সম্পর্কিত রচনা গত সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে। এবারে আমরা অবশিষ্ট দুটি ঋতু এবং ঋতুচক্র নামে একটি প্রবন্ধ দেব। এবারের বসন্ত ঋতু সম্পর্কিত রচনাটি দেবীদাস আচার্যের লেখা।

শীত

কক্ষপথে আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে গোলার্ধ যখন সূর্য থেকে দূরে হেলে পড়ে এবং সূর্য কোনক্রমেই সোজাভাবে কিরণ দিতে পারে না—তখনই সেই গোলার্ধে শীত ঋতু দেখা দেয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ছ মাস শীতকাল থাকে, ইংল্যাণ্ডে তিনমাস। আমাদের দেশে শীত প্রবল থাকে মাত্র দু মাস। প্রাচীন গ্রন্থ 'অমরকোষ'-এ মাঘ ও ফাল্গুনকেই ভারতের শীত ঋতু বলে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু আমরা পৌষ মাসেই শীতের প্রাবল্য অনুভব করি।

শীতে প্রকৃতির রাজ্যে 'পাতা ঝরাবার পালা' শুরু হয়! তীব্র শীতের আক্রমণে যেন পাতারা পরাজিত হয় আর শীতরাজ তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। গাছের তলায় ঝরা পাতার স্তূপ জমা হয়। পাতাশূন্য ন্যাড়া ডালগুলোর মধ্য দিয়ে যখন শীতের বাতাস হু হু করে বয়ে যায় তখন মনে হয় গাছগুলো আকাশে হাত তুলে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর', বলে চিৎকার করছে। এই সময় অশোক, পলাশ, শিমূল ইত্যাদি ফুলের লাল রঙে দিগন্ত রাঙা হয়ে থাকে। সন্ধ্যার আকাশে অসংখ্য তারা এত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়—মনে হয় যেন তাদের উৎসব শুরু হয়েছে।

শীতে ভোজন-বিলাসীর আনন্দ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, নতুন বেগুন, আলু, মটরশুটি, বীট, গাজর, টমাটো ইত্যাদি নানা তরকারিতে বাজার ছেয়ে যায়। শীতে কমলালেবু, নাসপাতি, আপেল ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খেজুরের রস ও খেজুরের গুড়ের গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়। অগ্রহায়ণে ওঠা নতুন ধান ও শীতের নলেন গুড়ের পিঠে-পুলির ধুম পড়ে। একদিন তৈরি করে তিনদিন পর্যন্ত খাওয়া যায় বলে শীত ঋতু পিঠে তৈরির জন্য প্রশস্ত।

শীতে খাবার সুব্যবস্থা থাকলেও দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে বড়ই কষ্টকর। তবে প্রবল শীতে সাপ-পোকামাকড় আত্মগোপন করে। অসুখও কম হয়। এই কারণে শীত উপভোগের ঋতু। এইকালে দলে দলে লোক ভ্রমণে বের হয়।

বাঙলাদেশে পৌষ-পার্বণ শীতের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই সময় শান্তিনিকেতনে একটি মেলা হয়। শীতেই যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন আসে। খ্রিস্টানদের কাছে এর চেয়ে আর আনন্দের ঋতু নেই।

বসন্ত

মহাকালের রঙ্গশালায় প্রকৃতির শেষতম অবদান বসন্ত। শেষতম হলেও উজ্জ্বলতম। বসন্ত ঋতুর রাজা। তার আবির্ভাব রাজকীয়। শীতের পর্ণমোচী প্রকৃতির বহু কামনার ধন সে। অন্যসব ঋতুর মতই মাত্র দুটি মাস আয়ুষ্কাল। ফাল্গুন আর চৈত্র এরই মাঝে প্রকৃতির বুকে আর মানুষের মনে শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি সে অধিকার করে নেয়।

শীতের জড়তা ধীরে ধীরে কাটতে থাকে। যেন এক অলস ঘুমের পর প্রকৃতি আবার জেগে উঠছে। ফাল্গুন এসেছে বেশ জানান দিয়ে। গাছে গাছে নবীন কিশলয়। দূরদূরান্তে রক্তিম কৃষ্ণচূড়ার ঢেউ, যেন ঋতুরাজের বিজয় পতাকা উড়ছে আকাশে। বাতাসে সেই কনকনে শীতের কামড় আর নেই—নতুন আলোর মিঠে তাপ মিশেছে তার সঙ্গে। কোমল নাতিশীতোষ্ণ ভাব। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দেশে, বর্ষার দেশে এর থেকে সুখের সময় আর কোথায়

শুধু আমাদের দেশেই নয় সারা পৃথিবীতেই বসন্তের জয়জয়কার। প্রায় সব দেশে সকলেরই প্রিয়তম ঋতু। সারা বছরের প্রতীক্ষা যেন এই বসন্ত সময়টুকুর জন্য।

আকাশ-আলো-নতুন পাতা সবাই মিলে জানিয়ে দেয় 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গেছে আমের গাছ। একটা স্নিগ্ধ গন্ধ বাতাসে। মৌমাছিদের কী ব্যস্ততা। ওদিকে পলাশ যেন একাই একশো। রূপের গর্বে সোচ্চার। আবার 'করবীকুঁড়ির পানে' চেয়ে চেয়ে কবির মন উদাস হয়ে যায়। ভোরের আলো গায়ে মেখে চাঁপাও গন্ধ বিলায় অফুরান। আর অশোক? যেন বসন্তের ঐশ্বর্যের জানান দিয়ে যায়। বিদেশি হলেও ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা—রূপের বাহারে এরাও কি কম?

যেন এক রূপের প্রদর্শনী। প্রত্যেকেই তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি দিয়ে বসন্তকে সাজাতে ব্যস্ত।

প্রকৃতিতে যখন এই সাজ সাজ রব, মানুষও কি আর স্থির থাকতে পারে! শীতটা কেটেছে জড়ত্বের মাঝে। সবাই এখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চায় প্রাণের আনন্দে। দীর্ঘদিন বাদে গ্রামের মেঠো পথে আবার পরিচিত বাউলকে দেখা যায়। তার গান শোনা যায়। ঘরের ভাঁড়ার পূর্ণ, প্রাকৃতিক পরিবেশে অফুরান ঐশ্বর্য—উৎসবের জন্য উৎসুক হয় সবাই। প্রকৃত-পক্ষে উৎসবের পরিবেশ এমন করে আর কখনই বা নাড়া দেয়। শুরু হয় বসন্ত উৎসব। আসে বাসন্তীপূজা। এছাড়া দোলযাত্রা ত আছেই। চারিদিকে রঙের বাহার। আবীরের রঙে মানুষের মনও হয় বর্ণালী। কেউ পিছিয়ে থাকতে, ঘরে বসে থাকতে নারাজ। কবিও তাই ডাক দিয়েছেন—

ওরে আয়রে, মাতরে সবে আনন্দে
আজি নবীন প্রাণের বসন্তে।

বসন্তের আবির্ভাব, তার অবস্থিতি সবই ভীষণ প্রাণস্পর্শী। তাইতো সে ঋতুরাজ। এমনকি বসন্তের শেষ রেশটুকুও সবাই ভোগ করে নিতে চায়। শুরু হয় গাজনের মেলা—গ্রামবাঙলার প্রিয় পার্বণ।

কিন্তু বসন্তের ঐ মিঠে রোদ আর হাওয়া কিছুটা বিষও ছড়িয়ে যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনে এ সময় অনেকেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটে, টাইফয়েড, বসন্ত দেখা দেয়। বসন্ত রোগ একসময় বিভীষিকা ছিল। এখন অবশ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বসন্ত রোগের ভয়াবহতা নাশ করা গেছে।

বসন্ত প্রকৃতই ভোগের ঋতু। আর সেইসব ভোগের পসার নিয়ে সে হাজির হয় বঙ্গবাসীরা যা দেহে মনে ভোগ করে, উপভোগ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশই শুধু নয় মানুষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও এ সময় সুখকর থাকে। গাঁয়ে গেলে চোখে পড়ে সোনালি খড়ে ছাওয়া সারি সারি ঘর। আর ক্ষুধার অন্ন এখন ভাঁড়ারে। মন তাই ঘরের বাইরে ছোটে। মনের সঙ্গে মনের মিল ঘটাতে। বাঙলা তথা বিশ্ব-সাহিত্যে এজন্য বসন্তই সবচেয়ে অভিনন্দিত ঋতু।

বাঙলার ঋতুচক্র

সারাটা বছর জুড়ে প্রকৃতি কত রকম নতুন নতুন ভাব ও সজ্জাই না ধারণ করে। কখনও গরমে টেঁকা দায় হয়, কখনও শীতে 'ত্রাহি মধুসূদন'। কখনও অশোক-পলাশ-শিমূল লাল ফুলের নিশান উড়িয়ে আনন্দের ধূম তুলে দেয়, কখনও ন্যাড়া-গাছ পত্রহীন ডালগুলো আকাশে তুলে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলে চিৎকার করে। এই রূপ ও ভাবের দিক থেকে ভারতের একটি বছরকে যেমন স্পষ্ট ছটি ভাগে ভাগ করা যায়, অন্য কোনও দেশে তেমনটি সম্ভব নয়। ইংল্যাণ্ডে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতকে চেনা যায়। কিন্তু ভারতে সারা বছর জুড়ে ছয় ঋতুর রাজত্ব চলে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

বছরের সূচনা হয় গ্রীষ্মে। বৈশাখের প্রথম দিকে প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড় যেন পুরনো বছরের আবর্জনা পরিষ্কার করে উড়িয়ে দেয়। তারপর শুরু হয় সূর্যদেবের তীব্র অগ্নিবর্ষণ। সূর্যদেব যেন পুরনো বছরের কিছুই কোথাও অবশিষ্ট রাখতে দেবেন না। ঐ তাপেই আম, জাম, কাঁঠাল পেকে ওঠে। গ্রীষ্মের ফলাহার শুরু হয়।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আসেন বর্ষারানী। গ্রীষ্মে মানুষের কষ্ট দেখে রানীর দুটি চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় করুণা গলে গলে পড়তে থাকে। দশ দিক জুড়ে জল আর জল। এই জলে নদী-খালবিল ভরে যায়। মাঠে মাঠে ধানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবশ্য কখনও কখনও বেশি বর্ষণে বন্যাও দেখা দেয়, কিন্তু বর্ষার জল না পেলে সারা বছরের ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

ভাদ্র-আশ্বিন মাস শরৎকাল। শরৎ-কালের শোভা বড় সুন্দর। গ্রীষ্মের তাপ নেই। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াও নয়। জল ভরা নদী মাঠে মাঠে সবুজ ধান। গাছের পাতা দীপ্ত সবুজ রঙের। আকাশে জলহারা সাদা মেঘ যেন পাল তোলা নৌকার মত ভেসে চলেছে। এই আকাশ-জোড়া স্ফূর্তিই বাঙলাদেশে দুর্গাপুজো-কালীপুজোর মধ্যে ফুটে ওঠে।

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস হেমন্ত ঋতু। হেমন্ত ঋতুটি মোটামুটি শরতের মতই থাকে। তবে হালকা শীতের আমেজ পড়ে। কিন্তু এই ঋতুতে ঘরে ওঠে প্রচুর শস্য। চারদিকে কর্মব্যস্ততা ও আনন্দ। নেহাতই গরীব-দুঃখী তাদেরও কিছুদিনের মত খাওয়ার দুঃখটা দূর হয়।

পৌষ-মাঘ শীত ঋতু। তীব্র শীতে সমস্ত পৃথিবীর হাড় পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। সাপ, ব্যাঙ, পোকা-মাকড়দের দল মাটির গর্তে ঢুকে পড়ে কয়েক মাসের জন্য। গাছের পাতা ঝরে যায়। ন্যাড়া গাছে লাগে শীতের কাঁপন। কিন্তু তাই বলে

শীত অনাদরের নয়। শীতে আসে খেজুর রস—নলেন গুড়। একদিন রেঁধে তিনদিন খাওয়া যায়। তাই পিঠে-পুলির ধুম। অন্যদিকে নানা রকম তরকারি ও ফলের বাজার সরগরম। শীতকে অনায়াসেই উপভোগ করা যায় যদি অর্থ থাকে। শীতে গরীব লোকের বড় কষ্ট।

ফাল্গুন-চৈত্র বছরের শেষ দুটি মাস—শেষ ঋতু বসন্ত। যেন বছর বিদায়ের আগে বসন্ত উৎসব শুরু করে শীতের তীব্রতা কেটে আসে, কিছু গরমের ছোঁয়া। চারদিকে নতুন পাতায় কচি সবুজের ঝলকানি। গাছে গাছে ফুলের সমারোহ। বসন্তের আকাশে কোকিল কুহু কুহু আওয়াজ তুলে যেন বলে, 'আজ কোনও কাজ নয়—আজ শুধু আনন্দ আর আনন্দ।' এই আনন্দের পরিবেশে শুরু হয় দোল উৎসব। এমনি করে বছরের পরতে পরতে হয় রূপের বদল। এর সাথে বদল হয় আমাদের জীবনযাত্রা, খাওয়া-দাওয়া, উৎসব যাত্রা। ভারতের জীবনে ঋতুচক্রের প্রভাব কাটাবার উপায় নেই।

পঠ সহায়ক পাঠ

উপপাঠ্যে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পৃথক পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট আছে। বহু বিদ্যালয়ে সে পাঠ্যসূচী না মেনে দশম শ্রেণীতে পড়বার অংশও নবম শ্রেণীতে পড়ান হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এতে ছাত্রছাত্রীদের কোন অসুবিধা হবে না কিন্তু বর্তমানে অনেকে অসুবিধায় পড়ছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকমশাই নিশ্চয়ই কোন বিশেষ বিবেচনায় রীতিবিরুদ্ধ এ কাজ করছেন। এমন ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী যে অসুবিধায় পড়ছে—তা দূর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা পর্ষদ নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করব।

কথা ও কাহিনী

বন্দীবীর

এবারে আমরা কবিতাটির মূল অংশে এসে পৌঁছেছি। বান্দার প্রতি মোগল বাদশা অত্যাচারের চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু তার দ্বারাও বান্দাকে নতি স্বীকার করাতে পারেননি। অবশেষে তার স্নেহের ওপর পীড়ন করতে চাইলেন শাসকেরা। কাজী বললেন, নিজ হাতে তার পুত্রকে হত্যা করতে হবে। বান্দা কেঁদে কেটে বাদশার কাছে আদেশ ফিরিয়ে নিতে বললেন না। প্রিয় পুত্রকে কোলে তুলে শেষ আদর করে, তার কানে কানে অভয়মন্ত্র শুনিয়ে তার বক্ষে ছুরি বসিয়ে দিলেন। বালকও আর্তনাদের পরিবর্তে 'গুরুজির জয়', বলে লুটিয়ে পড়ল।

এবারে ঘাতক এল বান্দার পাশে। গরম সাঁড়াশি দিয়ে দেহের চামড়া টেনে ছিঁড়ে হত্যা করা হল তাঁকে। বান্দার মুখ থেকে একটি কাতর ধ্বনিও নির্গত হল না।

এই আত্মদান দেখে সভার সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল।

দশম স্তবক

সপ্তাহকালের মধ্যে বান্দার সাত শত অনুচরকে হত্যা করা হল। এবার কাজি বান্দার এক ছেলেকে বান্দার কোলে তুলে

দিলেন। বললেন, নিজ হাতে একে তোমায় বধ করতে হবে। ছেলেটির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এর পর। ছেলেটি কিশোর বয়সী। তার হাত বাঁধা।

প্রশ্ন

১. বান্দাকে কাজি কি আদেশ দিলেন? তার আগে কাজির আদেশে কি হয়েছিল?

২. 'দিল তার কোলে ফেলে···বান্দার এক ছেলে।'—এই ছেলেটির বর্ণনা দাও।

একাদশ স্তবক

এই স্তবকটি বড় করুণ। কবি বান্দার মনোভাব ব্যক্ত করেননি। কিন্তু তার খুঁটিনাটি কার্যকলাপের বর্ণনার ভেতর দিয়ে মনের বাৎসল্য এবং দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি লিখছেন—

বান্দা বললেন না কিছুই। ধীর ভাবে ছোট ছেলেটিকে টেনে নিল কোলে। ক্ষণেকের জন্য তার মাথায় রাখলেন ডান হাত—আশীর্বাদ করলেন তাকে। একবার তার মাথার পাগড়ীটিতে চুম্বন রাখলেন সস্নেহে। তারপর ধীর ভাবে কোমর থেকে ছুরিকা তুলে নিলেন। বালকের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কানে কানে বলল, জয়, গুরুজির মন্ত্র উচ্চারণ কর পুত্র। কোন ভয় নেই।

প্রশ্ন

১. কাজির আদেশ শুনে বান্দা কি বললে? এর দ্বারা বান্দার চরিত্রের কি পরিচয় ফুটে ওঠে?

উঃ সঃ কিছুই বলেনি। দৃঢ়তা ও আত্মসংযম।

২. বান্দা পুত্রকে হত্যার আগে তাকে কোলে নিয়ে কি কি করে?

দ্বাদশ—চতুর্দশ

বাবার কথা শুনে কিশোর বালকের মুখমণ্ডল নির্ভয়তার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বালক বাবার মুখের দিকে চেয়ে যেন গান গেয়ে উঠল, 'গুরুজির জয়, কিছু নাহি ভয়।' বালক কণ্ঠের সেই অভয় মন্ত্রোচ্চারণে কেঁপে উঠল সভাস্থল।

বান্দা তখন বাঁহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলেন। আর ডান হাতে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন বালক 'গুরুজির জয়' বলে অন্তিম আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এরপর বান্দার হয়ত বা সমস্ত বোধ-শক্তি লোপ পেল। ঘাতকেরা সাঁড়াশি গরম করে তার দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে হত্যা করল। স্থির হয়ে রইলেন বান্দা। একটি কাতর শব্দও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হল না। দর্শকের দল চোখ মুছল—সভাস্থল নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

প্রশ্ন

১. 'কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল'—ঘটনাটি বর্ণনা কর।

২. 'ইহারে বধিতে হইবে নিজ হাতে অবহেলে।'—কে কাকে এই আদেশ দেন? এই আদেশ কিভাবে প্রতিপালিত হয়?

৩. 'দর্শক দল মুদিল নয়ন, সভা হল নিস্তব্ধ।'—কি দেখে দর্শকেরা চোখ বুঁজল ও সভা নিস্তব্ধ হল? এই ঘটনায় তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর।

এতক্ষণ বিচ্ছিন্ন স্তবকগুলোর ওপর থেকে তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। এবার সামগ্রিক কবিতা থেকে প্রশ্ন দিচ্ছি।

১. 'বন্দীবীর' কবিতাটিতে কতখানি ইতিহাস অনুসরণ করা হয়েছে?

উঃ সঃ আগেই আমরা এর ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করেছি। সেখানেই পাবে কোথায় কতটুকু পরিবর্তন করেছেন কবি। খুঁটিনাটি পরিবর্তনে ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

মোট কারণ ও ফলাফল এতটুকু পরিবর্তিত হয়নি।

২. বন্দীবীর কবিতাটির গল্প নিজের ভাষায় বল।

উঃ সঃ গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁর অনুচর শিখদের নবীন মন্ত্রে জাগিয়ে তুলে গুরু হত্যার প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করলেন···' এখান থেকে শুরু করবে। এরপর গুরুদাসপুরের যুদ্ধ ··শিখদের পরাজয়···দিল্লীতে বন্দী শিখদের আনয়ন···বিচার···শিখ হত্যা ·বান্দাকে পুত্র হত্যার আদেশ পুত্র হত্যা· নিজের আত্মদান·····সকলের বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা।

৩. এই কাহিনীতে বান্দার চরিত্র কিরূপ ফুটে উঠেছে?

উঃ সঃ ১ গুরুভক্তি। ২ বীরত্ব। ৩. বাৎসল্য। ৪. দৃঢ়তা। ৫. জীবনের চাইতেও মানকে বড় ভাবা তার চেয়েও বড় আদর্শ।

কবিতা সংকলন

হে মোর দুর্ভাগা দেশ

এই কবিতাটি প্রথম দুই স্তবক সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে ১৬ এপ্রিল সংখ্যায়। ভুলবশত পরের সংখ্যায় 'তা বটে ত তা বটেই ত' কবিতা শুরু করা হয়ে গেছে। এবারে আমরা অবশিষ্ট অংশ মুদ্রিত করলাম।

তৃতীয় স্তবক ঃ হে আমার দেশ (অর্থাৎ, দেশবাসীগণ) তোমরা যাকে নিচে ফেলে রাখছ, সেই তোমাকে নিচে টানছে। যাকে তুমি অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে দিচ্ছ, আড়ালে ফেলে রাখতে চাইছ যারে, সে তোমার সমস্ত মঙ্গলকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। একদিন অপমানে তাদের সমান হতে হবে।

আলোচনা ঃ আমাদের সমাজে যে অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি সংস্কার রয়েছে, তার ফলে একদল মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, নিচু করে রাখি। অর্থনৈতিক দিক থেকেও একে ব্যাখ্যা করা যায়। একদল ধনী, অন্যদল একান্ত দরিদ্র। সমাজের এই বৈষম্য কখনই সমাজকে পূর্ণগতিতে অগ্রসর হতে দেয় না। জাহাজের সঙ্গে ভারবাহী বোট বেঁধে দিলে জাহাজের গতি রুদ্ধ হয়। একদল বিদ্বান অন্যদল মূর্খ থাকলেও সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। এর থেকে রক্ষা পেতে গেলে সমাজের সকলকে প্রায় সমান সম্মানীয় ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

প্রশ্ন

১. 'যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে।' এই পংক্তিটির অর্থ বল। এর ভাব নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

২ 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' কাদের কিভাবে পশ্চাতে রাখা হয়েছে? তারা পশ্চাতে টানতে পারে কিভাবে?

৩ 'তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে যে ঘোর ব্যবধান।' কে গড়ছে? কেন গড়ছে?

চতুর্থ স্তবক ঃ শতেক শতাব্দী ধরে একদল মানুষকে অসম্মান করা হয়েছে। তাদের মধ্যেও যে মানুষের নারায়ণ আছে, তাকে ত প্রণতি জানান হয়নি। (ওগো বুদ্ধিমান সমাজ পরিচালকেরা! ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ত খুব দেবতাকে ডাকছ) চোখ নত

করে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখেছ কি যে হীন ও পতিতজনের দুঃখে কাতর ভগবান, তাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে মাটিতে নেমে এসেছেন। একদিন অপমানিতদের মত অন্যদেরও অপমানিত হতে হবে।

আলোচনা ঃ স্তবকের সূচনায় যে 'শতেক শতাব্দী' বলেছেন কবি, তার অর্থ ভেদ আমরা করতে পারিনি। 'শতেক শতাব্দী' বলতে (১০,০০০) দশ হাজার বছর বোঝায়। আমরা জানি মুসলমান ধর্ম এদেশে প্রচারিত হবার পর থেকেই সমাজ সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা কাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট আচরণ প্রথম করেছে তার হিসাবে না গিয়েও বলা যায় যে, এ ইতিহাস বড়জোর ছ'সাত শতাব্দীর। সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা যদি আর্যদের ভারত-আগমণের কাল থেকেও হয়, তবু তা মাত্র হাজার আড়াই বছর আগের কথা। তবে কবি 'শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার' লিখলেন কেন ? আমরা এর ঠিক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারলাম না। শিক্ষাবিদদের কাছে অনুরোধ তাঁরা এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা অনুমান করলে—তা জানাবেন।

মানুষের নারায়ণ ঃ প্রত্যেক মানুষই ভগবানের অংশ। অতএব কোন মানুষকে অসম্মান করার অর্থ তার ভেতরে ভগবানের যে অংশ আছেন তাঁকেই অসম্মান করা।

হীন পতিতের ভগবান ঃ ভগবান ন্যায়ের প্রতিরূপ। তিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি। কিন্তু যে মানুষ অন্য মানুষের দ্বারা নিপীড়িত, তার প্রতি ভগবানের করুণা বেশি। এই বিশ্বাসের বলে ভগবানকে 'হীন পতিতের ভগবান' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন

১. 'মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।' 'তবুও' বলতে কি বোঝান হয়েছে 'মানুষের নারায়ণ' বলতে কি বোঝ ?

২. 'হীন পতিতের ভগবান' বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ? তিনি কেন ধুলায় নেমেছেন।

৩ 'তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও নাকি ?' কে আঁখি নত করবে ? কেন নত করা দরকার ? কি দেখতে পাচ্ছে না ?

শেষ স্তবক ঃ এখনও কি তুমি দেখছ না যে তোমার দরজায় মৃত্যুদূত এসে দাঁড়িয়েছে। সুসভ্যজাতি হিসাবে তোমার যে অহঙ্কার, তার বুকে এঁকে দিল অভিশাপ। যদি এখনও সকলকে ডাক না দাও—নিজ শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে দূরে সরে থাক, নিজের চারদিকে জড়িয়ে রাখ ঐ অভিমান—তবে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

আলোচনা ঃ এখানে তুমি অর্থে সমগ্র ভারতীয় জনতা। 'মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে' বলতে ধ্বংসেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। সমাজ যদি আত্মীয়ভাবাপন্ন না হয়, যদি সকলে সমবেত না হয়—তবে জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে।

প্রশ্ন

১. 'জাতির অহঙ্কার' বলতে কি বোঝায় ? সেখানে অভিশাপ আঁকা হবে কেন ?

২. 'মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।' কেন মৃত্যু আসবে ? চিতাভস্মে কিভাবে সমান হবে ?

কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ● দ্বিতীয় পত্র

পুনরনুশীলন

পাঠ সংকলন গদ্যাংশ

গদ্যাংশে আমাদের পড়া হয়েছে মাত্র দুটি রচনা। 'সমুদ্রপথে' এবং 'ভানুসিংহের পত্র'। 'সমুদ্রপথে' গত সংখ্যায় পুনরালোচনা করা হয়েছে। এ সংখ্যায় 'ভানুসিংহের পত্র'র আলোচনা হবে।

আমরা মূল আলোচনার সময়েই এর থেকে যত রকম প্রশ্ন সম্ভব তা আলোচনা করেছি। এখানে টেস্ট পেপার ও পরীক্ষার প্রশ্নাদি থেকে এই রচনার প্রধান প্রশ্নগুলো একত্র সন্নিবিষ্ট করছি। প্রশ্নের নিচে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উত্তর সংকেত রইল।

ভানুসিংহের পত্র

বড় প্রশ্ন

১. 'পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে বাঁকেনি চোরেনি, নড়ে যায়নি।' —মন্তব্যটি কার? পাহাড়টার নাম কী? 'আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে' বলতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন, অল্প কথায় জবাব দাও। [১+১+৮]

উঃ সঃ [প্রশ্নটি যথোপযুক্ত নয়। এটি ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের মধ্যেই যাওয়া উচিত ছিল। প্রথম দুই অংশের জন্য যদি এক এক নম্বর, তাহলে শেষাংশের জন্য আট নম্বর বড্ড বেশি দেওয়া হয়েছে। এসব ভেবে উত্তর লিখবে।]

মন্তব্যটি যে ভানুদাদার (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের) তা তোমরা জান।··· পাহাড়টির নাম শিলং পাহাড়; অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাই বলে বর্ণনা করেছেন। ···প্রথম থেকেই এমনভাবে বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেন ভাগ্যদেবতা ওঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেই চলেছেন, আর ওঁদের গ্রহের গুণে ওঁরা সে চক্রান্তের জাল কোনক্রমে কাটিয়ে উঠছেন। তাই হাওড়ার কাছে গঙ্গায় পড়ে গিয়েও ডুবে যাননি রবীন্দ্রনাথ —শুধু কাদায় মাখামাখি হয়েছিলেন— আসাম মেল কবে ঝাঁকুনি দিয়ে ভাগ্য দেবতার ষড়যন্ত্রে রক্তরস থেকে প্রাণ ছেঁকে নিতে চাইলেও পারেনি—সময় চলে গেলেও মোটর অবশেষে এসেছে···শেষ পর্যন্ত ভাগ্যদেবতা হয়েছেন পরাজিত। গ্রহের গুণে

জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করে প্রত্যেক জাতকের জন্মলগ্নে যে গ্রহ অধিষ্ঠিত থাকে, তারই প্রভাব থাকে জাতকের ওপর বেশি। অন্য সব গ্রহের প্রভাব সে কাটিয়ে দেয়। এখানে গ্রহবৈগুণ্য বলতে সেই জন্মকালীন গ্রহটির প্রভাবের কথা বলা হয়েছে।

২. 'কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গা স্নান হয়েছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল।'—কোথায় কখন এবং কার কাদার মধ্যে পড়ে গঙ্গাস্নান হয়েছিল? ব্রহ্মপুত্রের জলের স্নানকে পঙ্কিল বলা হয়েছে কেন? 'গোয়ালন্দগামী স্টিমার ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয়' নিতে লেখক ও তাঁর সঙ্গীরা কেন বাধ্য হয়েছিল? [(১+১+১)+২+৫]

উঃ সঃ বোলপুর থেকে জোড়াসাঁকো আসবার সময় গাড়ি দেরিতে পৌঁছানর ফলে লেখক আর নৌকার সেতু দিয়ে সহজে গঙ্গাপার হতে পারেননি। তখন নৌকা করে পার হবার ব্যবস্থা হয়। ভাঁটার টানে জল গেছে সরে। ডাঙা থেকে নৌকা পর্যন্ত কাদা। তাই এক মাঝি রবীন্দ্রনাথকে কোলে করে পার করে দিতে গেল। হঠাৎ সে গেল পড়ে—রবীন্দ্রনাথও কাদায় পড়ে গেলেন। ···বন্যার ফলে জলটাই ছিল ঘোলা···পাঁক-মেশান···স্নানের জন্য যেন জলের বদলে পঙ্কযুক্ত অর্থাৎ পঙ্কিল জল ঢালা হল।··· মোটরের হঠাৎ অচল হওয়া···গাড়ি সারাতে না পারা এবং ডাকবাংলোয় স্থানাভাব··

৩. 'পথে কত যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই।'—বক্তা কে? কোন পথের কথা বলা হয়েছে? তার যাত্রাপথের সঙ্গীদের নাম কর। ব্রহ্মপুত্র পার হবার পর যে সব বিঘ্ন ঘটেছিল তাদের বিবরণ দাও।

[২+২+৬]

উঃ সঃ বক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা ভানুদাদা।···বোলপুর থেকে জোড়াসাঁকো হয়ে শিলং পাহাড়ে ব্লুকসাইড নামক বাড়িতে পৌঁছান পর্যন্ত সমগ্র পথের কথাই বলা হয়েছে···জোড়াসাঁকো থেকে যাত্রাকালে সঙ্গী ছিলেন কমল বৌঠান ও দিনুবাবু আর সাধুচরণ। গৌহাটিতে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন প্রতিমা দেবী এবং রথীন্দ্রনাথ। ···পার হবার পর বিঘ্ন ১. গাড়ি দেরিতে আসা···ফলে শিলং যেতে না পারা·· ২. গাড়ি বিকল হওয়া···৩. সন্ধ্যা হওয়ায় গাড়ি সারাতে না পারা···৪. ডাকবাংলোতে ভিড়···৫. স্টিমারে নিশিযাপন···ঠাণ্ডা হাঁপানি ও কাশি···৬. হাতি কেনার দামে মটর গাড়ি সংগ্রহ···৭. পথে সাধুচরণের অচল গাড়ির সাক্ষাৎ···।

৪. বোলপুর-শান্তিনিকেতন হইতে শিলং পাহাড় যাত্রাপথে কবি দুর্ভোগ-বিড়ম্বনাকে কিভাবে কৌতুকরসের মাধ্যমে লঘু করিয়া তুলিয়াছেন, 'ভানুসিংহের পত্র' অনুসরণে তাহার উত্তর দাও।

[৫×২]

উঃ সঃ এ প্রশ্নটি খুব সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নয়। তবু যে কোন শিক্ষার্থীরই এ প্রশ্নের উত্তর বাড়িতে লিখতে চেষ্টা করা উচিত। কারণ দুর্ভোগ বিড়ম্বনাকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে কৌতুকরসে পরিণত করেছেন এবং লঘু করে তুলেছেন, তা যদি কেউ না বুঝে থাকে তবে সে এই রচনা পাঠের থেকে কোন আনন্দ লাভও করতে পারেনি—শিক্ষাও হয়নি।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সামান্য যাত্রাকে বিশ্বনিখিলের গ্রহ-নক্ষত্র ভাগ্য-দেবতা, গঙ্গাদেবী ইত্যাদি নানা লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির ষড়যন্ত্র ও দ্বন্দ্বের এক কাল্পনিক সংগ্রামরূপে চিত্রিত করেছেন। সামান্য বিষয়কে এমন গুরুত্ব-পূর্ণ করে বর্ণনা করার মধ্যেই একটা হাস্য-রসের পরিবেশ রচিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ ভাষাপ্রয়োগ।। যেমন, পাঁচ-জন পুরলেই পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ উপমা প্রয়োগ।। মোটর-গাড়িকে নারীরূপে কল্পনা করে ভাগ্য দেবতার কটাক্ষপাতে থেমে যাওয়া। বা দেহের রক্তরসকে দই-এর সঙ্গে তুলনা ইত্যাদি।

৫. ভানুসিংহের পত্রটি কে কাকে কী উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন? 'ভানুসিংহ' কথাটি বিশ্লেষণ করে দেখাও যে এটি লেখকের ছদ্মনাম। লেখক বৃহস্পতি-বারের বারবেলায় কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে যাত্রা করায় ভাগ্য তাঁকে ঘাড়ে ধরে কী কী অশুভ পরিণতিতে নিয়ে গেল তার উল্লেখ কর। এখানে কী অদৃষ্টবাদ

প্রকাশ পেয়েছে অথবা অন্য কিছু? পত্রটির শেষে এমন কিছু মন্তব্য আছে কি যা থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়—একটু বুঝিয়ে বল।

উঃ সঃ রাণু অধিকারীকে শিলং-বাস উপলক্ষ্যে। ···ছদ্মনাম সম্পর্কে আলোচনা দেখ (১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা) ·১ মে সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠায় সূত্রাকারে সংকেত দেওয়া আছে আদৌ অদৃষ্টবাদ নয়—বরং অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ··· পুরস্কারের জয় ঘোষণা (১৬ মার্চ সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠা দেখ)···গ্রহবৈগুণ্যে নড়েনি···।

৬. 'দেখে আশ্চর্য বোধ হল এখনও পাহাড়টা ঠিক আছে, তাই তোমাকে চিঠি লিখছি'—কোথাকার কোন পাহাড়? পাহাড়টা ঠিক নাও থাকতে পারে—লেখকের মনে এইরূপ আশঙ্কার কারণ কি? সংবাদটি তিনি কাহাকে দিয়েছেন? লেখকের বক্তব্যের ভেতর দিয়ে কিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

ব্যাখ্যা লিখবার সাধারণ সূত্রগুলো মনে রেখ। প্রশ্নে রচয়িতার নাম, রচনার নাম এবং উদ্ধৃতাংশ কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এসব জানতে চাওয়া হোক বা না হোক—লিখবেই।

এবার মূলতঃ প্রশ্নগুলো অবলম্বন করে উদ্ধৃতাংশের প্রকৃত বক্তব্য এবং আগে পরের অংশগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্কে তোমার জানা সব কথা বলবে।

নিচের ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নগুলোর সমস্ত সূত্র আমাদের পূর্বের আলোচনায় আছে। সংশ্লিষ্ট অংশ দেখ।

প্রশ্ন

১. 'জিনিস রইল পড়ে, আমরা এগিয়ে চললুম।' উক্তিটি কার? 'আমরা' অর্থে কে কে? 'জিনিস' পড়ে থাকার ব্যাপারটি বুঝিয়ে বল। 'এগিয়ে' চলা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল জানাও।

[১+২+২+৩]

২ 'এবার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন।'

১. উক্তিটি কাহার? ইহা কোন্ রচনার অন্তর্গত? ২. কি প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হইয়াছে? ৩. বক্তব্যটির হাস্যরস বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাখ্যা কর। ৪. এবার বলতে বক্তা কোন্ বারের কথা বলেছেন? ৫. ভাগ্য কিভাবে বক্তাকে স্নান করাল?

[১+২+৫]

৩. 'বোলপুর থেকে রাত্রি এগারোটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হয়েছিল সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল।'—কোন্ রচনা থেকে উদ্ধৃত? দুটি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য কোথায়? এই উক্তি থেকে বক্তার মনের কি পরিচয় পাওয়া যায়? [১+৪+৩]

৪ ভূগোলে পড়া গেছে—পৃথিবীর তিনভাগ জল; একভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল।'—অংশটি কোন্ রচনার অন্তর্গত? কে, কাহাকে, কিভাবে ইহা জানাইতেছেন? প্রসঙ্গ কী? ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। [১+২+৩+২]

৫. 'পথে যে কত বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই'—এখানে কোন্ পথের কথা বলা হয়েছে। এই পথের একটি বিঘ্ন উল্লেখ কর। এরজন্য লেখক কাকে কেন দায়ী করেছেন? [১+৫+২]

৬. 'কিছু দূরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ 'ন যযৌ ন তস্থৌ।'

—কে, কাকে একথা জানাচ্ছেন? অবস্থাটি বর্ণনা কর। বাক্যাংশটি মূলত কোথা হতে নেওয়া হয়েছে? [২+৫+১]

৭. 'পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের

গ্রহবৈগুণ্যে বাঁকেনি, চোরেনি, নড়ে যায়নি', —কোন্ পাহাড়ের কথা বলা হইয়াছে? 'আমাদের বলিতে কাদের কথা বলা হইয়াছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। 'গ্রহবৈগুণ্য' কথাটির অর্থ কি? [১+৩+৪]

৮. 'পাহাড়টা ঠিক আছে?'—কে কাহাকে কোন্ পাহাড়ের কথা জানাইয়াছেন? পাহাড়টি ঠিক না থাকিবার কথা মনে জাগিয়াছিল কেন? [১+৭]

৯. 'তাতে আমাদের পাঁচজনকে পুরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত।'—পাঁচজন কে কে? কোন্ প্রসঙ্গে, কাকে লেখক একথা জানিয়েছেন? উক্তিটির মাধ্যমে লেখকের রচনা বৈশিষ্ট্যের কি পরিচয় পাওয়া যায়? [২+৪+২]

১০. 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—কার লেখা, কোন্ কাব্য থেকে লেখক এটি উদ্ধৃত করেছেন? সেখানে কার, কি অবস্থা বর্ণনাকালে উক্তিটি করা হয়েছিল? এখানে কার কোন্ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? উক্তিটিতে লেখকের কোন্ মনোভাবের পরিচয় মেলে? [৮]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

রচনাটি পাঠের সময় আমরা সমস্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করেছি। তোমাদের প্রস্তুতির পরীক্ষার জন্য টেস্ট পেপার থেকে নিচের দশটি প্রশ্ন সংগ্রহ করে দিলাম। সবকটি প্রশ্নের উত্তরই তোমাদের পারা উচিত।

১. 'তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষপাত করতেই সে বিকল হয়েছে।' —'তিনি' অর্থে কে? 'আমাদের কলের প্রতি' বলতে কোন্ বিশেষ কল? 'কটাক্ষ-পাত' কথাটির মানে কী? [১+১+১]

২. 'তাতে দেহ স্নিগ্ধ হল বটে, কিন্তু নির্মল হল বলতে পারিনে।' প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। 'স্নিগ্ধ ও 'নির্মল' শব্দ দুটির অর্থ-পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। [১+১]

৩. 'এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন।'—উক্তিটি কার? তীর্থোদক শব্দটির প্রচলিত অর্থ কী? এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত? [১+১+১]

৪. 'ভানুসিংহের পত্র' অংশ হইতে তিনটি হাস্যপরিহাসময় উক্তি উদ্ধৃত কর। [৩]

৫. 'কিছু দূরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ।'

কে বলেছেন? কোন্ প্রসঙ্গে? 'ন যযৌ ন তস্থৌ' কথাটির অর্থ কী? [১+২+১]

৬. 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—উদ্ধৃতিটির অর্থ কি? কার লেখা কোন্ মূলগ্রন্থ থেকে, কে উক্তিটি গ্রহণ করেছেন? [২+১]

৭. 'আমাদের পাঁচজনকে পুরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত।'—এই পাঁচজন কারা? পঞ্চত্ব শব্দের অর্থ কী? [২+১]

৮. 'হাতি কেনার চেয়ে বেশি' —অ. হাতি কেনার চেয়ে কী বেশি ছিল? আ. হাতি কেনার উল্লেখের তাৎপর্য কি? [১+২]

৯. 'রথী আমাদের একখানা মোটর গাড়ী গৌহাটি স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'—১. রথী কে? ২. গৌহাটি কোথায়? ৩. কি উদ্দেশ্যে মোটর গাড়িটি পাঠান হয়েছিল? [১+১+১]

১০. 'রাতটা এইরকম দুঃখে কাটল।' —কোন্ রাতের কথা বলা হয়েছে? কারা দুঃখে রাত কাটিয়েছিলেন? কিরকম দুঃখে কেটেছিল? [১+১+২]

ব্যাকরণ

গত সংখ্যায় আমরা কর্মের দিক থেকে এবং অর্থ-সমাপ্তির ক্ষমতার দিক থেকে ক্রিয়াকে চিনেছি। এবারে ক্রিয়াকে আরও দুটি নতুন দিক থেকে চিনব। এ দুটি হল—১. ভাব বা প্রকারের দিক থেকে, আর ২. ক্রিয়ার বিভক্তি ও কালের দিক থেকে।

১. প্রকার বা ভাবের দিক থেকে ক্রিয়ার বিভাগ

ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বাক্যের কর্তা সম্পর্কে ভঙ্গী বা রীতি প্রকাশ পায়। কথাটা সোজা করে বললে এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক বাক্যে আমরা কর্তা কিভাবে কাজটি করে (করেছিল বা করবে) তা প্রকাশ করি। ক্রিয়া ঘটবার এই রীতিটাই প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার।

উদাহরণ হিসেবে তিনটি বাক্য নেওয়া যাক। ক. সে যায়। খ. সে যাক। গ. সে যদি যায়। এই তিন বাক্যে ক্রিয়া ঘটবার তিনটি পৃথক রীতি প্রকাশিত হয়েছে। ক-উদাহরণটি কেবল সাধারণ ভাবে ক্রিয়া ঘটবার একটা ধারণা দিচ্ছে। খ-উদাহরণে বক্তার আদেশ, অনুমোদন বা প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। গ-উদাহরণে ঘটনা ঘটা সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তার ভাব প্রকাশিত হয়েছে। **ক্রিয়ার দ্বারা, কর্তা সম্পর্কে কাজটি ঘটবার রীতি সম্পর্কে এই যে ধারণা প্রকাশ করা হয়—একেই ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বলে।**

সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়ার এমন প্রকার—প্রকাশের রীতি থাকলেও কোন সংস্কৃত ব্যাকরণে 'প্রকার' সম্পর্কে আলোচনা নেই। রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'গোড়ীয় ভাষা ব্যাকরণে' ইংরাজী Mood শব্দের প্রতিশব্দরূপে প্রথম 'প্রকার' শব্দটির প্রয়োগ করেন। পরে বহু ব্যাকরণবিদ কখনও 'প্রকার' কখনও 'ভাব' বলে ক্রিয়ার ভাব-প্রকাশক অবধারণাকে বুঝিয়েছেন।

ওপরে আমরা ক, খ ও গ নামে যে তিনটি উদাহরণ গ্রহণ করেছি, তা থেকে বোঝা যাবে যে **বাঙলা ভাষায় ক্রিয়ার ভাব-প্রকাশক প্রকার তিন প্রকার।** ক-উদাহরণকে নির্দেশক বা অবধারক প্রকার; খ-উদাহরণকে অনুজ্ঞাবাচক বা নিয়োজক প্রকার আর গ-উদাহরণকে ঘটনান্তরাপেক্ষিত বা সংযোজক প্রকারের উদাহরণ বলা যায়।

সাধারণভাবে ক্রিয়ার উল্লেখ করলে তাকে ক্রিয়ার নির্দেশক ভাব প্রকাশক প্রকার বা অবধারক ভাব প্রকাশক প্রকার বলে। সংক্ষেপে একে নির্দেশক বা **অবধারক প্রকারও** বলা যায়। ইংরাজীতে এই ধরনের ভাব প্রকাশক প্রকারকে **Indicative mood** বলে। যেমন—তাপু গল্প লিখছে। মালা কাল যাদুঘর দেখতে গিয়েছিল। জিতেনবাবু রোজ দুধ নিয়ে আসেন।

লক্ষ্য কর এখানে কর্তার কাজ ও অবস্থাকে ক্রিয়া একান্ত সাধারণ ভাবে ব্যক্ত করেছে মাত্র। এর দ্বারা কর্তা সম্পর্কে অতি সাধারণ একটি অবধারণা গড়ে ওঠে। এই জন্যই একে নির্দেশক বা অবধারণা প্রকার (ভাব) বলা হয়।

ক্রিয়া দ্বারা আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, আশীর্বাদ বোঝালে ক্রিয়ার প্রকারকে অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশক প্রকার বা নিয়োজক

ভাব প্রকাশক প্রকার এবং সংক্ষেপে **অনুজ্ঞাবাচক** বা **নিয়োজক প্রকার** বলে। ইংরাজী ভাষায় এই প্রকারকেই Imperative mood বলে। যেমন— এখন বুঝে নাও, পরে লিখবে। এখনকার মত এখানেই থামা যাক।

> লক্ষ্য কর এই দুই বাক্যেই বক্তার বিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। এ জন্যই এদের অনুজ্ঞা বা নিয়োজক প্রকার বলে।

একটা ক্রিয়াপদ অন্য একটা ক্রিয়ার কারণ বা সময় সূচক হলে, প্রথম ক্রিয়ার মধ্যে যে ভাব সূচিত হয়, তাকে **ঘটনান্তরাপেক্ষিত** বা **সংযোজক প্রকার** বলে। ইংরাজীতে একে Subjunctive mood বলে। যেমন—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।' এখানে 'যদি না আসে' অংশটির ক্রিয়ার এই প্রকার হয়েছে। সাধারণভাবে -ইলে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা এই প্রকার সাধিত হয়।

এখন, প্রশ্ন এই যে নিষেধাত্মক বা প্রশ্নবোধক বাক্যের প্রকার কিভাবে স্থির হবে? সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে যে, 'নিবৃত্তৌ প্রবৃত্তিবৎ ক্রিয়ায়াঃ'। নিষেধাত্মক বাক্যের নিষেধ না থাকলে যে প্রকার হত, ঐ বাক্যেও সেই প্রকার হবে। প্রশ্নবোধক বাক্যেও একই রকম রীতি গৃহীত হবে।

ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার

নির্দেশক বা অবধারক প্রকার	অনুজ্ঞা বা নিয়োজক প্রকার	ঘটনান্তরাপেক্ষিত বা সংযোজক প্রকার

২. ক্রিয়া বিভক্তি ও ক্রিয়ার কাল

আগেই জেনেছি যে ক্রিয়ার মূলকে ধাতু বলে। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে। ধাতু মূল কাজের অর্থবোধ ঘটায় আর বিভক্তি দেয় কাল, পুরুষ ও প্রকার সম্পর্কে বোধ। এই দুটি মিলে সমগ্র ক্রিয়াপদের অবধারণ দিয়ে থাকে।

ক্রিয়া বিভক্তিগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগের নাম **মৌলিক বিভক্তি** ও দ্বিতীয় ভাগের নাম **যৌগিক বিভক্তি**।

যে ক্রিয়া বিভক্তিগুলো কোন প্রত্যয় বা অন্য কিছুর সহায়তা ছাড়াই, সরাসরি ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করতে পারে, তাদের মৌলিক বিভক্তি বলে। মৌলিক বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে সমস্ত কালের বোধ জন্মায়, তাদের মৌলিক কাল বলে। বাঙলায় মৌলিক কাল মাত্র ছটি। নিচে ছটি কাল ও তাদের জন্য প্রযুক্ত বিভক্তিগুলো লক্ষ্য কর।

১. নিত্য বর্তমান : -এ, -য়, -এল, -ন, -অ, -ইস, -এন, -ই।

২. সাধারণ অতীত : -ইলে, -ইলি, -ইল, -ইলেন, -ইলাম।

৩. নিত্যবৃত্ত অতীত : -ইত, -ইতেন, -ইতে, -ইতিস, -ইতাম।

৪. সাধারণ ভবিষ্যৎ : -ইবে, -ইবেন, -ইবি, -ইব।

৫. বর্তমান অনুজ্ঞা : -উক, -উন, -অ, -ও, -ই।

৬. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : -ইবে, -ইবেন, -ইস, -ইবি, -ইও, -ইয়ো, - ইঘ।

যে বিভক্তি সরাসরি মূল ধাতুর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে—ইয়া বা—ইতে প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পরে √ আছ বা থাক ধাতুর কোন মৌলিক কালরূপ হিসেবে বসে সমগ্র

সমাপিকা ক্রিয়াপদটি গঠন করে, তাকে বলে যৌগিক বিভক্তি। যৌগিক বিভক্তি দ্বারা যেসব কালের বিধি পাওয়া যায়, তাদের যৌগিক কাল বলে। অর্থাৎ

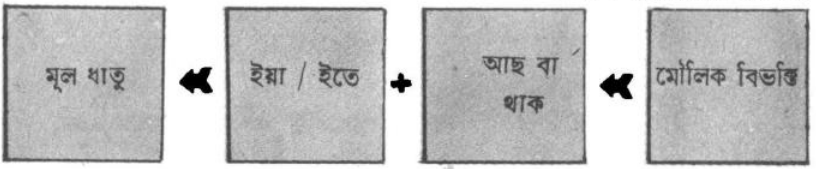

যেমন— √ কর্ + ইতে + √ আছ্ + ই = করিতে + আছি = করিতেছি (করছি)। এখানে 'ই' মৌলিক বিভক্তি।

বাঙলায় যৌগিক কাল মোটামুটি দুটি।

১. ঘটমান বর্তমান : ইতেছি, ইতেছ, ইতেছিস, ইতেছেন, ইতেছে।

২. ঘটমান অতীত : ইতেছিলাম, ইতেছিলে, ইতেছিলি, ইতেছিলেন, ইতেছিল।

৩. ঘটমান ভবিষ্যৎ : ইতে থাকিবে, ইতে থাকিবেন, ইতে থাকিবি, ইতে থাকিব।

৪. পুরাঘটিত বর্তমান : ইয়াছি, ইয়াছ, ইয়াছিস, ইয়াছেন, ইয়াছে।

৫. পুরাঘটিত অতীত : ইয়াছিলাম, ইয়াছিলে, ইয়াছিলি, ইয়াছিলেন, ইয়াছিল।

৬. ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য : ইয়া থাকিব, ইয়া থাকিবে।

কালভেদে ক্রিয়া বিভক্তি যেমন বিভিন্ন হয়, পুরুষ ভেদেও বিভক্তির তেমন পার্থক্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি কালেই উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষভেদে বিভক্তির রূপভেদ হয় কিন্তু তাদের একবচন ও বহুবচন ভেদে বিভক্তির রূপ পৃথক হয় না। অর্থাৎ প্রতিটি কালেই ক্রিয়াবিভক্তি তিনটি ভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। আবার কাল অন্তত বারটি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে একটি ধাতুর ছত্রিশটি রূপভেদ হতে পারে। কোন ধাতু অবলম্বনে ঐ ধাতুর সামগ্রিক রূপবিন্যাসকে ধাতুরূপ বলে। সামগ্রিক ধাতুরূপ বর্ণনার আগে প্রত্যেক কাল সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া দরকার।

ক্রিয়া ঘটার সময়বোধকে ক্রিয়ার কাল বলে। কাল তিন প্রকার— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

যে কাল আমরা পার হয়ে এসেছি— তা **অতীত কাল**।

যে কালে আমরা অবস্থান করছি– তা **বর্তমান কাল**।

যে কাল পরবর্তী সময়ে আসবে—তা **ভবিষ্যত কাল**।

অতীত কালের ক্রিয়াগুলোকে চারভাগে ভাগ করা হয়।

১. সবেমাত্র অতীত হল বোঝালে **সাধারণ** বা **নিত্য-অতীত** বলে। (নিত্য অতীত ক্রিয়া অনেক সময় কোন কাজ এইমাত্র সম্পন্ন হল, এই ভাবও প্রকাশ করে। যেমন—শিবাজী পালিয়ে গেলেন। এজন্য এই কালকে **ঐতিহাসিক অতীত** বলে।)

২. অতীতে কাজটি চলছিল, এরূপ সময় বোঝালে তাকে **ঘটমান অতীত** বলে। যেমন—আমি বই পড়ছিলাম।

৩. অতীতে কবে কাজ চুকে গেছে, আজ তার স্মৃতি শুনছি, এরকম বোঝালে **পুরাঘটিত অতীত কাল** হয়। যেমন— আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

৪. অতীতে প্রতিনিয়ত ঘটত এরকম বোঝালে **নিত্যবৃত্ত অতীত কাল** হয়। যেমন—ঠাকুমা রোজ ভোরে গঙ্গাস্নানে যেতেন।

বর্তমান কালের ক্রিয়াগুলোকে

চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যা প্রতিনিয়ত ঘটে, এরূপ বোঝালে তাকে **নিত্য বর্তমান কাল** বলে। যেমন—সূর্য পূর্বদিকে ওঠে।

২. বর্তমানে কাজটি যখন চলছে, তখনকার কথা বোঝালে তাকে **ঘটমান বর্তমান কাল** বলে। যেমন—বৃষ্টি পড়ছে।

৩. পূর্বে ঘটেছে কিন্তু এখনও তার জের চলছে, এরূপ কাল বোঝালে **পুরাঘটিত বর্তমান কাল** বলে। যেমন—একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়েছে।

৪. যে ক্রিয়াপদ বর্তমান কালে আদেশ বা অনুরোধ বোঝায়, তাকে **অনুজ্ঞা বর্তমান** বলে। যেমন—দয়া করে চুপ করুন।

ভবিষ্যৎ কলের ক্রিয়াপদগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ভবিষ্যতের কোন বিশেষ সময়কে না বোঝালে তাকে **সাধারণ ভবিষ্যৎ** বলে। যেমন—আমি চিঠি লিখব।

২. ভবিষ্যতে কোন কাজ ঘটতে থাকবে বোঝালে ক্রিয়ার সেই কালকে **ঘটমান ভবিষ্যৎ** বলে। যেমন—বিকেলে আমি খেলতে থাকব।

৩. একই বাক্যে যদি দুটি ভবিষ্যতের কথা থাকে তবে যেটি পূর্বের সেটি বোঝাতে **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** হয়। যেমন—তোমাকে ছেলেবেলায় হয়ত দেখে থাকব, কিন্তু মনে নেই।

৪. ভবিষ্যৎ কালে করার জন্য অনুরোধ বা আদেশ বোঝায় এমন ক্রিয়ার কালকে **অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ** বলে। যেমন—তোমাকে এই কাজ করতে হবে।

কয়েকটি বিশেষ কালনির্দেশক ক্রিয়ারূপ

১. যে ক্রিয়া অতীত কালের কোন কাল্পনিক (সম্ভাবনাময়) ঘটনার কথা ব্যক্ত করে, সেই ক্রিয়ার কালকে **সম্ভাবক অতীত** বলে। যেমন: যদি কাল বৃষ্টি হত তবে মোহনবাগান জিততে পারত।

২. ইতিহাসের ঘটনা বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপে বর্ণনা করলে সেই কালকে **ঐতিহাসিক বর্তমান** বলে। যেমন: ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়।

৩. আসন্ন ভবিষ্যৎ কাল বর্তমান ক্রিয়ারূপ দিয়ে প্রকাশ করলে তাকে **ভবিষ্যতের বর্তমান রূপ** বলে। যেমন—কাল সকালেই কলকাতা যাচ্ছি।

৪. অতি আসন্ন ভবিষ্যৎ কালকে নিত্য অতীত রূপ দিয়েও প্রকাশ করা যায়। এইরূপে প্রকাশিত কালকে **ভবিষ্যতের অতীত রূপ** বলে। যেমন—বৃষ্টি এল বলে।

৫. অনেক সময় অতীত কাল বোঝাতে ভবিষ্যতের রূপ প্রয়োগ হয়। এমন কালকে **অতীতের ভবিষ্যৎ রূপ** বলে। যেমন—লিখতে বসব এমন সময় আলো নিভে গেল।

৬. **বর্তমান অর্থে অতীত:** গরমে সেদ্ধ হয়ে গেলাম।

৭. **বর্তমান অর্থে ভবিষ্যৎ:** দেশে যদি আইন থাকবেই তবে এত অনাচার কেন?

৮. **অতীত অর্থে বর্তমান:** যখন চুরি হয়, তখন সেখানে কেউই ছিল না।

৯. **নিত্যবৃত্ত বর্তমান:** মহাপুরুষেরা সর্বদাই এ কথা বলে থাকেন।

১০. **প্রবাহাত্মক বর্তমান:** আমি লিখতে থাকি আর তুই লিখতে থাক।

এবার আমরা ধাতুরূপ সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রত্যেক কালে পুরুষ ভেদে যে যে বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তা একটু আগেই আলোচনা করেছি। এখন বিভক্তি সংযোগের রীতিগুলো লক্ষ্য কর।

১. বাঙলায় সাধু ভাষায় সমস্ত রকম ধাতুর জন্য একই শ্রেণীর প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করা হয়। সংস্কৃতের মত ধাতু বিশেষে প্রত্যাদির পার্থক্য বাঙলায় নেই।

২ বিভক্তি যোগ হলে ধাতুর স্বরবর্ণের (স্বরসঙ্গতি অনুসারে) উচ্চারণ বদল হয়। সাধারণত ই-কার, উ-কার-এর বদলে এ-কার, ও-কার উচ্চারণ হয়। যেমন, উঠে>ওঠে, শুনে>শোনে, বুঝাপড়া>বোঝাপড়া।

৩. যৌগিক কাল গঠনে √ আছ্ ধাতুর রূপ যুক্ত হয়। অনেক সময় বাঙলায় √ আছ্ এর আ লুপ্ত হয়। যেমন— আছিলাম>ছিলাম। প্রাচীন বাঙলা ভাষায় এবং আঞ্চলিক কোন কোন ভাষায় 'আ' লুপ্ত হয় না।

৪. বিশেষ কয়েকটি কালে √আছ্-এর বদলে √ থাক্ ধাতুরূপ যোগে যৌগিক কাল হয়।

আছ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
নিত্য বর্তমান	আছি	আছ, আছো আছিস আছেন	আছেন আছে
নিত্য অতীত	ছিলাম আছিলাম ছিলেন, ছিনু	ছিলে ছিলি ছিলেন	ছিলেন ছিল আছিল
নিত্যবৃত্ত অতীত	থাকিতাম	থাকিতে থাকিতিস থাকিতেন	থাকিতেন থাকিত
নিত্য ভবিষ্যৎ	থাকিব	থাকিবে থাকিবি থাকিবেন	থাকিবেন থাকিবে

গদ্য সহায়ক পাঠ

পদার্থবিদ্যার নবযুগ ঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বেতার ও টেলিগ্রাফ

গত সংখ্যায় আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম উপশিরোনাম আবিষ্কারক অন্তর্গত পাঁচটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবারে আমরা এসে পৌঁছালাম দ্বিতীয় উপশিরোনামের অন্তর্গত অংশে।

বেতার সংকেত প্রেরণ

লেখক বেতার সংকেত প্রেরণ পর্বে হঠাৎই জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের কথা এনে ফেলেছেন। আসলে এইকালে জগদীশচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে আপনমনে ঐ তরঙ্গ সম্পর্কে গবেষণা করে চলছিলেন। সর্ব-

প্রকার প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি ঈথর-তরঙ্গ সম্পর্কে কতকগুলো বিশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন। সামান্য উপকরণ দিয়ে তিনি অসামান্য যন্ত্র সৃষ্টি করেন।

লেখক এসব বর্ণনা না দিয়ে একেবারেই হার্জীয় যন্ত্র এবং জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রের কার্যকারিতার পার্থক্য বর্ণনায় বসেছেন। এই পার্থক্যগুলো হল—

১. হার্জীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ছিল কয়েক গজ আর জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র থেকে যে ঈথর-তরঙ্গ সৃষ্টি হল তার দৈর্ঘ্য হল এক ইঞ্চির দু'ভাগের এক ভাগ।

২. এই তরঙ্গকে ধরবার জন্য জগদীশ-চন্দ্র গ্রাহক যন্ত্রও সৃষ্টি করলেন এবং এই যন্ত্র নিঃসংশয়ে প্রমাণ করল যে, আলোর ধর্ম আর এই তরঙ্গের ধর্ম একই।

লেখক জগদীশচন্দ্রের গ্রাহক যন্ত্রের সামান্য বর্ণনাও দিয়েছেন। এতে 'গ্যালিনা' ব্যবহার করা হল। গ্যালিনাকে স্পর্শ করে রইল একটি সরু তার। আজকাল বেতার বা টেলিফোনে যে ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয় তাও এই গ্যালিনা থেকে প্রস্তুত।

প্রশ্ন

১ 'জগদীশচন্দ্র দুদিক থেকে হার্জের যন্ত্রের উন্নতিসাধন করলেন।' — কোন কোন দিক থেকে কি কি উন্নতি করলেন ?

২. 'তরঙ্গ ধরবার জন্য জগদীশচন্দ্র এক নতুন ধরনের উপায় অবলম্বন করলেন।' এই উপায়টি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩. 'তিনি তাঁর এই যন্ত্র দিয়ে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করলেন যে' —কি কি প্রমাণ করলেন ? এখানে তিনি বলতে কাকে বোঝান হয়েছে ?

জগদীশচন্দ্রের গ্রাহক যন্ত্র কিভাবে কাজ করত ? এই যন্ত্রে বিদ্যুৎ তরঙ্গ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হত। আর সংযুক্ত গ্যালভানোমিটারের কাঁটা নড়ে উঠত। জগদীশচন্দ্র শুধু বিদ্যুৎ তরঙ্গ ধরবার গ্রাহক যন্ত্রই তৈরি করলেন না সেইসঙ্গে এই তরঙ্গ দিয়ে অন্য কোন কাজ করান যায় কিনা তারও পরীক্ষা করলেন। ১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বহুজনের সামনে তিনি এক পরীক্ষা করে দেখালেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে একটি প্রেরক যন্ত্র থেকে তরঙ্গ প্রেরণ করা হল। মাঝের বন্ধ দরজা ভেদ করে ঐ বিদ্যুৎ তরঙ্গ পাশের ঘরে পৌঁছে একটি পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ল। বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করে এমন কাজ করান পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল। বিনা তারে সংকেত পাঠাবার এই হল সূচনা।

প্রশ্ন

১. 'বিনা তারে সংকেত পাঠাবার এই সূচনা হল।' সূচনার ঘটনাটি বর্ণনা কর।

২ '১৮৯৪ সালে নভেম্বর মাসে প্রেসি-ডেন্সি কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করলেন।' তিনি কে ? পরীক্ষাটি বর্ণনা কর।

৩. বিনা তারে সংকেত পাঠাবার যে পরীক্ষাটি জগদীশচন্দ্র করেছিলেন, তা কোথায়, কত সালে, কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয় ?

* *

এবারে লেখক তৃতীয় পর্বে এসে পৌঁছেছেন। এই পর্বের নাম বেতারের ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে মার্কনি সাহেবই বিশ্ববিখ্যাত। সাল তারিখে তাকালেই বুঝবে যে ঈথর তরঙ্গের ব্যবহারিক প্রয়োগ জগদীশচন্দ্রই প্রথম করেছিলেন। কিন্তু আইনানুগ

স্বীকৃতি পেয়েছিলেন মার্কনি। সেখানেই তাঁর জয়।

গাগলি এলম মার্কনি তাঁর গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র দিয়ে ১৮৯৮ সালে ১৮ মাইল দূরে সংকেত পাঠালেন এবং বললেন যে আটলান্টিক সমুদ্র পার করে আমেরিকাতেও এই সংকেত পাঠান যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা এ কথা মানতে চাইলেন না। অবশেষে, মার্কনি সত্যিই তা' প্রয়োগ করে প্রমাণ করলেন। এই পরীক্ষালব্ধ সত্যটিকেও সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন।

প্রশ্ন

১. কত সালে মার্কনি তাঁর যন্ত্রের পেটেন্ট নেন? তিনি কত মাইল দূরে সংকেত প্রেরণ করেছিলেন?
২. মার্কনির কোন দাবিকে বিশেষজ্ঞরা মানতে চাইলেন না? না মানবার পিছনে তাঁদের যুক্তিটা কী ছিল?
৩. মার্কনি কিভাবে আটলান্টিক পার করে তরঙ্গ সংকেত প্রেরণ করলেন? পত্রিকা সম্পাদকদের ওপর তার প্রতিক্রিয়াই বা কেমন হল?

★ ★

শেষ অনুচ্ছেদে লেখক একটি জাহাজ-ডুবি থেকে লোক উদ্ধারের কাহিনী বলেছেন। ১২৪২ জন যাত্রীর প্রাণরক্ষা সম্ভব হয়েছিল বেতারে সংকেত প্রেরণের দ্বারা। জাহাজটির নাম ছিল 'রেপব্লিক'। এটি ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। 'ফ্লোরিডা' নামে একটি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ডুবতে বসেছিল। কোনক্রমে বিপদবার্তা পাঠালেন বেতার যন্ত্র চালক। সেই সংকেত ধরতে পেরে 'বল্টিক' নামক একটি জাহাজ ছুটে এল এবং যাত্রীদের রক্ষা করল।

প্রশ্ন

১. 'বেতার কি করে মানুষের জীবন বাঁচাতে থাকল একটা ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে।'—ঘটনাটি বর্ণনা কর।
২. 'দুটি জাহাজে ধাক্কা লাগল।' জাহাজ দুটির নাম বল। কত সালে এই ঘটনাটি ঘটে? ঘটনাটির বিবরণ দাও।

প্রকাশক বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ প্রকাশের সময় বহু অংশ বর্জন করেছেন। এই প্রবন্ধের একটি চতুর্থ পর্ব ছিল। প্রাগ্রসর ও কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের জন্য নিচে আমরা তা মুদ্রিত করলাম।

প্রতিফলন-স্তর

বিশেষজ্ঞেরা যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, ইংলণ্ড থেকে যে হার্জীয় তরঙ্গ যাত্রা করল তার পক্ষে বেঁকে গিয়ে আমেরিকায় পৌঁছনো অসম্ভব, এই কথাটায় আসা যাক। 1902 সালে কেনেলি ও হেভিসাইড বললেন যে, বায়ুমণ্ডলের উপরকার স্তর একটা পরিবাহক ফলকের মত কাজ করে, সেই কারণে ঈথর-তরঙ্গ সেখানে পৌঁছে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ওই স্তর পরিবাহক হবে কেন? হেভিসাইড বললেন যে, সূর্যকিরণ পড়ায় বায়ুর অ্যাটম থেকে ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটে, স্তরটি আয়নিত হয়, তারই ফলে ওটা পরিবাহক হয়ে দাঁড়ায়। এই স্তরকে হেভিসাইড-স্তর

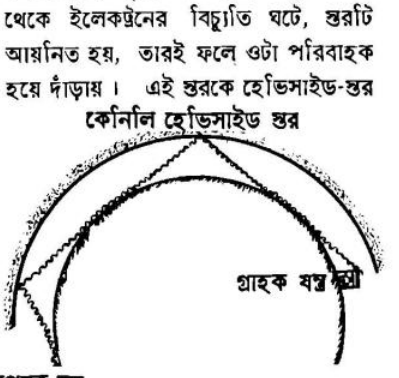

বলা হতে লাগল, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনুমানের বিষয় হয়ে রইল। 1925 সালে অ্যাপেলটন পরীক্ষায় প্রমাণ করলেন যে ওইরকম স্তর রয়েছে। অল্পক্ষণস্থায়ী একগুচ্ছ তরঙ্গ পাঠিয়ে তিনি দেখলেন যে, হেভিসাইড-স্তরে প্রতিফলিত হয়ে রশ্মিগুচ্ছ ফিরে এল। এই হেভিসাইড-স্তর কত উঁচুতে? পরীক্ষায় বেরল যে দুটো স্তর আছে, একটা প্রায় 90 কিলোমিটার, আর একটা আন্দাজ 200 কিলোমিটার উঁচুতে। ওদের E ও F স্তর বলা হল। অ্যাপেলটন সন্দেহ করলেন যে E স্তরের নিচে, মোটামুটি পৃথিবী থেকে 60 কিলোমিটার ওপরে, হয়তো আর-একটা স্তর আছে, কিন্তু এই স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ পেলেন না। 1935 সালে শিশির-কুমার মিত্র জানালেন যে, 55 কিলোমিটার উঁচুতে একটা স্তর থেকে তিনি প্রতিফলন লক্ষ্য করেছেন। অ্যাপেলটন একে D স্তর নাম দেবার প্রস্তাব করেন। এর পর শিশিরকুমার মিত্র ও তাঁর সহকর্মীরা এরও নিচে 5 থেকে 55 কিলোমিটারে অবস্থিত বিভিন্ন স্তর থেকে তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করলেন। অন্যান্য পরীক্ষাগারেও তাঁদের উক্তি সমর্থিত হল।

যা হোক, পৃথিবীর ওপর আয়নিত স্তর থাকায় এখানে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠানো সম্ভব হল, আর বিজ্ঞানী তা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সংকেত ঈথর-তরঙ্গের সাহায্যে ছুটল, আর তার বেগ হল আলোর বেগ, অর্থাৎ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

এখন বিজ্ঞানী বললেন, সংকেত নয়, একেবারে কণ্ঠস্বর শুনতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের লোককে দেখতেও হবে। তাও হল।

নির্মল লাহিড়ী

শেষ ডাইনোসর

ব্রিটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ আর. এল. ক্রুফটের মতে ডাইনোসরদের পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবার কারণ হল তাদের অন্ধত্ব। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিবর্তনের সময় সূর্য নাকি অতিরিক্ত তাপ ছড়িয়েছিল পৃথিবীতে, যার ফলে ডাইনোসরদের চোখে ছানি পড়ে। ক্রুফট একটি বই লিখেছেন 'দি লাস্ট ডাইনোসরস'। এই বইয়ে ক্রুফট আরও জানিয়েছেন, প্রায় আটশো ডাইনোসর এই পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছিল। এদের চক্ষু-গোলকের ওপরে ঘন ভ্রু গজিয়েছিল এবং দু-চোখের মাঝখানে ফুঁড়ে বেরিয়েছিল শিংয়ের মত একটা জিনিস। ক্রুফটের মতে এইসব ডাইনোসরদের এই অতিরিক্ত অঙ্গের কারণ এদের দেহে এদের সঙ্গীদের তুলনায় প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় ভাষা ঃ ইংরাজী

REVISION

TEXT

THE SELFISH GIANT

(Ref. April 1 & 16 and May 1 & 16 issues)

1. INTRODUCTION

মানুষের চরিত্রের একটি দিকের ওপর আলোকপাত করলে দেখা যায় যে সেদিকটা স্বার্থের কালিমায় লিপ্ত। একদিক থেকে দেখলে স্বার্থই মানুষের জীবনের প্রেরণা—সবই যেন 'আমার চাই'। সে স্বার্থের তাগিদে গড়ে তোলে নিজের চারপাশে এক দম্ভের দেয়াল, যাতে সেখানে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে। সেই স্বার্থের তাগিদে যা দূরে সরিয়ে রাখে তা হল ভালবাসা, যার দান আনন্দ।

স্বার্থপর দৈত্য আসলে স্বার্থপর মানুষেরই ভয়াবহ রূপ। আর, তার স্বার্থের বলি হল নিরীহ, নিষ্পাপ শিশু, যে ঈশ্বরের রূপ। সৃষ্টির সৌন্দর্যের প্রতীক এই শিশু। তাই শিশুকে ঘিরে স্বার্থের খেলা জীবনের নিষ্ঠুরতম কাজ, চরমতম পাপ। এই পাপে পাপী হল স্বার্থপর দৈত্য। নিজের বাগানে ক্রীড়ারত শিশুর দল দেখে তার মনে হিংসার উদ্রেক হল। 'শোন, বাগানটা আমার, কেবল আমারই'—এই কথাগুলো বলে শিশুদের তার বাগান থেকে সে তাড়িয়ে দিল, আর বাগানের চারপাশে তুলে দিল এক উঁচু দেয়াল। শিশুগুলোর সুখের দিন হারিয়ে গেল।

প্রকৃতি এই অন্যায়, এই স্বার্থপরতা সহ্য করল না। শিশুদের সঙ্গে বসন্ত বিদায় নিল ঐ বাগান থেকে। এল হাড়কাঁপানো শীত, সঙ্গে এল কুয়াশা, ঝোড়া হাওয়া আর শিলাবৃষ্টি। তারা একযোগে স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে ধ্বংস-লীলা শুরু করল। শীতের যন্ত্রণায় দৈত্য ভুগতে লাগল আর ভাবতে লাগল, 'বসন্ত কেন আসছে না?' এ যে তার পাপেরই ফল তা সে বুঝতে পারল না।

তারপর হঠাৎ একদিন ভোরে এক শ্যামা পাখির গান শুনে অবাক হয়ে বাইরে তাকিয়ে দৈত্য দেখল যে শিশুর দল আবার তার বাগানে ফিরে এসেছে আর, তাদের সঙ্গে ফিরে এসেছে বসন্ত। প্রতি গাছ ফুলে ভরে গেছে, আর সব গাছে একটি করে শিশু। শুধু বাগানের একটি কোণে এখনও শীত। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এক শিশু কাঁদছে, কারণ সে গাছে উঠতে পারছে না।

সমস্ত দৃশ্যটা দেখে দৈত্যের মনে এক অদ্ভুত ভাব নেমে এল। সে বুঝতে পারল যে কি স্বার্থপর কাজই না সে করেছিল। সে বুঝল বসন্ত কেন তার বাগানে এতদিন আসেনি। এবার তার মন শিশুদের প্রতি ভালবাসায় ভরে গেল। ছুটে গিয়ে সে ক্রন্দনরত শিশুটিকে তুলে গাছে বসিয়ে দিল—শিশুটি তার গলা জড়িয়ে তাকে চুমো খেল। দৈত্য তখন এক কুঠার নিয়ে বাগানের চারপাশে তারই তৈরি দেয়ালটা নিজের হাতে ভেঙে দিল। শিশুদের সে বলল, 'আজ থেকে এই বাগান তোমাদের, তোমরা খেল।' শিশুরা মহাখুশী—তারা খেলতে লাগল আর তাদের সঙ্গে যোগ দিল সেই দৈত্য। স্বার্থপরতার দুঃখ যন্ত্রণা পার হয়ে আজ তার মন নিঃস্বার্থ ভালবাসার

শুভ্র আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আজ দৈত্য আনন্দিত। রোজই সে শিশুদের সঙ্গে খেলে, আর প্রায়ই ঐ শিশুটিকে খোঁজে যে তাকে গলা জড়িয়ে চুমো খেয়েছিল—'কোথায় সে? সে আসে না কেন অন্য শিশুরা তার কোন খবর রাখে না।

কত বছর এভাবে পেরিয়ে গেল। দৈত্য এখন বৃদ্ধ—সে বসে বসে শিশুদের খেলা দেখে। হঠাৎ একদিন এক দৃশ্য দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যে শিশুটিকে সে রোজই খুঁজত সে এসেছে। ছুটে তার কাছে গিয়ে দেখল তার হাতে ও পায়ে পেরেকের দাগ। দৈত্য রেগে আগুন—'কে তোমাকে এই আঘাত দিয়েছে? আমাকে তার নাম বল, আমি তাকে হত্যা করব।' শিশুটি বলল, 'না, না—এতো ভালবাসার আঘাত!'

এই কথায় দৈত্যের মন এক অদ্ভুত ভাবে ভরে গেল—মনটা আচ্ছন্ন হল ভালবাসায়, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে। সে বুঝতে পারল, এই শিশু ছদ্মবেশী যীশু। হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে পড়ে দৈত্য বলল, 'কে তুমি?'

শিশুরূপী যীশু উত্তর দিলেন, 'তুমি একদিন তোমার বাগানে আমাকে খেলতে দিয়েছিলে। আজ আমার বাগানে, স্বর্গে, তোমাকে নিতে এসেছি।'

সেদিন শিশুর দল বাগানে এসে দেখল একটি গাছের নিচে শুয়ে আছে দৈত্যর প্রাণহীন দেহ। সে দেহের অধিকারী যে ছিল সে নিঃস্বার্থভাবে একদিন শিশুদের ভালবাসতে পেরেছিল। তাই তার মরদেহ আচ্ছন্ন হল ফুলে ফুলে।

2. *THE OUTLINE OF THE STORY*

A Note : গল্পটি সহজ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলো দেখিয়ে তার ভিত্তিতে outline তৈরি করাই সঙ্গত। ভাগগুলো হল এই :

i. স্বার্থপর দৈত্য যে স্বার্থপর কাজ করল।
ii স্বার্থপরতার শাস্তি যা হল।
iii. স্বার্থপর দৈত্যের বাগানে বসন্তের পুনরাগমন ঘটল এবং দৈত্য কি দৃশ্য দেখল।
iv. দৈত্যের অন্তরের পরিবর্তন হল এবং সে কি করল।
v. দৈত্যের মৃত্যু।

The selfish giant had a beautiful garden where children used to play and feel happy : they did so during the giant's absence from his castle—when the giant returned he was very angry to see the children using his garden as their playground—he drove the children away from his garden and built a high wall around it—the children had nowhere to play execpt on the road and they felt very unhappy there. *[* **Paras 1—7** *]*

ii. For this selfish act, the giant received his punishment from Nature—spring left the giant's garden alongwith the children and winter with Frost, Hail and North Wind reigned there—the giant suffered and wondered why spring was 'so late in coming'.

[**Paras 8—10** *]*

iii. One day hearing a finnet's song, the giant looked out—he saw that through a hole in the wall the children had returned to the garden and the spring had returned with them the trees were in blossom again and the birds flew about singing on each tree sat a boy happily and the tree happily waved its branches over the child's head : only one little boy stood under a

tree, crying. for he was too tiny to climb the tree. *[Paras 11 – 13]*

iv. As the giant kept looking on, his heart melted : he now knew how selfish he had been—he walked into the garden, took up the little boy in his arms and put him on the tree the boy kissed him—the giant broke down the wall around his garden and told the children to play there, for it was now their playground the children came to the garden every day and the giant played with them only the little boy who had kissed him never came again and the giant was very eager to see him.

[Paras 14 – 21]

v. Then one day that little boy came : overwhelmed with joy to see him, the giant ran down to him – seeing marks of nail on the boy's palms and feet the giant asked him angrily who had wounded him : the boy said that the wounds were the wounds of love – in great reverence the giant knelt down before him for he could now know that he was Jesus Christ in disguise – the boy said he had come to take the giant to his garden : the giant died and went to Paradise, the garden of Jesus Christ. *[Paras 22 – 29]*

3. *QUESTIONS & ANSWERS*

A Note : গল্পটির outline দেওয়া হল—এবার গল্পটির ঘটনাগুলো সম্পর্কে তোমাদের comprehension বা উপলব্ধি সুদৃঢ় করার জন্য প্রশ্নোত্তর তৈরি করা প্রয়োজন।

গল্পটি পাঁচ ভাগে ভাগ করে outline তৈরি করা হয়েছে। যে প্রশ্নই করা হক না কেন তার উত্তর একটি ভাগে বা কখনও কখনও একটির বেশি ভাগে পাওয়া যাবে। সুতরাং তোমরা এই পাঁচটি ভাগের বিষয়বস্তু ভাল করে শিখে নিও।

প্রত্যেকটি ভাগ থেকে একটি উদ্ধৃতি বেছে নিয়ে নিচে পাঁচটি model প্রশ্নোত্তর এবং পরে task দেওয়া হল। কোনও কোনও উদ্ধৃতি ভিত্তি করে তিনটের বেশি প্রশ্ন করা সম্ভব, তাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনটের বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তার উত্তরও দেওয়া হয়েছে।

একেকটি ভাগ থেকে একটি উদ্ধৃতি বেছে নিয়ে model প্রশ্নোত্তর করা হয়েছে, কিন্তু সেই ভাগ থেকেই অন্য উদ্ধৃতি ভিত্তি করে একই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে। তাই প্রত্যেকটি model প্রশ্নোত্তরের নিচে ছোট type-এ আরও সম্ভাব্য উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হল।

4. *Five Model Questions with their answers.*

Q. 1. 'How happy we were there !' they said to each other.

i. **Who were 'they' ?**

ii. **Where and why did they feel happy ?**

iii. **What happened to them ?**

iv. **When and how did 'they' return 'there' again ?**

Ans. : i. 'They' were the little children who, while returning from school, used to go to a garden and play there. The garden belonged to a Giant.

ii The children felt happy, playing in that garden. The garden was a very lovely one with soft green grass. Flowers peeped out of the grass like stars and there were twelve peach trees there which broke into beautiful flowers in spring and bore rich fruit in autumn. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children often stopped playing to

listen to their songs. The children therefore felt very happy in the Giant's garden.

iii. Their happiness ended when the owner of the garden, the Giant, returned after a long absence. When he saw the children playing in his garden, he grew very angry and told them that the garden was his and his alone. Then he drove the children away from his garden into the road and built a high wall around it.

iv. After they were driven away by the Giant from his garden, Nature punished him for his selfishness. Spring left his garden and winter with Frost, Hail and North Wind reigned there and the Giant wondered why the spring was so late in coming. Then one day the children crept into the garden through a hole in the wall and found themselves there again.

Some more Quotations : 1. 'How happy we are here' they cried to each other. 2. 'What are you doing here ?' he cried in a very gruff voice, and the children ran away. 3. 'My own garden is my own garden.'

Q. 2. Only in the garden of the Selfish Giant, it was still winter.

i. **Why is the Giant called 'selfish ?'**

ii. **Describe the condition of the Giant's garden.**

iii. **Why was it 'still winter' in the garden ?**

Did spring return to the Giant's garden again ? When did it return ?

Ans. : i. The Giant is called selfish because he did a very selfish thing. When he saw little children playing in his garden he drove them away from the garden and built a high wall around it.

ii. Spring came in its time all over the country, but in the garden of the Selfish Giant winter reigned on. The frost came and painted the trees silver. The North Wind came and blew the chimney-pots down and then the Hail came and rattled on the roof of the Giant's castle and broke most of the slates. Such was the condition of the Giant's garden.

iii. When it was time for spring, it came all over the country but in the selfish Giant's garden it was still winter. Winter reigned on there because the Giant had committed on act of selfishness. He had driven the children away from his garden and so Nature punished him for his selfish act.

iv. Spring returned to the Giant's garden again. Spring had left the garden with the children. When after a spell of winter, the children crept into the garden again through a hole in the wall, spring returned to the garden.

Some more Questions : 1. 'I cannot understand why the spring is so late in coming', said the selfish Giant. 2. 'I hope there will be a change in the weather.'

Q. 3. He saw a most wonderful sight.

i. **Who was 'he' ?**

ii. **What sight did he see ?**

iii. **What brought about the 'wonderful sight ?'**

Ans. : i. The word 'he' refers to the Giant in Oscar Wilde's story. 'The Selfish Giant.'

ii. The Giant saw that the little children, whom he had once driven away, had crept in through a hole

in the wall around his garden. They were sitting upon the trees and the trees, happy at their return, broke into blossom and gently waved their branches over their heads. The birds flew about, twittering happily. Flowers peeped out of the grass and laughed. The sight was indeed a wonderful one.

iii. Nature was happy at the return of the children to the selfish Giant's garden. Spring had left the garden with the children and now when the children returned, spring too returned with them. The sight therefore became a wonderful one.

Q. 4. 'How selfish I have been !' he said,

i. Whom does 'he' refer to here ? ii. What selfish act had 'he' committed ? What was it result ? iii. What made the speaker realize that he had been selfish ? iv. What did the Giant do after realizing his selfishness.

Ans : i. 'He' refers to the Giant in Oscar Wilde's story, 'The Selfish Giant'.

ii. The Giant drove away from his garden little children playing in it, saying that his garden was his and his alone. Then he built a high wall around his garden and put up a notice-board threatening trespassers with prosecution. This was the selfish act he had committed.

The result of his selfishness was that Nature punished him Spring left his garden with the children and winter came with Frost, North Wind and Hail and reigned on in the garden and carried on its ravages (ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে গেল)।

iii. One morning, looking out of his window, the Giant found that the children whom he had driven away from his garden had returned through a hole in the wall, and with them had come spring.

The boys were sitting upon the trees which, happy at their return, burst forth into blossom and flowers peeped out of the grass and the birds flew about singing merrily only in one corner a little boy stood under a tree crying for he was too tiny to climb it.

The Giant's heart melted at this sight and he could realize how selfish he had been.

iv. Realizing that he had been very selfish, the Giant ran downstairs, stole up behind the little boy who stood crying under a tree, put him on the tree and the boy kissed him. The Giant then broke down the wall around his garden with an axe and told the children to play in the garden, for the garden was now their playground. The children who were no longer afraid of the Giant played and the Giant played with them.

Some more Quotations : 1. '...now I know why the spring would not come here.' 2. '...my playground shall be the children's playground for ever and ever' 3. 'It is your garden now, little children', said the Giant.

Q. 5. 'Who hath dared to wound thee' ? Cried the Giant. i. To whom did the Giant say this ? ii. State the context of the words. What reply did the Giant receive ? iii. What effect did the reply have on the Giant ? What did the 'little

boy' tell the Giant then ?

Ans : i. The Giant said this to the little boy who had once kissed the Giant for having put him on a tree.

ii. The Giant had waited for the little boy for many years and now when he saw the boy he ran downstairs in great joy to meet him. But when the Giant came near the boy he saw that he had marks of nail on his two plams and his two feet. This enraged the Giant and he asked the boy to tell him the name of the person who had wounded him so that he could kill him with his sword.

The little boy told him not to worry about the wounds on his palms and feet, for those were the wounds of love.

iii The words of the little boy cast on awe on the Giant. Realizing that the little boy was none other than Jesus Christ in disguise, he knelt down before him in great reverence.

The boy then told the Giant that one day he had allowed the boy to play in his garden and so he had come to take the Giant to his garden, Paradise.

Some more Quotations : 1. Suddenly he rubbed his eyes and looked and looked. 2. 'Nay I' answered the child ; 'but these are the wounds of love.' 3. ...'a strange awe fell upon him, and he knelt before the little child.'

4. *Some Important Word-Notes & Lexical Test.*

April 1 থেকে May 16 পর্যন্ত চারটি সংখ্যায় 'The Selfish Giant'-এর Word-Notes এবং Lexical Test মোটামুটি বিস্তারিতভাবেই দেওয়া হয়েছে—তবু নিচে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি Word-Notes এবং Lexical Test দেওয়া হল।

Word-Notes : Cornish ogre : an ogre living in Cornwall (an 'ogre' is a man-eating giant) ; কর্ণওয়ালনিবাসী মানুষখেকো দৈত্য। **Trespasser :** one who enters privately owned land without right or permission ; বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তির অধিকৃত জায়গায় প্রবেশ যে করে ; অনধিকার প্রবেশকারী। * 'Trespass' শব্দটির বানান লক্ষ্য কর—প্রথমে একটি 's' পরে দুটি 'ss'।

My own garden is my own garden (para 5) : আমার বাগান আমারই বাগান। **N. B.** স্বার্থপর ব্যক্তি 'আমার', 'আমার' এই কথাই বেশি বলে। * এই সঙ্গে para 15-য়ে দৈত্যের কথাগুলো দেখ। সে তখন শিশুদের বলছে, 'It is your garden now, little children.' তখন দৈত্যটি আর স্বার্থপর নয়, তাই তার চিন্তা ও ভাষা বদলে গেছে। **Wander :** go about aimlessly ; উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাফেরা করা। * 'Wander' শব্দটির প্রায় একই ধ্বনি বিশিষ্ট শব্দ হল 'Wonder'—কিন্তু দুটির অর্থ ভিন্ন। Verb হিসাবে 'Wonder' শব্দটির অর্থ হল বিস্মিত হওয়া। দুটি শব্দেরই বানান লক্ষ্য কর।

Wounds of love : wounds received for loving man ; মানুষকে ভালবাসার জন্য যে আঘাত এসেছিল। **N. B.** The child (that is, Jesus Christ in disguise) told the Giant that he had loved man and so he was crucified. The marks of nail on his palms and his feet only spoke of

his love for man. So they were the 'wounds of love'.

Lexical Test 'নবম দশম'-এর May 16 সংখ্যা দেখ। এখানে আরও কয়েকটি synonym (a word of similar meaning) ও antonym (a word of opposite meaning) দেওয়া হল।

Synonyms	Antonyms
blossom—bloom	lovely—ugly
fast (adv.)—quickly	nowhere—everywhere
delicious—sweet	awake—asleep
farthest—remotest	bent—raised
long (v.)—yearn	goodbye—welcome
fling—throw, cast	anyone—no one
merely—only	arrived—departed
hasten—hurry (v.)	covered—bared

TASK

নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হল। কয়েকটি প্রশ্নে তিনটের বেশি অংশ আছে। (iv) নং বা (v) নং অংশের উত্তর প্রয়োজনানুসারে ৩টা থেকে ৫টা বাক্যে লেখ। কয়েকটি প্রশ্নের নিচে বাঙলায় **Hints** দেওয়া হল। এই **Hints** অনুসরণ করে ইংরেজীতে উত্তর লেখার অভ্যাস কর —পরে নিজেই চিন্তা করে লিখতে পারবে।

Q, 1. 'My own garden is my own garden.'
Who said this ? To whom did he say this ?
ii. Why did he say this ?
iii. What did he do then ?

[**Hints :** এই প্রশ্নগুলোর উত্তর outline-এর প্রথম ভাগ **(Paras 1—7)** থেকে হবে।]

Q. 2. 'I hope there will be a change in the weather.'
Who said this ?
What 'weather' was the speaker facing then and why ?
iii. When was his 'hope' fulfilled ?
(Or, When did a change in the weather take place ?)
iv. What secne did the speaker see in the garden when the weather changed ?

[**Hints :** এখানে (ii) নং প্রশ্নে কেন বক্তাকে ঐ ধরনের আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছিল বলতে গিয়ে কি স্বার্থপর কাজ বক্তা করেছিল তা তোমাকে এক লাইনে বলতে হবে। (iii) নং প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে বলতে হবে যে শিশুরা যখন বাগানে ফিরে এল, তখন বসন্ত এল। (iv) নং প্রশ্নের উত্তরে শিশুরা বাগানে ফিরে আসার পর বাগানে যে আনন্দের দৃশ্য হল তা তোমাকে সংক্ষেপে বলতে হবে।]

Q. 3. It was a lovely scene : only in one corner it was still winter.
i. Who saw the 'scene ? Where did he see it ?
ii. What was the 'lovely scene' ?
iii. Where was it still winter and why ?
What change did the scene bring about in the mind of the Selfish Giant ?
v. What did the Giant do then ?

Q. 4. 'It is your garden now, little children.'
Who said this ? To whom did

he say this ?

ii. Fully state the context of these words.

iii. What did the speaker do after saying this ?

[**Hints :** (ii) নং প্রশ্নের উত্তরে 1টি বাক্যে বলবে যে দৈত্য ঐ শিশুদের তার বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তার ফলে শীতের রাজত্ব হয়েছিল ; 1টি বাক্যে বলবে যে শিশুরা আবার বাগানে ফিরে এল এবং তাদের সঙ্গে বসন্ত এল 1টি বাক্যে বলবে যে শিশুরা গাছে গাছে বসেছিল, পাখিরা গান গাইছিল ইত্যাদি কিন্তু একটি গাছের নিচে একটি শিশু কাঁদছিল ইত্যাদি। 1টি বাক্যে বলবে যে এই দৃশ্য দেখে দৈত্যের মন গলে গেল এবং সে বুঝল যে খুব স্বার্থপরের কাজ করেছিল শেষ বাক্যে বলবে যে তখন দৈত্য বাগানে এসে শিশুদের এই কথাগুলো বলেছিল। (iii) নং প্রশ্নের উত্তরে বলবে যে সে বাগানের চারপাশের দেয়ালটা ভেঙ্গে দিল। তারপর বলবে সে শিশুদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিল ইত্যাদি।]

Q. 5. 'Nay !' answered the child, 'but these are the wounds of love.'

i. Who was the 'child' ? To whom did he say these words ? State the context of these words. What did the child mean by the expression 'wounds of love' ?

iv. What effect did the child's words have on the Giant's mind ? What did the Giant do then ?

[**Hints :** (iv) নং প্রশ্নের উত্তরে লিখবে যে শিশুটির কথাগুলো শুনে দৈত্যের মনে কি অদ্ভুত সমীহার ভাব এল ইত্যাদি। তারপর বলবে সে শিশুটির পায়ের কাছে বসে পড়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি কে ?']

GRAMMAR

PREPOSITIONS

Preposition নিয়ে 'নবম দশম'-এর March 1 সংখ্যায় মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। তবে যেহেতু ইংরাজী ভাষায় Preposition-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই এই সংখ্যায় আবার খানিকটা আলোচনা করা যাক।

Preposition কাকে বলে ? প্রকৃতপক্ষে Preposition হল এমন একটি শব্দ যা বাক্যে Noun বা Pronoun[বা verb-এর সঙ্গে -ing যুক্ত করে গঠিত হয় যে Noun-ধর্মী শব্দ যেমন, swimming] তার পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যস্থ অন্য কোন শব্দের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দেয়। উদাহরণ দেখ :

1. These are the *works* **of** *Kalidasa* 2. Arun *goes* **to** *office.*

[বাক্যে যেটা Preposition তা মোটা অক্ষরে এবং যে দুটি শব্দকে prepositionটি যুক্ত করে দিচ্ছে সে দুটি বাঁকা অক্ষরে দেওয়া হল।]

1 নং বাক্যে 'Kalidasa'-এই Noun-এর পূর্বে of ব্যবহৃত হয়ে বাক্যস্থ আর একটি শব্দ 'works'-এর সঙ্গে 'Kalidasa'-কে যুক্ত করে দিচ্ছে। আবার, 2 নং বাক্যে 'office' নামক Noun-এর আগে 'to' বসে বাক্যস্থ আরেকটিশব্দ goes-এর সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছে। ফলে 'of' এবং 'to' দুই-ই

Preposition.

* বাংলায় আমরা 'of Kalidasa' বোঝাতে 'কালিদাসের' বলি এবং 'to office' বোঝাতে 'অফিসে' বলি। অর্থাৎ 'শব্দটির' আকারেই পরিবর্তন সাধন করি (কালিদাস+এর এবং অফিস+এ)। ইংরাজীতে আমরা শব্দের আকারে পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরাসরি অন্য শব্দ ব্যবহার করি। সেই শব্দই হল **Preposition.**

I. কতকগুলো Preposition-এর ব্যবহারে তোমাদের প্রায়ই ভুল হয়। Preposionগুলো হল, **in, on, at, along, to** ইত্যাদি। সেগুলোর শুদ্ধ ব্যবহার নিচে দেখান হল।

1. **in, on, at (Place) :** i. Arun lives **on** Jawaharlal Nehru **Road**. ii. Shyamal lives **in** Sukea **Street**. iii. Does he live **in** Brindaban Mullick **Lane ?** iv. I live **at** 55 Lake **Place**

* Road-এর সঙ্গে **on**, street বা Lane-এর সঙ্গে **in** এবং বাড়ি ইত্যাদির ঠিকানার (**55 Lake Place**) সঙ্গে **at** ব্যবহার হয়।

2. i. Mr. Sen is now **in** Europe. ii. Mr. Roy lives **in** India. iii. I live **in** Calcutta. iv. You live **at** Ballygunje.

* মহাদেশ, দেশ, শহর ইত্যাদির সঙ্গে **in** ব্যবহার হয়, আর কোন শহরের এক এলাকা বা গ্রাম বা ছোট জায়গার সঙ্গে সাধারণত **at** ব্যবহৃত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ছোট জায়গার নামের সঙ্গেও আজকাল **in** ব্যবহার করা চলে।

3. **in, on, at (Time)** i. Mr. Sen left for England **in** 1980 **[Year]** ii. He will return **in** Octobor, this year **[Month]** iii. Will you see me **on** Monday ? **[Day]** iv. I shall see you on Monday **at** 3 P m **[Hour]**

লক্ষ্য কর year (বৎসর), month (মাস), day (দিন)-এর সঙ্গে **in** ব্যবহার হয়। কিন্তু hour (ঘণ্টা) বোঝাতে **at** ব্যবহার হয়।

নিচের ব্যবহারগুলোও লক্ষ্য কর :

i. I shall see you **in a moment**. ii. You should come to me **in the morning (or in the evening**, at 10 O'clock **in the night** etc.)

4. **on, along**: i. The boy is standing **on** the road. ii. Now he is walking **along** the road.

5. **to→at/in, on** :i. The boy is walking **to** the door.→Now, he is **at** the door. ii Mr.Das is going **to** London.→He will be **in** London tomorrow iii. The cup is falling **to** the floor.→Now, it is lying **on** the floor.

* i. গতি বা চলন বোঝালে **to** ব্যবহার হবে, আর স্থিতিশীল অবস্থা বোঝাতে প্রয়োজন অনুসারে **at, in, on** ইত্যাদি ব্যবহার হবে।

ii একই Preposition বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে কয়েকটি Preposition-এর বিভিন্ন ব্যবহার দেখাব।

1. BY

i. She sat **by** her child. **[at the side of ; পাশে]**

ii. I passed **by** your office today. **[i.e. went past]**

iii. I shall complete this work **by** tomorrow. **[not later than tomorrow ;** আগামী কালের মধ্যেই **]**

iv. I shall go to Santiniketan **by** bus and not **by** train. **[expressing manner or method ;** (এখানে) ভ্রমণের পদ্ধতি বোঝান হয়েছে **]**

2. *FOR*

i. I walked **for** an hour. **[to indicate extent in time ;** কালের বিস্তৃতি বোঝাতে **]**

ii. Mr. Sen set out **for** the Himalayas. **[to indicate destination ;** গন্তব্যস্থল বোঝাতে**]**

iii. I shall now go **for** my meal **[to indicate purpose ;** উদ্দেশ্য বোঝাতে **]**

iv. The boys won the game and **shouted for** joy. **[to indicats the reason ;** [কারণ বোঝাতে **]**

3. *FROM*

i. The cup fell **from** the table.

ii. This line has been taken **from** Wordsworth's poem 'We are seven.' **[to indicate source ;** উৎস বোঝাতে **]**

iii. The man died **from** a wound he received a year ago. **[to indicate cause ;** কারণ বোঝাতে **]**

iv I worked **from** 8 to 11 in the morning. **Or** I shall start working **from** the first day of the month. **[to indicate the starting point of a period of time ;** কোন কাজ যে সময় থেকে শুরু তা উল্লেখ করতে **]**

4. *SINCE :*

i. The man has been in this house **since** 1980. **or** He has been living in this house **since** 1980. **[to indicate a point of time in the past when some action began ;** অতীতে যে সময় থেকে কোন কাজ আরম্ভ হয়েছে তা বোঝাতে। *লক্ষ্য কর যে verbটি **Perfect Tense**য়ে ব্যবহার হয়েছে **]**

এবার এই প্রসঙ্গে **For**-এর ব্যবহার লক্ষ্য কর :

The man has been living in this house **for** the last two years. **[to indicate the period of time of an action ;** কোন কাজের ব্যাপ্তিকাল বোঝাতে **]**

TASK

Fill up the blanks with suitable prepositions:

1. I live — Kanpur. 2. This boy lives — a house — Mahatma Gandhi Road. 3. He was walking — the street aimlessly. 4. The doctor sat — the patient. 5. This girl has been reading—10 a. m 6. Do you live — this address ? 7. The man passed — the Post Office. 8. He passed his examination — January. 9. Would you please see me—4 p.m. —Monday ? 10. — when has he been waiting — me ?

HOME THEY BROUGHT HER WARRIOR DEAD

[Ref. March 1 & March 16 issues]

1 INTRODUCTION

নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ হল তাঁর মাতৃরূপ। এই চিন্তা বহু দেশেই বহুকাল ধরে মানুষের মন অধিকার করে আছে। নারীর মাতৃ-অনুভূতি যে তার শ্রেষ্ঠ, মহত্তম অনুভূতি সে বিষয়ে দ্বিমত আছে বলে জানা নেই নিজেকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মায়ের সন্তানকে ভালবাসা বা আত্মত্যাগের কাহিনী ছড়িয়ে আছে সব দেশেরই সাহিত্যে এবং বাস্তব জীবনে। সত্যই মাতৃ-হৃদয় এক আশ্চর্য শক্তির অধিকারী।

কবি টেনিসন বিশ্বাস করতেন যে এই জীবনে নারীর স্থান হল গৃহ, যে গৃহ তাঁর কল্যাণহাতের স্পর্শে সুন্দর হয়ে উঠবে। টেনিসনের ধারণা অনুসারে প্রকৃতি এই বিধানই দিয়েছেন যে নারী স্ত্রী হিসাবে এবং তারপর জননী হিসাবে তার জীবনের চরম সফলতা লাভ করবে এবং তার হাতে সমর্পিত, প্রকৃতিদত্ত মহান দায়িত্ব পালন করবে।

তাই ত যখন মৃত যোদ্ধার দেহ তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হল, তখন তাঁর স্ত্রী এমন আঘাতই পেলেন যে তিনি একেবারে স্তব্ধ, অনড় হয়ে গেলেন। যে স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, তাঁর মৃত্যু তাঁর মধ্যে সবকিছু যেন ওলোটপালোট করে দিল—তাঁর দেহে, মনে জীবনীশক্তির যে স্বাভাবিক খেলা তা আকস্মিকভাবে যেন থেমে গেল। এই থেমে যাওয়া, জীবনীশক্তির এই আকস্মিক অনড়তা ভয়াবহ, কারণ এ অনড় অবস্থা বেশিক্ষণ চলতে থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত। মহত্তর বা শ্রেষ্ঠতর কোন আবেগের আঘাত ভিন্ন এ অনড়তা কাটবে না। তাই তাঁর পরিচারিকারা চেষ্টা করল তাঁর মনে একটা আবেগের সঞ্চার করে চোখের জলে তাঁর জীবনীশক্তিকে আবার জাগিয়ে তুলতে! তাই তারা তাঁর মৃত স্বামীর কত প্রশংসা করল, এমন কি স্বামীর মৃত মুখখানাও তাঁকে দেখাল -কিন্তু এতে কোন লাভ হল না। এসব তাঁর মনে নূতনভাবে কোন আবেগের সঞ্চার করতে পারল না। তারা ত বয়সে তরুণ, তারা ত জানে না যে, যে বিশেষ আবেগ সঞ্চার করে তাঁকে এই বিমূঢ় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা যায়, তা হল তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের আবেগ।

নারী-হৃদয়ের এই গূঢ় সত্যের কথা জানতেন এক বৃদ্ধা নার্স—জীবন সম্পর্কে, নারী-হৃদয় সম্পর্কে যাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতা। তিনি মৃত যোদ্ধার স্ত্রীর কোলে তাঁর সন্তানকে বসিয়ে দিতেই যেন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হল। সন্তানের মুখখানি এক পলকে দেখেই মাতৃচেতনা তাঁর হৃদয়ে উদ্বেল হয়ে উঠে মুক্তি পেল অঝোরে ঝরে-পড়া চোখের জলে। তিনি আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বাছা! তোর জন্যই ত আমায় বাঁচতে হবে।'

ঠিক এই কথাগুলো ত আমরা আজও শুনতে পাই। মুমূর্ষু মাতা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে বলছেন আমি গেলে তোকে দেখবে কে?' অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর একাকিনী, অসহায়া স্ত্রী ভেঙ্গে পড়ে আবার উঠে বসেন, যখন তাঁর চোখের সামনে দেখেন তাঁর সন্তানের মলিন মুখ। উঠে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে যে কথাগুলো বলেন তা হল, 'বাছারে! তোর জন্যই ত আমায় বাঁচতে হবে।' টেনিসনের যুগ পেরিয়ে আজ বিংশ শতাব্দীতে আমার দেশের কবির মুখে শুনি—সন্তান অসুস্থ হয়ে শয্যায় শায়িত, কাছে কে আছে? '...করুণা ছলছল শিয়রে জাগে কার আঁখিরে সে 'আঁখি' বাঙলার মা'র, সে 'আঁখি' সর্ব দেশের মা'র।

2. I. ANALYSIS

a. The dead body of a warrior was brought home. His wife was stunned with grief (শোকে স্তব্ধ, হতবুদ্ধি হয়ে গেল) and lost her power to speak, or to weep. **[Stanza 1]**

b. Her maids tried to make her weep. So they praised her husband and then showed his face to her. But nothing availed. (কোন কিছুরই ফল হল না) **[Stanza 2 & 3]**

c. Finally, an old nurse set her child upon her knee. Now the lady burst into tears and spoke. **[Stanza 4]**

II. SUBSTANCE

When the dead body of a warrior was brought home, his wife received a shock that stunned her and robbed her of her power to weep or to speak. Fof fear that she would die, her maids tried to make her weep. They praised her husband as a man of very noble qualities and then one of them removed his face-cloth showing his face to her—but nothing had an effect on her. Finally an old, experienced nurse set her child upon her knee. Now she burst into tears and said

that she would live for the sake of the child.

The maternal instinct of a woman is her most powerful instinct and can revive in her the interest in life which she may have lost altogether. (তাঁর মধ্যে জীবনের প্রতি অনুরাগ পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, যে অনুরাগ হয়ত তিনি সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেছেন।)

III THE CORE

Same as Paragraph 2 in SUBSTANCE

3. MODEL QUESTIONS & ANSWERS

A Note : কবিতাটিতে যে ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে তার ধাপ চারটি : ১. একজন যোদ্ধার মৃতদেহ তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হল। ২. স্বামীর মৃতদেহ দেখে তাঁর স্ত্রী আঘাতে স্তব্ধ, হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। ৩. তাঁর পরিচারিকারা এই অবস্থা থেকে তিনি যাতে বেরিয়ে আসতে পারেন সেজন্য তাঁকে কাঁদাতে চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হল ৪. একজন বৃদ্ধা, অভিজ্ঞা নার্স তখন যোদ্ধার স্ত্রীর কোলে তাঁর সন্তানকে বসিয়ে দিলেন--এবার তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, সন্তানের জন্যই তাঁর বাঁচতে হবে।

এই চারটি ধাপ একত্র করে যে ঘটনা আমরা পেলাম, তাতে যে শিক্ষা লাভ করলাম তা হল এই : নারীর শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবৃত্তি হল মাতৃত্বের অনুভূতি যা তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

* এই সঙ্গে আরেকটি শিক্ষা আমরা লাভ করলাম। তা হল এই, নারীর শ্রেষ্ঠ সহজাত বৃত্তি যে মাতৃত্ববোধ তা বুঝতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, যা বয়সের সঙ্গে অর্জন করা যায়। ফলে দেখলাম, যিনি যোদ্ধার স্ত্রীর মনে মাতৃচেতনা পুনরুজ্জীবিত করে তাঁকে বাঁচালেন তিনি হলেন এক নব্বই বছরের বৃদ্ধা নার্স।

এবার বোধকরি কবিতাটির ঘটনা এবং শিক্ষা তোমরা ভাল করেই উপলব্ধি করতে পারলে। তোমাদের এই উপলব্ধি পাকা করে নেওয়ার জন্য প্রশ্নোত্তর করা যাক। একটা কথা নিশ্চয়ই নিজেরা বুঝতে পারছ যে এই কবিতা থেকে যে প্রশ্নই করা যাক না কেন তা ঘটনাটির পূর্বোক্ত চারটি ধাপ ঘটনাটির শিক্ষা ইত্যাদি কেন্দ্র করেই হবে। প্রশ্নোত্তর মোটামুটিভাবে বোর্ডের নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী করা হল।

Q. 1. 'She must weep or she will die.'

i. Who said this ? About whom was it said ? ii. Why did the speakers think that 'she' must weep ? What did they do to make her weep ? iii. Did they succeed ? Who finally succeeded in making her weep ?

Ans : i. The maids of the dead warrior's wife said this. They said this about their mistress, the dead warrior's wife.

ii. The warrior's widow was so shocked to see her husband's dead body that she lost her power to speak or to weep. Watching her, her maids realized that if she continued in that state for long, she would die. Realizing this, they felt that she must weep and so they tried their best to make her weep. They first praised her dead husband as a man of very noble qualities and when that failed, one of them stepped up to the dead body and removed his face-cloth showing his face to her.

iii. The efforts made by the lady's maids to make her weep failed for she remained unmoved.

Finally a ninety year-old nurse succeeded in making her weep. She set the lady's child on her knee and at once the lady burst into tears and said that she must live for the sake of the child.

Q. 2. Rose a nurse of ninety years
Set his child upon her knee

i. In which poem do these two lines occur ? ii. What had happened to 'her' ? When did the nurse set 'his child' upon her knee ? iii. Why did she do so and with what result ?

Ans : i. These two lines occur in the poem, 'Home they brought her

warrior dead. The name of the poet is Lord Tennyson.

ii. The person referred to as 'her' was the window of a dead warrior. The sight of her husband's dead body so shocked her that she lost power to speak or to weep and it became clear to all present that if she continued in that state, she would die. So her maids tried their best to make her weep but they failed. After they had failed, an old nurse of ninety years set the lady's child on her knee.

iii. The nurse set the lady's child on her knee with the idea that the sight of the child would rouse a mother's feeling in her again and would bring her out of the stupor (স্তব্ধ, হতবুদ্ধি অবস্থা) in which she was placed then

It happened as the nurse thought. For, as soon as she set the child upon the lady's knee, she burst into tears and said that she must live for the sake of the child.

Q. 3. 'Sweet my child, I live for thee.'

i. Who said this ? To whom was it said ? ii. When did the speaker say this ? (**Or,** State the context of the words.) iii. What did the speaker mean by 'I live for thee ?

Ans : i. The wife of a dead warrior said this. She said this to her child.

ii. The dead warrior's wife was so shocked to see the body of her husband that she lost her power to speak or to weep. Thinking that she would die if she continued in that state of stupor for long, her maids tried to make her weep by praising her husband in noble terms and also by showing his face to her--but all their efforts proved fruitless. Then when an old nurse set her child upon her knee she burst into tears and said these words to her child.

iii. All efforts to bring the lady out of her state of stupor failed but the sight of the child who was not only her own child but also a living link between her and husband roused the maternal feelings in her again. She became conscious of the great responsibility before her and realized that she must live to bring up the child. So she said that she must live for the child.

4. *IMPORTANT WORD-NOTES & LEXICAL TEST*

'নবম দশম'-এর March 1 এবং March 16 সংখ্যায় Word Notes এবং Lexical Element সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে—তবু কয়েকটি এখানে আবার দেওয়া হল।

Word Notes : Truest friend and noblest foe—a person's true friend is one who stands by him, rather than desert him, in times of distress and danger কোন ব্যক্তির প্রকৃত বন্ধু সে-ই যে তাকে দুঃখ বা বিপদে ফেলে না গিয়ে তার পাশে দাঁড়ায়। A person's noble foe is one who does not take advantage of his difficulties or dangers or perhaps even forgives him কোন ব্যক্তির মহান শত্রু সে-ই যে তার অসুবিধা বা বিপদের সুযোগ গ্রহণ করে না, বরঞ্চ প্রয়োজনে তাকে ক্ষমাও করে।

N. B. Such a man can easily rouse emotions in one. The lady's maids thought that by praising her husband in such noble terms they would be able to rouse emotions in her, but they failed.

A nurse of ninety years---Using the expression 'ninety years' the poet emphasizes the fact that the nurse was very old and being old, she was experienced 'নব্বই বছর' এই শব্দ দুটির সাহায্যে কবি একথাই বলতে চাইছেন যে নার্সটি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধা বলেই অভিজ্ঞা।

N.B. Since the nurse was very old she had a large experience of life.

So she knew that the maternal instinct was a woman's most powerful instinct. She knew that only by nursing the maternal feelings in the lady she could bring her out of the stupor which had nearly brought her to death.

His child—It seems the poet has used the expression **'his child'** instead of **'her** child' with a purpose. The poet perhaps wants to say that the child was not merely the lady's child but also a living link (জীবন্ত গ্রন্থি) between her and her dead husband.

Like summer tempest came her tears—The lady's bursting into tears has been compared to a summer tempest. [The comparsion has been very apt.] Before a summer tempest breaks there is a lull in Nature (প্রকৃতিতে একটা স্তব্ধভাব বিরাজ করে।) Then all of a sudden, the tempest breaks Similarly, the lady had been shocked into a state of stupor. But when she caught sight of the child she suddenly burst into tears.

Lexical Test

1. কতকগুলো Synonym এবং Antonym নিচে দেওয়া হল :

Synonym

Warrior—fighter
Swooned—fainted
Watching—looking
Praised—eulogized
Tempest—storm

Antonym

Dead—alive
Praised—condemned
Worthy—unworthy
Noblest—meanest
Sweet—bitter

2. **Pick out the right word from each of the following quotations and, with it, fill in the gap in each sentence under the quotation :**

a. **Home they brought her warrior dead.**
   i. If you talk like that you'll soon be a — man.
   ii. The — were burnt at the crematorium.
   Ans : dead (adjective and noun).

b. **Rose a nurse of ninety years—**
   i. She can — old patients very well.
   ii. My sister is a — at the local hospital.
   Ans : nurse (verb and noun).

c. **Set his child upon her knee—**
   i. I need a — of tools.
   ii. They — out on their journey.
   Ans : set (noun and verb)

3. a. **She nor swoon'd, nor utter'd cry** —Which word above means 'fainted' ?
   Ans : swooned

   b. **Call'd him worthy to be loved**—Which word above means 'fit' ?
   Ans : worthy

   c. **Rose a nurse of ninety tears**—Which word above means 'got up' ?
   Ans : rose

   d. **Like summer tempest came her tears**—Which word above means violent storm' ?
   Ans : tempest.

4. **Pick out the right word from those within brackets and, with it, fill in the gap in each sentence :**
   a. All her maidens, watching,— **(sad, said).**
   b. Stole a maiden from her—**(place, palace).[Ans :** said, place]

TASK

Answer the following questions :

Q. 1. **All her maidens, watching, said—**
   i. Who is the lady referred to here as 'her' ? What had happened to her ?

ii. What did 'her maidens' say after watching her ? What did they do to save her ?

iii. Did they succeed in their efforts ? Who finally succeeded and how did she do so ?

[**Hints :** (i) নং য়ে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর খালি লিখবে যে তার স্বামীর মৃতদেহ দেখে আঘাতে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল এবং না পারছিল কথা বলতে না কাঁদতে। (ii)নং য়ে যে দুটি প্রশ্ন আছে চারটি বাক্যে সে দুটোর উত্তর হয়ে যাবে। এই সঙ্গে Model Question এবং Answer গুলো একবার দেখে নিলে তোমাদের উত্তর করার সুবিধে হবে।]

Q. 2. Like summer tempest came her tears—

i. In which poem does this line occur ? Who is referred to here as 'her' ?

ii. Fully state the condition of the lady before her tears came.

iii. What finally brought tears to her eyes ?

iv. Explain the comparison of 'summer tempest' to the lady's 'tears.'

[**Hints :** (ii) নং প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথম 1টি বাক্যে মৃত যোদ্ধার স্ত্রীর স্তব্ধ, হতবুদ্ধি অবস্থাটার কথা বলবে। তারপর 3টি বাক্যে বলবে যে তাঁর পরিচারিকারা তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করে কি বলল এবং তাঁকে কাঁদাতে কি করল, কিন্তু পারল না। এখানেই উত্তরটা থামবে। (iii) নং য়ে বৃদ্ধা নার্স তাঁর কোলে তাঁর শিশুকে বসিয়ে দিল এবং তার ফলে কি হল—তা বলবে। (iv) নং উত্তর দেবার আগে important word notes অংশটা দেখে নিও।

COMPOSITION

I. COMPREHENSION TEST

একটি রচনাংশ পড়ে পাঠকের উপলব্ধি বা Comprehension হল কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তার নাম Comprehension Test.

সাধারণত Comprehension Test দুটি পদ্ধতিতে করা যায়—এক হল Questions & Answers বা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। অপর পদ্ধতি হল এই : রচনাংশ সম্পর্কিত একটি বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে তাকে সমাপ্ত করার জন্য পাশেই একাধিক বাক্যাংশ দেওয়া হয়। উক্ত বাক্যাংশগুলোর মধ্যে একটি শুদ্ধ, অপরটি বা অপরগুলো ভুল। পরীক্ষার্থীর কাজ হল শুদ্ধ বাক্যাংশটি বেছে নিয়ে তা দিয়ে অসমাপ্ত বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখা।

তোমাদের Comprehension Test করা হয় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে। নিচে একটি Sample বা নমুনা দিয়ে একটি Task দেওয়া হল।

SAMPLE

একটি রচনাংশ (passage) তিনটি অনুচ্ছেদে (paragraph) ভেঙে নিচে দেওয়া হল। প্রথম দুটি অনুচ্ছেদের নিচে একটি করে এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদের নিচে তিনটি বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে পাশেই বিকল্প বাক্যাংশ দেওয়া হল। শুদ্ধ বাক্যাংশটি বেছে নিয়ে বক্তব্য সম্পূর্ণ করে দেওয়া হল।

1. **Subhaschandra Bose whom we commonly call Netaji passed the Indian Civil Service Examination in 1921. But he wanted to resign from the Indian Civil Service.**

The year in which Subhaschandra passed the Indian Civil Service Examination was a year of the (i) nineteenth century (ii) twentieth century.

The year in which Subhaschandra passed the Indian Civil Service was a year of the twentieth century.

* এখানে তোমার শব্দজ্ঞান নিয়ে--অর্থাৎ তুমি nineteenth century এবং twentieth century যথাক্রমে কোন শতবর্ষকে বোঝায় তা জান কিনা—তা নিয়ে পরীক্ষা করা হল।

2. When Subhaschandra's father asked him why he wanted to resign, Subhaschandra said, 'I will not serve the British Raj. Then he added, 'I'll fight the British Raj to make my country free.'

Subhaschandra wanted to resign from the Indian Civil Service because he wanted (i) to rule India (ii) to make his country free (iii) to serve the British Raj.

Subhaschandra wanted to resign

from the Indian Civil Service because he wanted to make his country free.

* এখানে শূন্য বাক্যাংশটি রচনার অন্তর্গত।

3 Subhaschandra was not only eager to free his countrymen he also wanted to suffer for them. When he was a young man of twenty eight years, he was arrested and imprisoned for six months. Subhaschandra was very angry. 'Am I a chicken', he said 'that I should be kept in jail only for six months ?'

a. A chicken is the youngling of (i) a sparrow (ii) a hen (iii) a cuckoo

b. To be 'imprisoned' means to be (i) put in prison ii) let out of jail

c. When he was imprisoned, Subhaschandra became angry because (i) he did not like to be imprisoned (ii) he wanted a longer period of imprisonment (iii) he wanted a shorter period of imprisonment.

a. A chicken is the youngling of a hen.

b. To be imprisoned means to be put in prison.

c. When he was imprisoned, Subhaschandra became angry because he wanted a longer period of imprisonment.

* এখানে (a) এবং (b) দ্বারা তোমাদের শব্দ-জ্ঞানের পরীক্ষা করা হল। (c)-তে যে বক্তব্য আছে ঠিক ঐ ভাষাতেই সুভাষচন্দ্র কথাটি বলেননি, কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তা থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায়।

TASK

একটি রচনাংশ তিনটি অনুচ্ছেদে ভেঙে নিচে দেওয়া হল। প্রতি অনুচ্ছেদের নিচে অসমাপ্ত বাক্য এবং তার পাশে বিকল্প বাক্যাংশ দিয়ে দেওয়া হল। তোমরা যথাবিধি শূন্য বাক্যাংশটি বেছে নিয়ে অসমাপ্ত বাক্য সম্পূর্ণ করে লেখ

1. Two hundred years ago, two brothers of France, one day, watched smoke rising to the sky. They thought. 'If we put some smoke in a small paper bag, the smoke will go up taking the bag with it.' They put some smoke in a paper bag and it went up taking the paper bag with it. Then they made bigger and bigger bags every day and sent them up to the sky. They were called the Montgolfier Brothers

a. The two men who sent up a bag to the sky were (i) neighbours (ii) cousins (iii) brothers.

b. The first bag into which the Montgolfier Brothers put smoke was made of (i) jute (ii) paper (iii) paper and silk (iv) paper and jute.

2. At last one day in 1783, these two brothers put a very large quantity of smoke into a very large bag made of paper and silk. Then they put a cock, a duck and a sheep inside the bag and let it off. This bag came to be known as the balloon

a. The year in which the Montgolfier Brothers sent up the 'balloon' to the sky was a year of the (i) eighteenth century (ii) seventeenth century.

b. A cock is a (i) male fowl (ii) female fowl.

3. Many people had assembled to see the strange flight of two birds and a beast. When the balloon went up, they cried out happily. After a time the balloon came down to the earth and the duck, the sheep and the cock ran off

a. The balloon went up with (i) two beasts and a bird (ii) two birds and a beast (iii) three beasts.

b. People who had assembled to see the flight cried out (i) for joy (iii) for fear.

c. After a time, the balloon (i) fell into a sea (ii) blew up in flames (iii) came down to the earth.

II. LETTER-WRITING

'Letter-writing' নিয়ে 'নবম-দশম'-এর April I এবং April 16 সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। তবু একবার দেখে নিও।

চিঠি মোটামুটিভাবে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি : a. Personal or Private Letters, b. Business Letters এবং c. Official Letters including applications, letters to the editor of a newspaper etc.

[সূর্যাস্তে বাড়ি ফিরলে।]

নিচে একটি Personal Letter-এর নমুনা এবং তারপর তোমাদের জন্য একটি Task দেওয়া হল।

SAMPLE

Write a letter to your neighbour whose dog barks all night.

55 Lake Place
Calcutta-29
1.6.82

Dear Sir Roy,

I have been thinking, for quite some time, of writing this note to you.

I find you have recently brought in a dog to guard your house. No doubt, it does guard your house but it keeps barking all the night. This disturbs us all.

I would request you to see that it stops barking so that we may sleep peacefully.

I hope you will take my letter in the right spirit.

Thanking you,
Yours sincerely
P. Sengupta.

To
Sri S. M. Roy
66, Lake Place
Calcutta-29.

TASK

Write a letter to your friend, describing a visit to the Calcutta Zoo.

[**Hints :** চিঠির বিভিন্ন অংশগুলো Heading, Salutation, Subscription ইত্যাদি ঠিকমত লেখ। আর, চিঠির আসল বস্তু যাকে বলা যায় Body of Letter মোটামুটি এইভাবে লেখ :

তুমি কবে চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলে : সঙ্গে কে বা কারা ছিল তোমরা টিকিট কেটে ঢুকেছিলে ভেতরে ঢুকে প্রথম কি জন্তু দেখেছিলে। হাতি, জেব্রা ইত্যাদি। বানরের খাঁচার সামনে গিয়ে বানরগুলোকে বাদাম খেতে দিলে, নিজেরাও খেলে তারপর কুমীর, সাপ দেখলে—তারপর বাঘ, সিংহ দেখলে বাঘের গর্জনে ভয় পেয়েছিলে—হঠাৎ এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল খুব খুশী হলে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে নানা রঙের পাখি দেখে

Books of Reference

1. **A University Grammar of English** *by* **R. Quirk & S. Greenbum.**
2. **The Way To Good English** *by* **S. Sengupta.**

বিঃ দ্রঃ 'নবম-দশম'-এর May 1 সংখ্যায় ইংরেজী Translation অংশে It is you who is my mother এবং It is you who is my India. এই বাক্য দুটিতে 'who is' না হয়ে 'who are' হবে কারণ 'who'-র antecedent এখানে 'you', ফলে verb টি 'are' হবে।

এই ভুলের জন্য লেখক ও সম্পাদক উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত। যিনি সহৃদয়ভাবে এই ভুলটি আমাদের নজরে এনেছেন তিনি কলকাতার টাউন স্কুলের শিক্ষক, নাম শ্রীঅজিত পাইন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

শৈবাল সেন

পুনরনুশীলন

আগের সংখ্যায় আমরা প্রথম থেকে সাম্রাজ্যিক ঐক্যের প্রথম পর্ব অর্থাৎ বিম্বিসার থেকে অশোক পর্যন্ত—প্রথম ৫ম অধ্যায় ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অর্ধেক পর্যন্ত পুনরালোচনা করেছি। এবার চন্দ্রগুপ্ত থেকে স্কন্দগুপ্ত অংশের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। এ অংশের সম্ভাব্য অনেক প্রশ্ন আমরা সাধারণ আলোচনার সময়ই উল্লেখ এবং তার তথ্য পরিবেশন করেছি। বস্তুত, আলোচ্য অংশটুকু গুপ্ত যুগের রাজনৈতিক কৃতিত্ব ও পতনের কারণ সম্পর্কিত। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র সংক্রান্ত আলোচনা আছে ৭ম অধ্যায়ে; 'স্বর্ণযুগের' কথাও সেখানে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন

১. গুপ্তবংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে? কখন? কিভাবে?

উত্তর সংকেত ঃ ১০ম সংখ্যা পৃ. ৪৬ দেখ।

এক ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিপতি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (যাঁর পিতার নাম ঘটোৎকচগুপ্ত বলে লিপিতে উল্লেখ আছে) বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্ত বৈশালীর ইতিহাস বিখ্যাত লিচ্ছবী-বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন এবং লিচ্ছবীদের সহায়তায় পাটলিপুত্র অধিকার করে নিজেকে 'মহারাজাধিরাজ' বলে ঘোষণা করেন।

৩২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'গুপ্ত অব্দ' প্রচলিত হয়, সম্ভবত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই অব্দ সূচনা করেন। তিনি ২০ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন কিন্তু সম্রাট উপাধি ধারণ করেননি। শ্বশুরকুল লিচ্ছবীদের সাহায্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর যোগ্য পুত্র সমুদ্রগুপ্ত গর্বের সঙ্গে নিজেকে 'লিচ্ছবী দৌহিত্র' বলে উল্লেখ করেছেন।

২. কোন কোন উপাদানের সাহায্যে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কে জানা যায়? উত্তর সংকেত ঃ ১০ম সংখ্যা পৃ. ৪৯। ঐতিহাসিক উপাদান দুটি—

i. কবি হরিষেণ বিরচিত **এলাহাবাদ প্রশস্তি,** সংস্কৃতে লেখা, অশোকের শিলাস্তম্ভে খোদিত আছে।

ii. সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা যাতে 'অশ্বমেধ পরাক্রম' ও যজ্ঞদেবীসহ অশ্ব অংকিত আছে। এটিকে সাধারণত অশ্বমেধমুদ্রা বলা হয়; এ ছাড়া অন্য মুদ্রায় অংকিত আছে বীণাবাদনরত মূর্তি, ব্যাঘ্রদলনকারী মূর্তি। এগুলো থেকে সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত চরিত্রের পরিচয় মেলে। গুপ্তসম্রাটদের সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ১০ম সংখ্যায়। ঐ সংখ্যাতেই উত্তর সংকেত দেওয়া আছে।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

i. গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।

ii. গুপ্তবংশের প্রথম নরপতি কি উপাধি ধারণ করেছিলেন?

মহারাজাধিরাজ।

iii. গুপ্তঅব্দ কখন প্রচলিত হয় ?
৩২০ খ্রি. থেকে।

iv. এলাহাবাদ প্রশস্তির রচয়িতা কে ?
কবি হরিষেণ।

v. এলাহাবাদ প্রশস্তির প্রধান বিষয়বস্তু কি ?
সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বর্ণনা।

vi. 'শকারি বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন কে ?
গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

vii. শ্বেতহূণদের বিতাড়িত করে সাম্রাজ্য রক্ষা করেন কে ? তিনি কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ?
স্কন্দগুপ্ত। 'বিক্রমাদিত্য'।

viii. 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' কাকে বলা হয়েছে ? কেন ?
সমুদ্রগুপ্ত। তিনি উত্তর ভারতের অনেক রাজ্য (প্রশস্তিতে নয়টির উল্লেখ আছে) জয় করে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

ix. সমুদ্রগুপ্ত কোন অঞ্চলের রাজাদের 'উচ্ছেদ' করেননি ?
বিন্ধ্যপর্বতের নিকটবর্তী রাজ্য ও দক্ষিণ ভারতের মহানদী থেকে কৃষ্ণানদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চলের নৃপতিগণ পরাজিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলে সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের রাজ্যগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

x. 'ভারতের নেপোলিয়ন' কাকে বলা হয়েছে ? কে বলেছেন ?
সমুদ্রগুপ্তকে। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ।

xi. 'কবি-রাজ' উপাধি কে ধারণ করেন ?
সমুদ্রগুপ্ত।

xii. কার সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটে ? কোন কোন অঞ্চল তখন বিজিত হয় ?
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে।
মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের শক রাজাদের রাজ্য, বঙ্গরাজ্য (সমতট); সিন্ধুনদের পশ্চিমে বাহ্লীকরাজ্যও অধিকার করা হয়েছিল বলে কুতবমিনারের কাছে প্রাপ্ত লৌহস্তম্ভ 'চন্দ্র' নামে রাজার উল্লেখ আছে। অনেকের মতে এই 'চন্দ্র' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

xiii. গুপ্তযুগে কোন বিদেশী শত্রু ভারত আক্রমণ করেছিল ? কে তাদের প্রতিহত করেছিল ?
হূণগণ। স্কন্দগুপ্ত।

xiv. গুপ্ত আমলে হূণদের আক্রমণ শুরু হয় কখন ?
কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শেষদিকে।

xv. গুপ্তযুগে কোন ভাষার প্রচলন ছিল ?
সংস্কৃত।

৩. **গুপ্তরাজাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য কতকগুলো বিশেষণ উপাধি দেওয়া হল। এর কোনটি কার পক্ষে খাটে ?**

মহারাজাধিরাজ, শকারি, সর্বরাজোচ্ছেত্তা, ভারতভ্রাতা, বিক্রমাদিত্য, লিচ্ছবী দৌহিত্র, কবি-রাজ, অশ্বমেধ-অনুষ্ঠাতা, সমতটবিজেতা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক।'

ইতিহাসের পুনরনুশীলন শেষ হল। এই সংখ্যা থেকেই আমরা নতুন পাঠ শুরু করছি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ঐক্য স্থাপন চেষ্টার নায়ক মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন। এবারে শুরু হচ্ছে সেই আলোচনা।

রাজনৈতিক আসরের প্রতিযোগী

গুপ্তসাম্রাজ্যের শক্তি মহিমা খর্ব হয়ে গেলে উত্তর ভারতে যে রাজারা প্রধান হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তাদের পরিচয় জানা যাক—

কনৌজ

বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মৌখরিগণ গুপ্তদের সামন্ত নৃপতিরূপে কনৌজ রাজ্য শাসন করতেন। ঈশানবর্মণের সময় এই বংশ প্রতিপত্তি লাভ করে। তিনি কিছু অঞ্চল অধিকার করে মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। মৌখরি বংশ থানেশ্বরের রাজবংশের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল।

মালব

মালবের রাজা দেবগুপ্ত উত্তর ও পূর্বদিকে নিজ রাজ্যসীমা বাড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন। মৌখরিদের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা, তিনি গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন।

গৌড়

গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক গুপ্তরাজাদের সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি 'মহাসামন্ত' শশাঙ্ক নামে পরিচিত। শশাঙ্কের সঙ্গে থানেশ্বর রাজবংশের বিরোধ ছিল, কাজেই থানেশ্বর-কনৌজের শত্রু মালবের দেবগুপ্ত হয়েছিলেন তাঁর বন্ধু।

কামরূপ

কামরূপ অর্থাৎ আসামের রাজা ভাস্করবর্মা থানেশ্বর রাজ্যের মিত্ররূপে পরিচিত।

থানেশ্বর

পুষ্যভূতি বংশের আদিত্যবর্মণ থানেশ্বরের সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রভাকরবর্ধন হূণদের যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি মালবের রাজাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করে রাজ্য-সীমা বাড়িয়েছিলেন।

হিতোপদেশের বাস্তব প্রয়োগ

বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশের গল্প তোমরা পড়েছ। বয়স্ক রাজপুত্রদের রাজনীতি শেখানর জন্য পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার মিত্রলাভ, মিত্রভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি—এই চারটি গল্পে পশুপাখি মানুষের মত সমস্যা নিয়ে উপস্থিত, সমস্যা হল বাস্তব রাজনীতির প্রয়োগ। গল্পে দেখা যায়, শক্তিবৃদ্ধির জন্য মিত্রলাভ প্রয়োজন, বন্ধুর সাহায্য সৌভাগ্য এনে দেয়; শত্রুপক্ষের যারা মিত্র তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারলে শত্রুকে দুর্বল করা যায়; তেজের সঙ্গে বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ করা এবং অনুকূল সময়ে সন্ধি করে লাভবান হওয়া হল সফল রাজনীতির লক্ষ্য।

উত্তর ভারতের প্রতিযোগী রাজাদের মধ্যেও এমনি রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধন মৌখরিবংশের রাজা গ্রহবর্মণের সঙ্গে কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়ে মিত্রলাভ করেছিলেন। অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যা করার ঘটনা থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কনৌজের মৌখরি রাজা গ্রহবর্মা মালবের রাজা দেবগুপ্তের আকস্মিক আক্রমণে নিহত হলে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে আলোড়ণ শুরু হয়ে যায়, তার ফলে এক নতুন সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে।

কনৌজের উত্থান কাহিনী

থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময় কনৌজরাজ গ্রহবর্মা মালবের অধিপতি দেবগুপ্তের অতর্কিত আক্রমণে নিহত এবং রাণী রাজ্যশ্রী (রাজ্যবর্ধনের ভগিনী) বন্দিনী হন। এই দুঃসংবাদ শুনে রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে গিয়ে

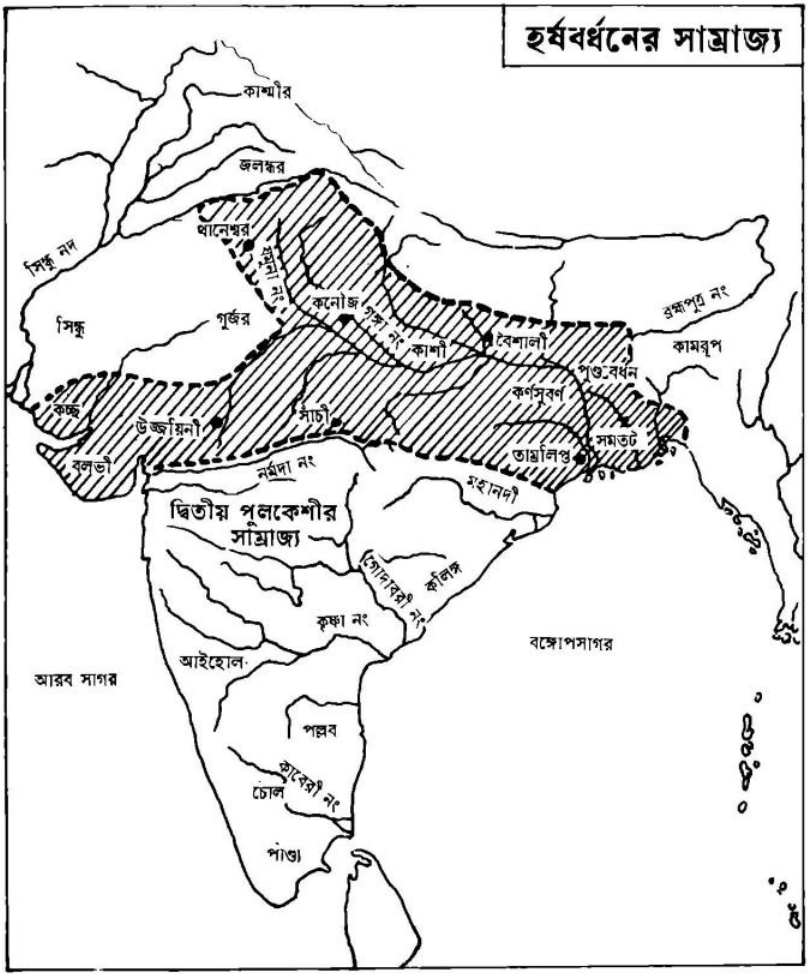

যুদ্ধে দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন। একটির পর আর একটি ঘটনা যখন এই রকম দ্রুত ঘটছিল, গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক মিত্র দেবগুপ্তকে সাহায্য করার জন্য কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে বিজয়ী রাজ্যবর্ধনের সৈন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং যুদ্ধ; যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। এই নিদারুণ খবর শুনে রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরবয়স্ক হর্ষবর্ধন সৈন্যবাহিনী নিয়ে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন, সংকল্প শশাঙ্ককে ধ্বংস করতে হবে।

রাজ্যশ্রী উদ্ধার

ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে হর্ষবর্ধন যখন শশাঙ্ককে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সৈন্যসহ ধেয়ে চলেছেন, তখন শুনলেন ভগিনী রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে গিয়ে আগুনে প্রাণবিসর্জন দিতে উদ্যত। সেনাপতি ভণ্ডিকে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে হর্ষবর্ধন নিজে রাজ্যশ্রীর উদ্ধারে চললেন এবং নাটকীয়ভাবে শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত ভগিনীকে রক্ষা করলেন।

হর্ষবর্ধনের পক্ষে শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য

প্রভাকরবর্ধনের পুত্র এবং রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন এবং ৬১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুবরাজ শিলাদিত্য নামে রাজত্ব করেন। ভগিনীপতি গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজ যুক্তভাবে শাসন করতে থাকেন; রাজধানী থানেশ্বর থেকে কনৌজে স্থানান্তরিত হয়।

ঘটনাচক্রে হর্ষবর্ধন কনৌজ রাজ্য লাভ করেন এবং প্রধান শত্রু শশাঙ্ককে দমন

করার জন্য কূটনৈতিক পন্থায় মিত্রলাভের ব্যবস্থা করেন। বলভীর (বর্তমান সৌরাষ্ট্র) রাজা ধ্রুবভট্ট হর্ষবর্ধনের নিকট পরাজিত হলেও হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্য অধিকার করে নেননি। বরং তিনি নিজ কন্যাকে ধ্রুবভট্টের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে পশ্চিম অঞ্চলে অনুগত আত্মীয় লাভ করলেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা এবং মগধের ক্ষুদ্র রাজা মাধবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তবু শশাঙ্কের কোন ক্ষতি করতে পারেননি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মিত্র কামরূপের রাজার সহায়তায় গৌড়ের পতন ঘটান।

চীনাদের বিবরণ থেকে জানা যায়, ৬১৮ থেকে ৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছিল এবং শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন চতুর্দিকের নৃপতিদের যথাযোগ্য শাস্তিবিধান করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি দক্ষিণ দিকে নর্মদা নদী পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বাতাপী বংশের দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রতিরোধে নর্মদাতীরে তাঁর গতিরুদ্ধ হয়। কিন্তু উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পূর্বে বঙ্গদেশসমেত গঞ্জাম (কলিঙ্গ) থেকে পশ্চিমে বলভী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এর আগে আমরা দুটি সাম্রাজ্যের পরিচয় পেয়েছি—মৌর্যসাম্রাজ্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য। সামরিক শক্তিতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিংবা সমুদ্রগুপ্তের মত না হলেও হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য উত্তর ভারতেই প্রত্যক্ষভাবে সীমাবদ্ধ থাকলেও দক্ষিণ ভারতের বহু রাজা সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতের কোন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করার পর ৬৪৬ কিংবা ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব

ইতিহাসের গতিপথে রাজ্য ভাঙাগড়া, উত্থান-পতনের কাহিনী আমরা দেখে আসছি। ভারতের সাম্রাজ্য গঠনের মাধ্যমে যাঁরা রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটিয়েছিলেন, হর্ষবর্ধন তাঁদের মধ্যে একজন। কৈশোরে বিপদের সম্মুখীন হলেও সাহস, ধৈর্য ও সংকল্পের বলে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্রদেশগুলি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় আত্মকলহে লিপ্ত, শত্রুপক্ষ মিত্রলাভ করে প্রবল হয়ে উঠেছে, ভগ্নীপতির মৃত্যু হওয়ায় কনৌজরাজ্য শাসনের দায়িত্বও তাঁর ওপর এসে পড়েছে, এই রকম অবস্থা তরুণ বয়স্ক হর্ষবর্ধন যেরূপ বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর ভারতে আবার শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে

এনে রাজনৈতিক সাধন করেছিলেন তা প্রশংসার যোগ্য। তবে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সমাজ-জীবন যেমন সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ ছিল হর্ষবর্ধনের সময়ে তেমন অবস্থা ছিল না। একথা গুপ্ত আমলে আগত চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন এবং তাঁর রাজত্বকালে আগত হিউয়েন সাঙের বিবরণীর তুলনা থেকে বোঝা যায়।

হর্ষবর্ধন

তাঁর পূর্ববর্তী যুগের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থাই এর জন্য দায়ী। প্রজার মঙ্গলের জন্য হর্ষবর্ধন অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তিনি ছিলেন তৎপর।

যোদ্ধা ও শাসক ছাড়া হর্ষবর্ধনের আর কোন পরিচয় আছে কি এ প্রশ্ন কেউ করলে তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণাবলী উল্লেখ করা যায়।

● সমুদ্রগুপ্তের মত হর্ষবর্ধনও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর লেখা 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ', ও 'প্রিয়দর্শিকা', নাটক সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য এবং এখনও পর্যন্ত অভিনীত হয়ে থাকে।

● হর্ষবর্ধন নিজে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী থাকলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের প্রতিই তিনি ছিলেন উদার, সমানভাবে বদান্য এবং গুণগ্রাহী।

● তাঁর রাজসভায় সাহিত্যিক ও ধার্মিক ব্যক্তির সমাদর ছিল। 'হর্ষচরিত' রচয়িতা বাণভট্ট, ময়ূর, দিবাকর ও অন্যান্য সাহিত্যসেবী এবং বৌদ্ধদার্শনিক হিউয়েন সাঙ হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে-ছিলেন।

● হর্ষ বিদ্বান এবং বিদ্যা-প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তিনটি বিহার এবং একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মন্দির প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

● ভারত-ইতিহাসে একথা স্বীকৃত যে, সামরিক শক্তিতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিংবা সমুদ্রগুপ্তের মত না হলেও হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

● তিনি ছিলেন যোদ্ধা এবং সুশাসক, উদার এবং বিদ্যোৎসাহী, নাট্যকার ও ধর্মানুরাগী। বিবিধ গুণের সমন্বয়ে হর্ষবর্ধন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ।

● প্রতি পাঁচ বৎসর পর প্রয়াগতীর্থে 'মহামোক্ষ পরিষদ' অর্থাৎ বিশাল দানসত্র অনুষ্ঠান করে জনগণের মধ্যে দান করতেন। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগে যে মহামোক্ষ পরিষদ অনুষ্ঠিত হয়, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাতে উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, প্রায় ৫ লক্ষ লোক এই মহামেলায় সমবেত হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ ও কুড়িটি দেশের রাজার সঙ্গে তিনি সেখানে গমন করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, পাঁচ বছরে সঞ্চিত রাজকোষের ধনরত্ন বিলিয়ে দিয়ে একখানি পুরনো কাপড় পরে নিজের পরিধেয়-পরিচ্ছদ পর্যন্ত দান করতেন। হর্ষবর্ধন ছিলেন প্রজাপালক, ত্যাগী রাজার মহৎ দৃষ্টান্ত।

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

পুনরনুশীলন

আগের পাঠে পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল পর্যন্ত পুনরনুশীলন করা হয়েছে। আজ পুনরনুশীলন হবে —মধ্য ও পূর্ব হিমালয়, গঙ্গা-সমভূমি ও মরু অঞ্চল।

প্রথমে ছোট ছোট প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করে ফেল। তারপর জেনে নাও একটি বড় অঞ্চলকে কিভাবে ছোট ছোট পয়েণ্টে ভাগ করে মনে রাখবে।

৫ম পাঠ

মধ্য ও পূর্ব হিমালয়ের কথা

মধ্য হিমালয়

মধ্য হিমালয় তোমাদের পড়তে হচ্ছে না, কারণ মধ্য হিমালয় সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন নেপাল রাষ্ট্রের অন্তর্গত। তবে একটা কথা কি জান, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের আলোচনা করতে বসে ঠিক মাঝখানটা একেবারে লাফ দিয়ে চলে যাবে—এটা ঠিক না। তাই বলছি মধ্য হিমালয় কি রকম, চটপট একবার দেখে নাও--

১. পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ (৮৮৪৮ মি.) ছাড়াও এখানে আরও কতকগুলো বিখ্যাত শৃঙ্গ আছে।

২. সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর জন্য এখানে অনেক হিমবাহ ও নদনদী সৃষ্টি হয়েছে।

৩. একটি বিখ্যাত উপত্যকা আছে, নাম—কাঠমাণ্ডু উপত্যকা। লোকবসতি এই উপত্যকায় খুব বেশি।

৪. পাহাড়ের গায়ে ও বিভিন্ন উপত্যকায় কিছু কিছু চাষ আবাদ ও পশুপালন হয়।

পূর্ব হিমালয়

পশ্চিম হিমালয়ের মত পূর্ব হিমালয়ে কতকগুলো ছোট বা গৌণ অঞ্চল আছে—ক. সিকিম হিমালয়, খ. দার্জিলিং হিমালয়, গ. ভূটান হিমালয় ও ঘ. অরুণাচল হিমালয়।

এর মধ্যে ভূটান হিমালয় তোমাদের পড়তে হবে না, কারণ ভূটান ভারতের বাইরে। নেপাল হিমালয় ভারতের বাইরে হলেও সামান্য আলোচনা করেছি। কিন্তু ভূটান হিমালয়ের এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই যা আলাদা করে বলার মত। সাধারণভাবে পূর্ব হিমালয়ের অন্যান্য অংশ সম্পর্কে যা জেনেছ—ভূটানের ভৌগোলিক পরিবেশ ঐ একই ধরনের।

এবার বাকি গৌণ অঞ্চলগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এইভাবে ছোট ছোট পয়েণ্টে ভাগ করে নাও—মনে রাখার সুবিধা হবে।

সিকিম-দার্জিলিং-অরুণাচল হিমালয়

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ

১. সিকিমের উত্তরে হিমাদ্রি পর্বত-শ্রেণী, পশ্চিমে হিমাদ্রির একটি শাখা সিঙ্গলীলা শ্রেণী এবং পূর্বে অপর শাখা ডংকিয়া শ্রেণী বিস্তৃত হয়েছে।

২. সিকিমের ঠিক দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় প্রধানত দুটি পর্বতশ্রেণী আছে—সিঙ্গলীলা শ্রেণী ও দার্জিলিং শ্রেণী। এছাড়া দক্ষিণে টাইগার হিল থেকে কয়েকটি ছোট পর্বতশ্রেণী চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছে।

৩. অরুণাচল প্রদেশে শিবালিক, হিমাচল ও হিমাদ্রি—তিনটি পর্বতশ্রেণী আছে। হিমাদ্রি শ্রেণীতে অনেকগুলো উঁচু বরফে ঢাকা শৃঙ্গ আছে।

৪. তিস্তা, রঙ্গিত, মেচি, তোরসা, বালাসন, জলঢাকা প্রভৃতি সিকিম ও দার্জিলিং-এর প্রধান নদী।

৫. ব্রহ্মপুত্র বা ডিহং, সুবনসিরি, দিবং, লোহিত প্রভৃতি অরুণাচলের প্রধান নদী।

৬. বর্ষাকালে সমগ্র পূর্ব হিমালয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়—গড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ সে.মি.। গ্রীষ্ম ও শীতের গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ২০° ও ৪° সেন্টিগ্রেড।

৭. প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় বলে সমগ্র পূর্ব হিমালয়ে নানা ধরনের গাছের গভীর অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে।

৮. পূর্ব হিমালয়ের মাটি চার ধরনের —পর্বতের পাদদেশের তরাই মাটি, পর্বতের গায়ের ক্ষয়জাত মাটি, অরণ্যাঞ্চলের হিউমাসযুক্ত অরণ্য মাটি ও নদী উপত্যকার পলিমাটি।

৯. সামান্য পরিমাণে কয়লা, তামা, সীসা ইত্যাদি দার্জিলিং ও সিকিমে পাওয়া যায়। অরুণাচলে খনিজ তেল পাওয়া যেতে পারে।

১০. পূর্ব হিমালয়ের গভীর অরণ্যে চিতা, ভল্লুক, গণ্ডার, হাতি, হরিণ প্রভৃতি জীবজন্তু আছে।

খ. অপ্রাকৃতিক পরিবেশ

১১. নদী উপত্যকায় ও পাহাড়ের ঢালে ধান, গম, যব, ভুট্টা, চা, বড় এলাচ, কমলালেবু প্রভৃতি চাষ করা হয়। অরুণাচলে ঝুম প্রথায় চাষের প্রচলন বেশি।

১২. পর্বতের ওপরের তৃণভূমিগুলোতে কিছু কিছু গরু, মেষ, ইয়াক প্রভৃতি পশুপালন করা হয়। পশ্চিম হিমালয়ের তুলনায় এখানে পশুপালন কম হয়।

১৩. ভারী শিল্প কিছু নেই। সমগ্র অঞ্চলে কাঠ, তাঁত, পশম ইত্যাদি শিল্প আছে। বাঁশ ও বেত দিয়ে এখানে নানা ধরনের হাতের কাজ করা হয়। এছাড়া সিকিমে ফলের ওপর ভিত্তি করে ফল সংরক্ষণ, জেলি প্রস্তুত ইত্যাদি শিল্প এবং দার্জিলিং-এ চা শিল্প আছে।

১৪. কতকগুলো ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে।

১৫. যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। তবে সিকিম ও অরুণাচলের তুলনায় দার্জিলিং-এ রাস্তাঘাট বেশি আছে।

১৬. সমগ্র হিমালয় অঞ্চলের মধ্যে এই পূর্ব হিমালয়ের লোকবসতি সবচেয়ে কম। সিকিম ও অরুণাচলের তুলনায় দার্জিলিং-এর লোকবসতি বেশি।

প্রশ্ন

১. ঠিক কিনা বল :

ক. পূর্ব হিমালয়ের বিখ্যাত উপত্যকাটির নাম কাঠমাণ্ডু উপত্যকা।

খ. দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব সীমানায় সিঙ্গলীলা পর্বতশ্রেণী।

গ. সিকিমের পূর্ব সীমানায় ডংকিয়া পর্বতশ্রেণী।

ঘ. অরুণাচল প্রদেশের একটি পর্বত-শৃঙ্গের নাম—সন্দাকফু।

ঙ. 'তরাই' শব্দের অর্থ ভিজে ও স্যাঁতসেতে জমি।

২. সঠিক উত্তর দাও :

ক. দার্জিলিং-এ সিকিমে / অরুণাচলে ঝুম প্রথায় চাষ করা হয় !

খ. সিকিমের দার্জিলিং-এর/অরুণাচলের পশ্চিম সীমানায় বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গ।

গ. অরুণাচল প্রদেশের শিবালিক / হিমাচল / হিমাদ্রি পর্বতশ্রেণীতে বিখ্যাত নামচাবারোয়া শৃঙ্গ।

ঘ. তিস্তা / ডিহং / রঙ্গিত—অরুণাচলের প্রধান নদী।

ঙ. ডংকিয়া সিঙ্গলীলা শিবালিক—পর্বতশ্রেণীতে নাথুলা ও জিলাপ-লা নামে দুটি গিরিপথ আছে।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. সিকিমের — প্রকল্প থেকে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

খ. তিব্বত-অরুণাচল সীমান্তে — নামে একটি গিরিপথ আছে।

গ. পূর্ব হিমালয়ের মধ্যে একমাত্র — থেকে — পর্যন্ত একটি ছোট রেলপথ আছে।

ঘ. পূর্ব হিমালয়ের সবচেয়ে বড় শহরের নাম —।

৪. এককথায় বল ঃ

ক. দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটির নাম কি ?

খ. সিকিম-দার্জিলিং অঞ্চলের প্রধান নদীটির নাম কি ?

গ. পূর্ব হিমালয়ের কোন অংশে লোক-বসতি বেশি ?

ঘ. সিকিমের উত্তরাংশে কোন পর্বত-শ্রেণী বিস্তৃত হয়েছে ?

৫. কারণ দেখাও ঃ

ক. পশ্চিম হিমালয়ের তুলনায় পূর্ব হিমালয়ে পশুপালন কম।

খ. দার্জিলিং অঞ্চলে অনেকগুলো চা তৈরির কারখানা আছে।

গ. পশ্চিম হিমালয়ের তুলনায় পূর্ব হিমালয়ে বৃষ্টিপাত বেশি।

এবার সমগ্র হিমালয় অঞ্চলের ওপর আরও কতকগুলো প্রশ্ন লক্ষ্য কর ঃ

প্রশ্ন

১. পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর সঙ্কেত ঃ প্রশ্নটি ভালভাবে **লক্ষ্য কর। দেখ—দুটি অঞ্চলের পার্থক্য** নেই, আছে তুলনা। তাহলে এর উত্তরে তুমি দুটি অঞ্চলের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মিল ও অমিল বা সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য—একসঙ্গে দুই লিখবে।

উত্তরের মধ্যে এই উপাদানগুলো তুলনা করবে--

ক. অবস্থান, খ. ভূ-প্রকৃতি, গ. হ্রদ, হিমবাহ ও নদনদী, ঘ. জলবায়ু, ঙ মাটি, চ. স্বাভাবিক উদ্ভিদ, ছ. জীবজন্তু ও জ. খনিজ দ্রব্য। দুটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের এই তুলনা যতটা পারবে চিত্র এ'কেও বুঝিয়ে দেবে।

প্রশ্ন

২ ভারতের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর হিমালয়ের প্রভাব নির্ণয় কর।

উত্তর সঙ্কেত ঃ এর উত্তর পঞ্চম পাঠে আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন

৩. কারণ দেখাও ঃ

ক. হিমালয় অঞ্চলে জনবসতি খুব কম।

খ. হিমালয় অঞ্চলে ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি।

গ. হিমালয় অঞ্চল কুটীর-শিল্পে উন্নত।

ঘ. পশ্চিম হিমালয়ে বেশি পশুপালন করা হয়।

ঙ. হিমালয়ের জন্য উত্তর ভারতের সমভূমিতে ভাল কৃষিকাজ হয়।

৬ষ্ঠ পাঠ

গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল

৫ম পাঠে হিমালয় অঞ্চলের আলোচনা শেষ হয়েছে। ৬ষ্ঠ পাঠ থেকে তোমাদের পাঠ্য তালিকার দ্বিতীয় ভৌগোলিক অঞ্চল—গঙ্গা সমভূমির আলোচনা শুরু।

গঙ্গা সমভূমি সম্পর্কে এই পাঠে যেগুলো পড়েছ মনে করে নাও—

১. গঙ্গা নদী অববাহিকার সমতল অংশের নাম—গঙ্গা সমভূমি। ভারতের তিনটি রাজ্য—উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

২. **জন্ম ঃ** উত্তরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণে মালভূমি অঞ্চলের মাঝখানের নিচু জায়গাটিতে ক্রমশ পলি সঞ্চিত হয়ে এই সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

৩. **গুরুত্ব ঃ** ক. এই অংশটি ভারতের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল, খ. কৃষি, শিল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য ইত্যাদি সব ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এই সমভূমি তুলনাহীন, গ. দেশের বেশির ভাগ শহর, নগর ইত্যাদি এখানে গড়ে উঠেছে।

৪. **বৈশিষ্ট্য ঃ** সমগ্র গঙ্গা সমভূমি একটি ভৌগোলিক অঞ্চল হলেও এর পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের কিছু পার্থক্য আছে। ঐ পার্থক্য অনুসারে গঙ্গা সমভূমিকে তিনটি ছোট বা গৌণ অঞ্চলে ভাগ করা হয়—

ক. উচ্চ গঙ্গা সমভূমি, খ. মধ্য গঙ্গা সমভূমি ও গ. নিম্ন গঙ্গা সমভূমি।

এবার উচ্চ গঙ্গা সমভূমির বৈশিষ্ট্যগুলো ছোট ছোট করে বলে দিচ্ছি—

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ

১. সমগ্র গঙ্গা সমভূমির পশ্চিমাংশ—পশ্চিমে যমুনা নদী থেকে পূর্বে ১০০ মিটার সমোন্নতি রেখা পর্যন্ত উচ্চ গঙ্গা সমভূমি।

২. পলিগঠিত সমতলভূমি হলেও ভূপ্রকৃতির মধ্যে কিছু বৈচিত্র আছে—ক. দুটি নদীর মাঝখানে অনেক পুরনো পলিগঠিত উঁচু জায়গা আছে, খ. নদীর ধারের জায়গাগুলো নতুন পলিগঠিত, গ. উত্তরাংশ হিমালয়ের পাদদেশ বলে বেশ উঁচু।

৩. এখানকার প্রধান নদী গঙ্গা। এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার প্রধান ৫টি উপনদী হল—যমুনা, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা ও সারদা।

৪. জলবায়ু কিছুটা চরম প্রকৃতির। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য বেশি এবং বৃষ্টিপাত কম বিশেষত পশ্চিমাংশে।

৫. উত্তরের তরাই অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র অরণ্য প্রায় নেই বললে চলে।

৬. প্রায় সব জায়গায় পলিমাটি আছে। এর মধ্যে পুরনো পলিমাটির নাম ভাঙ্গর ও নতুন পলিমাটির নাম খাদর।

৭. গভীর অরণ্যের অভাবে বুনো জীবজন্তু কম।

৮. খনিজের মধ্যে এলাহাবাদের কাছে কাঁচ তৈরির উপযোগী কিছু সিলিকা পাওয়া যায়।

খ. অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ

১০. জলসেচের মোটামুটি ভাল ব্যবস্থা আছে। কূপ, নলকূপ ও খালের মাধ্যমে এখানকার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ কৃষি জমিতে জলসেচ করা হয়।

১১ উর্বর মাটি, অনুকূল জলবায়ু ও জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য এখানে কৃষিকাজ ভাল হয়। এখানকার প্রধান ফসল গম। এছাড়া ধান, আখ, তুলো, জোয়ার, বাজরা, যব, ডাল, তৈলবীজ, ছোলা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

১২. চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধিবাসীরা গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতি পালন করে।

১৩. উচ্চ গঙ্গা খাল এবং সারদা, যমুনা, রিহান্দ, রামগঙ্গা প্রভৃতি নদী

প্রকল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

১৪. কুটীর শিল্প অনেক আছে যেমন—তাঁত, কাঁচের চুড়ি, পিতল ও কাঁসার বাসন, গালিচা ইত্যাদি শিল্প। বড় শিল্পও আছে, যেমন—চিনি, কাপড়, খনিজ তেল পরিশোধন ইত্যাদি শিল্প।

১৫. এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত। দুটি রেলপথ ও অনেক পাকা রাস্তা আছে। জলপথও উল্লেখযোগ্য।

১৬. অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উচ্চ গঙ্গা সমভূমির লোকবসতি ঘন। দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনা নদীর জোয়ারে সবচেয়ে বেশি লোক থাকে। কানপুর এই সমভূমির প্রধান শহর।

প্রশ্ন

১. উচ্চ গঙ্গা সমভূমির জলসেচ ও কৃষিকাজ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২. উচ্চ গঙ্গা সমভূমিতে জলসেচের গুরুত্ব উল্লেখ করে এখানকার জলসেচ ব্যবস্থার পরিচয় দাও।

৩. সঠিক উত্তর দাও ঃ

ক. উচ্চ গঙ্গা সমভূমির প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান / গম / পাট।

খ. শীতকালে যেসব ফসল চাষ করা হয় তার নাম রবি / খারিফ / খাদ্যশস্য।

গ. উচ্চ গঙ্গা সমভূমি উত্তর-পূর্বে দক্ষিণ-পূর্বে / দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢালু।

ঘ. নদীর ধারের অপেক্ষাকৃত নতুন পলিগঠিত স্থানের নাম তরাই / খাদর / ভাঙ্গর।

৪. এককথায় উত্তর দাও ঃ

ক. গঙ্গা-যমুনা নদীর মাঝখানে সমভূমির নাম কি ?

খ. উচ্চ গঙ্গা সমভূমির প্রধান শিল্পটির নাম কি ?

গ. পুরনো পলিগঠিত উঁচু জায়গাগুলোর নাম কি ?

গ. ১০০ মিটার সমন্নোতি রেখা উচ্চ গঙ্গা সমভূমির কোন দিকের সীমানা ?

ঙ. উচ্চ গঙ্গা সমভূমির সবচেয়ে বড় শহরটির নাম কি ?

৫. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. গঙ্গা নদী থেকে কাটা দুটি সেচ খালের নাম — খাল ও — খাল।

খ. — খালের সাতটি জলপ্রপাতের মুখে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

গ. উচ্চ গঙ্গা সমভূমির একটি জাতীয় রাজপথের নাম —।

ঘ উত্তরাংশে হিমালয়ের পাদদেশের একফালি উঁচু ভূমির নাম —।

৬. কারণ দেখাও ঃ

ক. উচ্চ গঙ্গা সমভূমি চিনি শিল্পে উন্নত।

খ. উচ্চ গঙ্গা সমভূমি ভারতের অন্যতম কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল।

উচ্চ গঙ্গা সমভূমির জলসেচ সম্পর্কে এই পাঠে আলোচনা করেছি। মনে হচ্ছে জলসেচ সম্পর্কে আরও দু-চার কথা বললে এই অঞ্চলের কৃষির উন্নতির কারণ তোমরা আরও ভাল বুঝবে।

চটপট দেখে নাও ঃ উচ্চ গঙ্গা সমভূমির অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব কম বেশি। কারণ এখানকার শতকরা প্রায় ৭৫ জন অধিবাসী কোন না কোনভাবে কৃষির ওপর নির্ভর করে।

কৃষির জন্য চাই জল। অথচ বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ কম এবং তাতে অনিশ্চিত। তাই জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। মোট কৃষি জমির শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগে এই সেচ ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে সমভূমির পশ্চিমাংশে জলসেচ ব্যবস্থা বেশি কারণ ওদিকটায় বৃষ্টি খুব কম। কিভাবে জলসেচ করা হয় দেখ ঃ

ক. খাল ঃ নদী থেকে খাল কাটা হয়। সেই খালের শাখা, প্রশাখা ও নালা থাকে। এইভাবে সেচ খালের মাধ্যমে জমিতে জল সরবরাহ করা হয়। উচ্চ গঙ্গা সমভূতিতে পাঁচটি বিখ্যাত সেচখাল আছে —যমুনা নদী থেকে কাটা—১. পূর্ব **যমুনা খাল** ও ২. **আগ্রা খাল,** সারদা নদী থেকে কাটা—৩. **সারদা খাল,** গঙ্গা নদী থেকে কাটা—৪. **উচ্চগঙ্গা খাল** ও ৫. **নিম্ন গঙ্গা খাল।** হরিদ্বার থেকে আলিগড় পর্যন্ত উচ্চ গঙ্গা খালে ১৩টি কৃত্রিম জলপ্রপাত তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

খ. কূপ ও নলকূপ ঃ এখানে ভূগর্ভের জল মাটির নিচের অল্প গভীরতায় পাওয়া যায়। ঐ জল বিদ্যুৎ বা তৈল চালিত যন্ত্রের মাধ্যমে তুলে জমিতে সরবরাহ করা হয়। খালের তুলনায় এই কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে এখানকার বেশি জমিতে জলসেচ করা হয়। এই ধরনের কূপ ও নলকূপ বেশি আছে মোরাদাবাদ, কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি জেলায়।

গ. অন্যান্য ঃ এছাড়া সামান্য কিছু জমিতে জলাশয় থেকে জলসেচ করা হয়।

৭ম পাঠ

মধ্যগঙ্গা সমভূমি অঞ্চল

৭ম পাঠে মধ্যগঙ্গা সমভূমির প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। মনে রাখার সুবিধার জন্য এখন ঐ আলোচনাকে কতকগুলো ছোট ছোট পয়েন্টে ভাগ করে দিচ্ছি।

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ

১. মধ্যগঙ্গা সমভূমি বলতে গঙ্গা সমভূমির ঠিক মাঝখানের অংশটুকু বোঝায়।

২. উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ এবং বিহারের সমতল ভূমি নিয়ে এই অঞ্চলটি গঠিত। পলিগঠিত সমতলভূমি হলেও ভূ-প্রকৃতি বেশ বৈচিত্রপূর্ণ, যেমন ক. উত্তরাংশ হিমালয়ের পাদদেশ বলে উঁচু, খ. গঙ্গার কিছু জলাভূমি আছে, গ. দক্ষিণাংশ দাক্ষিণাত্য মালভূমির প্রান্ত বলে উঁচু, ঘ. নদীর ধারগুলোতে অনেক জায়গায় পলি পড়ে স্বাভাবিক বাঁধ তৈরি হয়েছে।

৩. গঙ্গা হল এখানকার প্রধান নদী। গঙ্গার অনেকগুলো উপনদী এই সমভূমির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, যেমন—গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, বুড়ী গন্ধক, কোশী, মহানন্দা, শোণ প্রভৃতি।

৪. উচ্চ গঙ্গা সমভূমির তুলনায় এখানকার জলবায়ু কিছুটা সর্মভাবাপন্ন এবং বৃষ্টি এখানে বেশি হয়।

৫. উত্তরাংশে তরাই অঞ্চলে সামান্য অরণ্য আছে। অন্যত্র অরণ্য নেই বললে চলে।

৬. সব জায়গাতেই প্রধানত পলিমাটি আছে। এর মধ্যে পুরনো 'ভাঙ্গর' ও নতুন 'খাদর' ছাড়া দণ্ডক নদীর ধারে চূর্ণ মেশানো 'ভাট' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭. ব্যাপক অরণ্যের অভাবে বুনো জীবজন্তু খুব থাকে।

৮. মূল্যবান খনিজ সম্পদ কিছু পাওয়া যায় না।

খ. অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ

৯. অনেক জমিতে খাল, কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে জলসেচ করা হয়।

১০. ধান প্রধান ফসল। এছাড়া গম, আখ, পাট, ছোলা, জোয়ার বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন আম, লিচু, কলা প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়।

১১. প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তির কিছু অংশ এখানকার জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পাওয়া যায়। বাকিটা অঞ্চলের

বাইরে থেকে তারের মাধ্যমে আনা হয়।

১২. কৃষি প্রধান অঞ্চল বলে এখানকার বেশিরভাগ শিল্প কৃষিভিত্তিক, যেমন—চিনি শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাট শিল্প, তামাক শিল্প প্রভৃতি। এই অঞ্চলের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সিমেন্ট, কাগজ, খনিজ তেল, শোধনাগার প্রভৃতি প্রধান।

১৩. এখানে অনেক রেলপথ ও পাকা রাস্তা আছে বলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। নদীপথেও পরিবহন করা হয়।

১৪. অনুকূল পরিবেশের জন্য ঘন লোকবসতি দেখা যায়। তবে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী খুব গরীব। বারাণসী, পাটনা, গোরক্ষপুর, ডালমিয়া নগর প্রভৃতি এই সমভূমির প্রধান শহর।

প্রশ্ন

১. ঠিক কিনা বল :

ক. মধ্যগঙ্গা সমভূমির প্রধান ফসল গম।

খ. মধ্যগঙ্গা সমভূমির এক বিশেষ সমস্যা হল—নদীর বন্যা।

গ. শোন নদীর দক্ষিণের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

ঘ. স্বাভাবিক বাঁধকে বলে তাল'।

ঙ. বারউনিতে খনিজ তেল শোধনাগার আছে।

২. শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. — নদীকে বলে বিহারের দুঃখ।

খ. গণ্ডক নদীর ধারের উর্বর পলিমাটির নাম —।

গ. এখানকার — ও — নদী দুটিতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

ঘ. — হল অন্যতম প্রধান শহর ও বিহারের রাজধানী।

ঙ. শিল্প শহর ডালমিয়া নগর — নদীর তীরে অবস্থিত।

৩. এককথায় বল :

ক. উত্তর-পূর্ব রেলপথের প্রধান সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ?

খ. মধ্যগঙ্গা সমভূমির প্রধান নদীটির নাম কি ?

গ. সাবাই ঘাস দিয়ে কি তৈরি হয় ?

ঘ. বারানসী শহর কোন্ নদীর ধারে অবস্থিত ?

৪. কারণ দেখাও :

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও মধ্যগঙ্গা সমভূমি অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত নয়।

খ পরিবেশের দিক থেকে বলা যায় মধ্যগঙ্গা সমভূমি প্রকৃতই একটি মধ্যবর্তী অঞ্চল।

গ. মধ্যগঙ্গা সমভূমির নদীগুলোতে প্রায়ই ভয়ঙ্কর বন্যা হয়।

ঘ. উচ্চগঙ্গা সমভূমির প্রধান ফসল গম, কিন্তু মধ্যগঙ্গা সমভূমির প্রধান ফসল ধান।

৮ম পাঠ

নিম্ন গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল

৮ম ও ৯ম পাঠে গঙ্গা সমভূমির তৃতীয় উপঅঞ্চল—নিম্ন গঙ্গা সমভূমির প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করেছি। মনে রাখার সুবিধার জন্য ঐ আলোচনাকে ছোট ছোট পয়েন্টে ভাগ করে দিচ্ছি—

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ :

১. নিম্ন গঙ্গা সমভূমি বলতে পশ্চিমবঙ্গের সমভূমিকে বোঝায়।

২. পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা এবং উত্তরে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্টাংশ নিম্ন গঙ্গা সমভূমির অন্তর্ভুক্ত।

৩. ভূ-প্রকৃতি সমতল হলেও কিছু বৈচিত্র্য আছে—এগুলো তোমায় মনে রাখতে হবে—

ক. উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের

ভূমিতে পাথর, নুড়ি ইত্যাদি জমা হয়ে বন জঙ্গলে ঢাকা তরাই অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে।

খ. কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলার বারিন্দ সমভূমির অনেকাংশ ঢেউ খেলানো। এখানে নতুন ও পুরন দু ধরনের পলিমাটি আছে।

গ. পূর্বে ভাগীরথী-হুগলী নদী ও পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি—এই দুয়ের মাঝখানে রাঢ় অঞ্চল। এই রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিমাংশে কতকগুলো উঁচু টিলা আছে।

ঘ. রাঢ় অঞ্চলের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বালি জমে জমে অনেক বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়েছে।

ঙ. পশ্চিমে ভাগীরথী-হুগলী নদী থেকে পূর্বে ভারত-বাঙলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা পর্যন্ত ব-দ্বীপ অঞ্চল। এই ব-দ্বীপের উত্তরাংশে ভূমি গঠনের কাজ অনেকদিন শেষ হয়েছে বলে নাম **মৃত ব-দ্বীপ**। মধ্যাংশে পলি পড়ে ভূমি এখনও পরিবর্তিত হচ্ছে তবে খুব সামান্য। তাই এই অংশের নাম **পরিণত ব-দ্বীপ**। দক্ষিণাংশের সুন্দরবন হল **সক্রিয় ব-দ্বীপ**। কারণ ওখানে এখনও পুরোদমে ব-দ্বীপ গঠনের কাজ চলছে।

৪. ক. নিম্ন গঙ্গা সমভূমির প্রধান নদী—গঙ্গা। ভাগীরথী নদী হল পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার প্রধান শাখা। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আরও কতকগুলো নদী আছে—

খ. উত্তরাংশে মহানন্দা, তিস্তা, তোরসা, জলঢাকা ইত্যাদি বরফ গলা জলে **পুষ্ট গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপনদী**।

গ. পশ্চিমাংশে ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ ইত্যাদি বর্ষার জলপুষ্ট **ভাগীরথীর উপনদী**।

ঘ. মৃত ব-দ্বীপ অঞ্চলের জলঙ্গী, **ভৈরব, মাথাভাঙ্গা**, ইছামতী, চূর্ণী ইত্যাদি **গঙ্গা বা পদ্মার উপনদী**।

ঙ. দক্ষিণাংশে সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্যাধরী, পিয়ালী, মাতলা, গোসাবা, সপ্তমুখী, রায়মঙ্গল ইত্যাদি **জোয়ারের জলপুষ্ট নদী**।

৫. উচ্চ ও মধ্য গঙ্গা সমভূমির তুলনায় জলবায়ু সমভাবাপন্ন। শীত ও গ্রীষ্মে তাপের তারতম্য খুব বেশি হয় না এবং বৃষ্টিও যথেষ্ট হয়।

৯ম পাঠ

নিম্ন গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল

৬. উত্তরে তরাই অঞ্চলে, দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে ও রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিমাংশে অরণ্য আছে। অন্যত্র চাষ-আবাদের জন্য অরণ্য বিশেষ নেই।

৭. মোটামুটি সব জায়গাতেই পলিমাটি আছে। তবে মাটির ধরন সর্বত্র এক নয়। যেমন তরাই অঞ্চলের মাটিতে পাথর মেশান রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিমাংশের মাটি কাঁকরপূর্ণ ও লাল এবং সুন্দরবনের মাটি লোনা।

৮. সুন্দরবন ও তরাই-এর বনে অনেক বুনো জীবজন্তু আছে, যেমন—বাঘ, হাতি, গণ্ডার, বানর, হরিণ প্রভৃতি।

খনিজ দ্রব্য খুব বেশি নেই। রাঢ় অঞ্চলের পশ্চিমাংশে রানীগঞ্জ-বরাকর অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজের মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ, তাপসহ মাটি (Fire clay), অভ্র ইত্যাদি খুব সামান্য উৎপন্ন হয়।

খ. অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ

৯. পরিমিত ও নিয়মিত বৃষ্টির অভাবে এখানকার কৃষিকাজে জলসেচের প্রয়োজন হয়। তবে সব জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা নেই। মোট কৃষিজমির

মাত্র ২৭ ভাগে জলসেচ করা হয়। দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে কিভাবে রাঢ় অঞ্চলের জেলাগুলোতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে নিচের চিত্রে দেখ—

যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

১৩. বিভিন্ন ধরনের শিল্পে-পূর্ণ দুটি শিল্পাঞ্চল আছে—

ক. হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল —এখানকার প্রধান শিল্পগুলো হল—

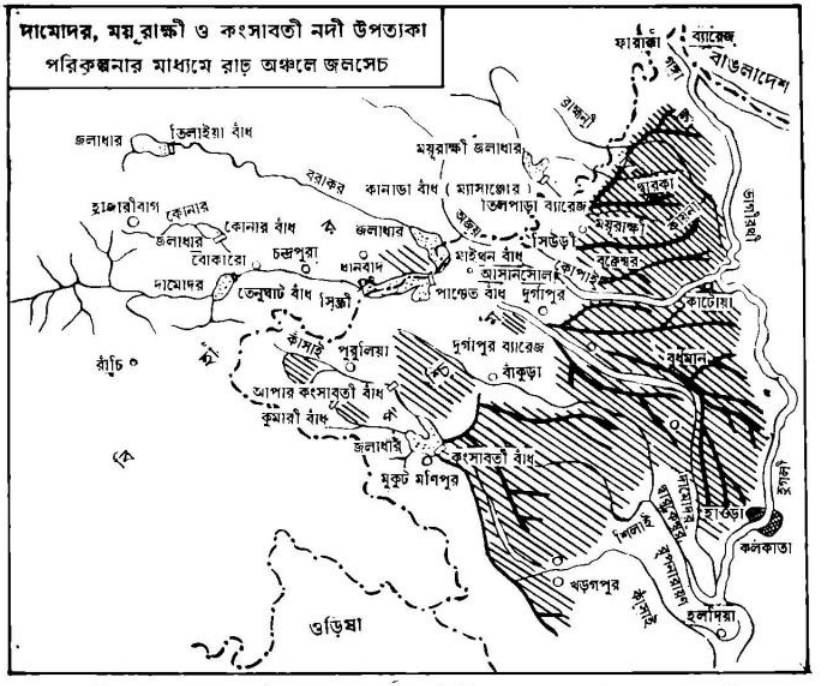

১০. নিম্ন গঙ্গা সমভূমির প্রধান কৃষিজ ফসল হল ধান, পাট ও চা। প্রায় সব জেলাতেই ধান উৎপন্ন হয়। পাট হয় পূর্বাংশের জেলাগুলোতে, আর চা উত্তরের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে। এছাড়া এখানে গম, ডাল, তৈলবীজ, তামাক, আখ, আলু, কমলালেবু, আনারস, পান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

১১. পশুপালন উন্নত নয়। গরু, ছাগল ও মহিষ প্রভৃতি পালন করা হয়।

১২. জলবিদ্যুৎ বিশেষ উৎপন্ন হয় না। তবে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের

পাট শিল্প, কাপড় শিল্প, কাগজ শিল্প, মোটরগাড়ি নির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, চামড়া শিল্প ইত্যাদি।

খ. আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল— প্রধান শিল্পগুলো হল—লৌহ, ইস্পাত রেল ইঞ্জিন নির্মাণ, বাইসাইকেল, টেলি-ফোনের যন্ত্রাংশ, কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প ইত্যাদি।

এদুটি শিল্পাঞ্চলের বাইরে আরও কিছু শিল্প এবং কয়েকটি ছোট শিল্পাঞ্চল আছে।

১৪. নিম্ন গঙ্গা সমভূমির যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত। পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত—এই তিনটি রেলপথ ছাড়াও এখানে অনেক পাকা ও কাঁচা রাস্তা আছে।

১৫. সমতল ভূ-প্রকৃতি, অনুকূল জলবায়ু জীবিকা নির্বাহের সুবিধা—ইত্যাদির জন্য এখানে প্রচুর লোক বাস করে। কলকাতা এই অঞ্চলের প্রধান শহর।

প্রশ্ন

১. নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতে জলসেচ প্রয়োজনীয় কেন? এই অঞ্চলের জলসেচ ব্যবস্থা ও কৃষিকার্যের পরিচয় দাও।

২. ঠিক কিনা বল ঃ

ক সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ নিম্ন গঙ্গা সমভূমির অন্তর্গত।

খ. জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলের নাম ডুয়ার্স।

গ. তিস্তা হল জোয়ারের জলে পুষ্ট নদী।

ঘ. আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের প্রধান শিল্প হল লৌহ, ইস্পাত শিল্প।

ঙ. উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সদর দপ্তর হল কলকাতা।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল — নদীর ধারে গড়ে উঠেছে।

খ. নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতে গড়ে — জন লোক বাস করে।

গ. — হল নিম্ন গঙ্গা সমভূমির প্রধান শহর।

ঘ. —, — ও — এই তিনটি নিম্ন গঙ্গা সমভূমির প্রধান কৃষিজ ফসল।

ঙ. —, — ও —এই তিনটি রেলপথ নিম্ন গঙ্গা সমভূমির ওপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে।

৪. দু'এক কথায় উত্তর দাও ঃ

ক. দুর্গাপুরকে ভারতের 'রূঢ়' বলা হয় কেন?

খ. তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে চা বেশি উৎপন্ন হয় কেন

গ. সুন্দরবনের মাটি লোনা কেন?

৫. কারণ দেখাও ঃ

ক. হুগলী নদীর দুই তীরে নানা ধরনের অনেক শিল্প আছে।

খ. নিম্ন গঙ্গা সমভূমির লোকবসতি ঘন।

গ. নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধান ও পাট উৎপন্ন হয়।

ঘ. নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতে মোট বৃষ্টির প্রায় ৮০ শতাংশ হয় বর্ষাকালে।

৯ম পাঠে নিম্ন গঙ্গা সমভূমির আলোচনার মধ্যে কলকাতা শহরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। এখন কলকাতা বন্দরের কথা আলাদা করে একটু বলে দিচ্ছি—

অবস্থান ঃ বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ১২৮ কিলোমিটার ভেতরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে কলকাতা বন্দর গড়ে উঠেছে। তাহলে এই বন্দরটি হল নদী বন্দর।

পোত বা জাহাজের আশ্রয়স্থলকে বলে পোতাশ্রয় (Harbours)। কলকাতা বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম।

গুরুত্ব ঃ কলকাতা হল পূর্ব ভারতের বৃহত্তম বন্দর। শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয় সমগ্র পূর্বাঞ্চলের কৃষির উন্নতি, শিল্পের বিকাশ বা এককথায় এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মানের উন্নতি নির্ভর করছে এই বন্দরের ওপর।

পশ্চাদভূমি ঃ পশ্চাদভূমি (Hinterland) কাকে বলে জান? দেখ তাহলে—বন্দরের মাধ্যমে যে অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হয় সেই

অঞ্চলকে ঐ বন্দরের পশ্চাদভূমি বলে। কলকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমি বিরাট, এর মধ্যে আছে বিহার, ওড়িষা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, মিজোরাম, মণিপুর, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশ এবং দুটি প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্র নেপাল ও ভূটান।

কলকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি দ্রব্য ঃ কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে যেসব জিনিস বিদেশ থেকে আনা হয় অর্থাৎ যাকে তোমরা আমদানি দ্রব্য বলবে, সেগুলো হল—খাদ্যদ্রব্য, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, যন্ত্রপাতি, সিমেণ্ট ইত্যাদি।

এই বন্দর দিয়ে যেসব জিনিস বিদেশে পাঠান হয় অর্থাৎ রপ্তানি দ্রব্যগুলো হল—পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের চা, পাট ও পাট-জাত দ্রব্য, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িষার বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য, যেমন—কয়লা, আকরিক লোহা, অভ্র ইত্যাদি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

সমস্যা ঃ তাহলে বুঝতে পারছ কলকাতা বন্দরের কত গুরুত্ব। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই বন্দরের সমস্যার যেন শেষ নেই—

১. ক্রমশ পলি পড়ে পড়ে হুগলী নদী ভীষণ মজে গেছে। সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য যেখানে কমপক্ষে ৯ মিটার গভীরতা দরকার সেখানে আছে মাত্র ৬.৫ মিটার। তাই ড্রেজার দিয়ে নদীর পলি মাঝে মাঝে কেটে গভীর করতে হয়। এতে খরচ বাড়ে।

২. হুগলী নদীর এই অগভীর অবস্থার জন্য জোয়ারের সময় এত উঁচু হয়ে বান আসে যে বন্দরের জেটিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. সমুদ্র থেকে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত নদীপথটুকু খুব আঁকাবাঁকা। কোন কোন জায়গায় বাঁকগুলো এত তীক্ষ্ণ বিশেষত ডায়মণ্ডহারবারের ওপর যে বড় বড় জাহাজগুলো কলকাতা বন্দরে আসতে পারে না।

৪ নদীর বুকে এত চড়া পড়েছে যে অচেনা সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে পথ চিনে আসা সম্ভব নয়। ওগুলো মোহানা পর্যন্ত এসে অপেক্ষা করে। ওখান থেকে পথ-প্রদর্শক জাহাজ (pilot ship) পথ দেখিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে। এতে খরচ ও সময়—দুই যায়।

এছাড়া বন্দরের জায়গার অভাব, পণ্য রাখার সমস্যা, শ্রমিক অসন্তোষ, পানীয় জলের অভাব, জাহাজ মেরামতি ও রং করার সমস্যা—এগুলো কিছু কিছু আছে। তবে সমস্যাগুলো খুব একটা জোরালো নয়। প্রথম চারটিই প্রকৃতপক্ষে কলকাতা বন্দরকে একেবারে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে।

সমাধান ঃ ১. আগেই বলেছি গঙ্গার বেশিরভাগ জল পদ্মায় চলে যায় বলে ভাগীরথী-হুগলী নদী ধীরে ধীরে পলিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ড্রেজার ও পথপ্রদর্শক জাহাজ দিয়ে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তাছাড়া এভাবে খরচ বেশি হয়, সময় নষ্ট হয়, বড় জাহাজ আসতে পারে না। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কায় গঙ্গা নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। যাতে গঙ্গার বেশি জল পদ্মায় যাবার আগে ভাগীরথীতে পাঠান যায়। বেশি জল এলে হুগলী নদী পলিমুক্ত হয়ে কলকাতা বন্দর রক্ষা পাবে।

২. এছাড়া কলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে (হুগলী ও হলদি নদী যেখানে মিলেছে) একটি আধুনিক বড় পরিপূরক বন্দর তৈরি করা হয়েছে। এই বন্দরে খনিজ তেল, কয়লা, লোহা ইত্যাদির জন্য জেটি, জাহাজঘাটা (**berth**) মার্শালিং ইয়ার্ড তৈরি করা

হয়েছে। যেসব জাহাজ কলকাতায় আসতে পারবে না, সেগুলো হলদিয়াতে পণ্যদ্রব্য নামিয়ে দেবে। এরপর ছোট ছোট জাহাজে ঐ সব পণ্য কলকাতায় আনা হবে।

১০ম পাঠ

মরুস্থলী বা মরু অঞ্চল

৯ম পাঠে নিম্ন গঙ্গা সমভূমির আলোচনা শেষ হয়েছে। ১০ম পাঠে তোমাদের পাঠ্যতালিকার তৃতীয় ভৌগোলিক অঞ্চল ভারতের মরু অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করেছি, এখন ঐ আলোচনাকে ছোট ছোট পয়েন্টে ভাগ করে দিলাম—

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ

১. রাজস্থান রাজ্যের পশ্চিমাংশের যে বিরাট জায়গা জুড়ে শুধু বালি আর বালি আছে—তার নাম মরুস্থলী বা মরু অঞ্চল।

২. আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে লুনী নদীর পশ্চিম তীর থেকে আরম্ভ করে পুরো পশ্চিম রাজস্থান অধিকার করে আছে এই মরুস্থলী।

৩. মরুস্থলীর জন্মের ব্যাপারে বলা যায় যে শেষ বরফের যুগ চলে যাবার সময় থেকে এই অঞ্চলটি ক্রমশ শুকন হয়ে যায়। ঐ শুষ্ক পরিবেশকে আরও তীব্র করেছে এখানকার বৃষ্টিহীন অবস্থা—সাগর থেকে আসা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুকে বাধা দেবার মত এখানে কোন পর্বত নেই। ফলে এখানে বৃষ্টি প্রায় হয় না বললে চলে।

৪. মরুস্থলীর পূর্বাংশ কিছুটা পাথুরে কিন্তু পশ্চিমাংশ সম্পূর্ণভাবে বালিময়। এই পশ্চিমাংশে বালি জমে জমে অনেক জায়গায় বালিয়াড়ি বা বালির ঢিবি তৈরি হয়েছে।

৫. সমগ্র অঞ্চলটি পশ্চিমে সিন্ধু নদীর দিকে ও দক্ষিণে কচ্ছের রণ অঞ্চলের দিকে ঢালু অর্থাৎ মরুস্থলী ঢাল দু'দিকে।

৬. ক. আরাবল্লী পর্বতের পূর্বের প্লাবনভূমির নাম রোহি, খ. এর পশ্চিমে লুনী নদীর উপত্যকা হল ঘাস ও কাঁটা গাছে পূর্ণ বাগর অঞ্চল, গ. এর পশ্চিমে পাথুরে ও বালিপূর্ণ মরুস্থলী।

৭. উল্লেখ করার মত নদী একটি আছে। নাম লুনী নদী। মরুস্থলীর পূর্ব সীমানা দিয়ে এই নদীটি বয়ে গেছে। তবে লুনী ছাড়া এখানে অনেক শুষ্ক অর্থাৎ জলহীন নদী আছে।

৮. মরুস্থলীর মাঝের নিচু জায়গা গুলোতে জল জমে কিছু লোনা জলের হ্রদ তৈরি হয়েছে, যেমন—পাচপদ্রা।

৯. মরুস্থলীর ধূ ধূ বালির মাঝে কিছু সবুজ গাছলতায় ভরা মরুদ্যান আছে।

১০. এখানকার জলবায়ু ভীষণ চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ যত গরম প্রায় তত ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টি না হওয়ার মধ্যে।

১১. জলের অভাবে এখানে ক্যাকটাস, বাবলা, খেজুর প্রভৃতি এই জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া বিশেষ কিছু জন্মে না।

১২. এখানে মাটি খুব সামান্য। যতটুকু মাটি আছে তাও বালি ও নুনে ভর্তি।

১৩. কিছু কিছু খনিজদ্রব্য বেশি পাওয়া যায় যেমন লিগনাইট কয়লা, সাজিমাটি, জিপসাম প্রভৃতি।

খ. অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ

১৪. জলের অভাবে চাষ আবাদ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে জলসেচের কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য জলসেচ প্রকল্প হল—রাজস্থান খাল।

১৫. শুষ্ক পরিবেশের উপযোগী ফসল এখানে উৎপন্ন হয়, যেমন বাজরা। জলসেচের ব্যবস্থা যেখানে আছে সেই সব জায়গায় গম, ছোলা, তুলা, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

১৬. মরুস্থলীর পূর্বাংশে যথেষ্ট

পশুপালন করা হয়, যেমন—উট, গরু, ছাগল, মেষ প্রভৃতি। মরুভূমির প্রায় সর্বত্র উট পালন করা হয়।

১৭. প্রতিকূল পরিবেশের জন্য এখানে শিল্প বিশেষ গড়ে ওঠেনি। নুন উৎপাদন, চিনি, বস্ত্র, পশম, কার্পেট ইত্যাদি এই ধরনের কয়েকটি ছোট শিল্প আছে।

১৮. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেনি। সামান্য কিছু রেলপথ ও পাকা-রাস্তা আছে।

১৯. বালিময় ভূ-প্রকৃতি, চরম জলবায়ু, জলের অভাব, জীবিকার অসুবিধা ইত্যাদি নানা কারণে মরুস্থলীর লোকবসতি ভীষণ কম। যারা এখানে থাকে তাদের মধ্যে অনেকে আবার যাযাবর।

প্রশ্ন

১. ঠিক কিনা বল ঃ

ক. রাজস্থানের পূর্বাংশের বালিপূর্ণ অঞ্চলের নাম—মরুস্থলী।

খ. আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমে লুনী নদী।

গ. দক্ষিণে কচ্ছের রণ অঞ্চল থেকে বাতাসের সঙ্গে বিপুল পরিমাণে বালি এসে এখানে জমেছে।

ঘ. ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জিপসাম এই মরুস্থলীতে পাওয়া যায়।

ঙ. মরুস্থলীর প্রধান কৃষিজ ফসল হল বাজরা।

২. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক. মরুস্থলীর — অঞ্চল গরুর দুধের জন্য বিখ্যাত।

খ. যোধপুর থেকে — পর্যন্ত রেলপথ আছে।

গ. গ্রামের গোল গোল বাড়িগুলোর নাম —।

ঘ. — হ্রদ থেকে প্রচুর নুন উৎপন্ন হয়।

ঙ. লুনী উপত্যকার তৃণভূমির নাম —।

৩. এককথায় বল ঃ

ক. কোন্ নদী থেকে রাজস্থান খাল কাটা হয়েছে ?

খ. অর্ধচন্দ্রাকৃতি বালিয়াড়িগুলোর নাম কি ?

গ. মরুস্থলী কোনদিকে ঢালু ?

ঘ. মরুস্থলীর পূর্বাংশে কোন পর্বতশ্রেণী আছে ?

ঙ. চলমান বালিয়াড়িকে মরুস্থলীর অধিবাসীরা কি বলে ?

৪. কারণ দেখাও ঃ

ক. মরুস্থলীর লোকবসতি ভীষণ কম।

খ. মরুস্থলীতে বৃষ্টি খুব সামান্য।

গ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলে।

ঘ. মরুস্থলীর কতকগুলো হ্রদে প্রচুর নুন উৎপন্ন হয়।

ঙ. মরুস্থলীতে অনেক শুকন নদী বা নালা আছে।

প্রয়োজনীয় কথা

১. লক্ষ্য রাখ ঃ পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে যে কোন অঞ্চলের একটি উপাদানের বিষয় জানতে চাইতে পারে। **উদাহরণ**—নিম্নগঙ্গা সমভূমির শিল্প বা হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য সম্পদ বা মরুস্থলীর খনিজ সম্পদ।

তাই বিভিন্ন অঞ্চল এমনভাবে পড়, যাতে অঞ্চলের উপাদানগুলো আলাদাভাবেও লেখা যায়।

২. ভুল হয় ঃ অনেক সময় দুটি অঞ্চলের একই ধরনের উপাদানগুলো গুলিয়ে যায়। উদাহরণ—উচ্চগঙ্গা সমভূমির কৃষিকাজ লিখতে গিয়ে মধ্যগঙ্গা সমভূমির কৃষিকাজ লিখে ফেল, বা পূর্ব হিমালয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় পশ্চিম হিমালয় লেখ, বা মধ্যগঙ্গা সমভূমি আলোচনায় নিম্ন ও উচ্চগঙ্গা সমভূমির কথা লিখে দাও।

কারণ কি ঃ পড়ছ—উচ্চগঙ্গা সমভূমির প্রধান ফসল গম এবং মধ্যগঙ্গা সমভূমির প্রধান ফসল ধান। ভাবছ—'গোলে না মেরে সুরজিত যদি বলটা মাইনাস করত, ওঃ তালে', বা 'পুজোর জামাটা এক রঙা নয়, এবার প্রিন্টেড চাই' —তাহলে ভুল ত হবেই।

সমাধান কি ঃ ভাল ভাবে বুঝে বুঝে পড়। পড়বার সময় মন দিয়ে জায়গা ও বৈশিষ্ট্যগুলো চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নাও এবং পড়া হয়ে গেলে একবার লিখে ফেল। এবার দেখ, কানের কাছে ঢাক বাজলেও লিখতে গিয়ে আর ভুল হচ্ছে না।

৩. আবার বলছি ঃ ভূগোলের উত্তরের মধ্যে মানচিত্র, রেখাচিত্র বা অন্য ধরনের চিত্র (Map, Rough Sketch, Diagram ইত্যাদি) অবশ্যই আঁকবে।

প্রথমে পেন্সিল দিয়ে বাড়িতে চিত্র আঁকা অভ্যাস কর। শিখে গেলে অর্থাৎ যখন দেখছ ভুল আর বেশি হচ্ছে না—রঙ পেন্সিল বা Sketch pen দিয়ে আঁকতে পার।

গৌতম মল্লিক

কথার কথা

ম্যাগাজিন কথাটা ইংরাজি তাই না ? কিন্তু এটা এখন প্রায় বাঙলাই হয়ে গেছে। এর অর্থ সাময়িক পত্র পত্রিকা। আবার এটা যে খাঁটি ইংরাজি শব্দ তাও কিন্তু নয়। এটা এসেছে আরবী একটা শব্দ মাখজান থেকে। মাখজান মানে কি ছিল ? মাখজান মানে ছিল শস্য ইত্যাদি রাখবার জন্য একাধিক গুদাম ঘর ! ইংল্যাণ্ডে পত্রিকা হিসেবে ম্যাগাজিন কথাটা ব্যবহার হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। আবার ম্যাগাজিনের অন্য একটি অর্থও আছে—তাহল অস্ত্রশস্ত্র রাখার গুদাম ঘর। ফরাসী ভাষায় ম্যাগাজিনের বানান magasin—ঐ ভাষায় এর অর্থ হল বড় দোকান। যেখানে সবকিছুই প্রায় পাওয়া যায়। ইংরাজিতে যাকে বলে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। আবার আরবী কথা মাখজানের সঙ্গে খাজনা কথাটারও খুব মিল, সেটারও কারণ হল খাজনা মানে দেয় কর। তা নগদে না হলেও অনেকে শস্য দিয়েও মেটায়। সেই খাজনা যেখানে রাখা হত তার নাম খাজনাখানা। আরবীতে খাজনার দ্বিবচনই হল মাখজান ! তাহলে কেমন কত দেশ ঘুরে ঘুরে পরিবর্তিত হয়েছে কথাটা !

ডাক্তার ও রোগী

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কাজের মধ্যেও দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ বিনাদর্শনীতে দরিদ্র রুগী দেখতেন। সে সময়ের তরুণ লেখক নিঃস্ব শিবরাম চক্রবর্তী একদিন তাঁর কাছে এলেন। পেটের নানা উপসর্গ, তা সারছেও না, ইত্যাদি।

ডাক্তার রায় রুগীকে ভাল করে দেখেশুনে বললেন, 'তোমার রোগ আমি ধরতে পেরেছি।' ড্রয়ার খুলে গোটা কয়েক দশ টাকার নোট বের করে শিবরামের হাতে দিয়ে বললেন, 'দু'বেলা পেট ভরে খাবে।'

ভৌতবিজ্ঞান

পদার্থবিদ্যা

পুনরনুশীলন

আসন্ন ষান্মাসিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত সংখ্যায় যে সব প্রশ্নগুলো দিয়েছিলাম আশা করি সেগুলোর উত্তর খুঁজে বার করতে এবং তৈরি করতে তোমাদের অসুবিধা হয়নি। বর্তমান সংখ্যায় আরও কিছু প্রশ্ন দিচ্ছি। প্রশ্নের উত্তর কোনখানে পাবে তাও আগেরবারের মতই প্রশ্নের শেষে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া থাকছে।

সরল যন্ত্র

1. যন্ত্র কাকে বলে, সংজ্ঞা দাও। [9/77/I]

2. যন্ত্র কার্যকে কী কী ভাবে সহজতর করে থাকে ? [9/77/I]

(সংকেত : 1. অল্প বলের সাহায্যে বেশি বাধা অতিক্রমের ব্যবস্থা করে। 2. বলের অভিমুখ সুবিধামত দিকে বদলিয়ে। 3. বলের প্রয়োগ বিন্দুর স্থানান্তরণ ঘটিয়ে এবং 4. আবর্তন গতিকে রৈখিক গতিতে কিংবা রৈখিক গতিকে আবর্তন গতিতে রূপান্তরিত করে।)

3. যন্ত্রের ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত বাধা (বা বোঝা) এবং প্রযুক্ত বল (বা চেষ্টা) বলতে কী বোঝায় ? [9/78/I]

4. যান্ত্রিক সুবিধার সংজ্ঞা দাও। [9/78/I]

(সংকেত : যান্ত্রিক সুবিধা = অতিক্রান্ত বাধা এবং প্রযুক্ত বলের অনুপাত।)

5. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধার মান কী রকম হয় ? [9/78/II]

(সংকেত : অধিকাংশ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধা >1। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 1 হয়ে থাকে। যেমন, ঢেঁকির ক্ষেত্রে, মানুষের হাতের ক্ষেত্রে, দাঁড়ি পাল্লার ক্ষেত্রে = 1)

6. নততল কাকে বলে ? নততলের ক্ষেত্রে কী রকম যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় ? [9/79/I]

7. কুয়োর চরকি কল (pulley) কার্যকে কী ভাবে সহজতর করে ? [9/81/I]

(সংকেত : কোনও যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। বাধার সমপরিমাণ চেষ্টা প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু চরকি কল ঊর্ধ্বমুখী বলের পরিবর্তে নিম্নমুখী বল প্রয়োগের সুবিধা করে দেয়। ফলে ঝুঁকে জল তুলতে হয় না, সোজা দাঁড়িয়ে জল তোলা যায়। এবং দেহের ওজনটাকেও কাজে লাগান যায়।)

8. লিভারের (Lever) সংজ্ঞা দাও। [9/81 II]

9. লিভারের আলম্ব বিন্দু, বাধা বাহু (বা বোঝা বাহু) এবং চেষ্টা বাহু (বা বল বাহু) বলতে কী বোঝায় নকশার (diagram) সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [9/82/I]

10. লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা নির্ণয় করার সমীকরণটি লেখ। [9/82/I]

(সংকেত : যান্ত্রিক সুবিধা = অতিক্রান্ত বাধা / প্রযুক্ত বল লিভারের ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত বাধা / প্রযুক্ত বল = চেষ্টা বাহু / বোঝা বাহু

11. প্রথম শ্রেণীর লিভার কাকে বলে একটি নকশা এঁকে বোঝাও। তোমার নকশা অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা কত হবে, লেখ। [9/82/II]

12. প্রথম শ্রেণীর লিভারের ক্ষেত্রে কখন যান্ত্রিক সুবিধা >1 হয়, কখন $=1$ এবং কখনই বা <1 হয়, লেখ। [9/83/I]

(সংকেত : যান্ত্রিক সুবিধা $=\frac{\text{চেষ্টা বাহু}}{\text{বোঝা বাহু}}$। অতএব চেষ্টা বাহু > বোঝা বাহু হলে যান্ত্রিক সুবিধা >1 হবে। চেষ্টা বাহু = বোঝা বাহু হলে যান্ত্রিক সুবিধা $=1$ হবে। চেষ্টা বাহু < বোঝা বাহু হলে যান্ত্রিক সুবিধা <1 হবে। যান্ত্রিক সুবিধা টিউবকলের হাতলের ক্ষেত্রে >1, দাঁড়িপাল্লার ক্ষেত্রে $=1$, ঢেঁকির ক্ষেত্রে <1)

13. দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার কাকে বলে একটি নকশা এঁকে বোঝাও। তোমার নকশা অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা কত হবে, লেখ। [9/84/II]

14. দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধা সব সময়েই 1 অপেক্ষা বেশি হয় কেন ? [9/84/II]

(সংকেত : যেহেতু চেষ্টা বাহু সর্বদাই > বোঝা বাহু)

15. তৃতীয় শ্রেণীর লিভার কাকে বলে, একটি নকশার সাহায্যে বোঝাও। তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা, তোমার নকশা অনুযায়ী কত হবে, লেখ। [9/85/I]

16. কোনটি কোন শ্রেণীর লিভার লেখ।

i. টিউব কলের হাতল
ii. মানুষের হাত
iii. ঢেঁকি
iv. জাঁতি
v. কাঁচি
vi. নৌকার দাঁড়
vii. চিমটে
viii. সাঁড়াশী
ix. দাঁড়িপাল্লা
x. শাবল

(সংকেত : আলম্ব। চেষ্টা ও বোঝার আপেক্ষিক অবস্থান বিচার করে বলতে হবে। ধরি—আলম্ব F, চেষ্টা P, বোঝা W। W(F)P হলে ১ম শ্রেণীর লিভার। P(W)F হলে ২য় শ্রেণীর। W(P)F হলে ৩য় শ্রেণীর।)

তাপ

1. উষ্ণতা বা তাপমাত্রার সংজ্ঞা দাও। [এই সংখ্যায় দেখ]

2. উষ্ণতার সঙ্গে জলের তলের তুলনা করা হয় কেন ? [এই সংখ্যায় দেখ]

(সংকেত : জল উচ্চতর তল থেকে নিম্নতর তলের দিকে যায়। তাপও উচ্চতর উষ্ণতা থেকে নিম্নতর উষ্ণতার দিকে যায়।)

3. 'তাপকে যদি কারণ বলা হয় তবে উষ্ণতা হল তার ফল' ব্যাখ্যা কর। [এই সংখ্যায় দেখ]

(সংকেত : বস্তুতে তাপ দিলে তার উষ্ণতা বাড়ে। বস্তু থেকে তাপ নিলে বস্তুটির উষ্ণতা কমে।)

4. উষ্ণতা ও তাপের তুলনা কর। [এই সংখ্যায় দেখ]

5. থার্মোমিটার দিয়ে কিসের পরিমাপ করা হয়—তাপের, না উষ্ণতার ? [এই সংখ্যায় দেখ]

6. উষ্ণতা পরিমাপে ব্যবহৃত প্রধান দুটি স্কেল কী কী ? [এই সংখ্যায় দেখ]

7. সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলে নিম্নস্থিরাংক ও ঊর্ধ্বস্থিরাংকগুলোর মান

লেখ। [এই সংখ্যায় দেখ]

(সংকেত : সেলসিয়াস স্কেলে যথাক্রমে O° এবং 100°। ফারেনহাইট স্কেলে যথাক্রমে 32° এবং 212°।)

8. সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল দুটির মধ্যে সম্পর্কসূচক সমীকরণটি লেখ। [এই সংখ্যায় দেখ]

(সংকেত : $\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$)

9. কোনও বস্তুর দ্বারা গৃহীত বা বর্জিত তাপ কোন কোন বিষয়ের উপর কীভাবে নির্ভরশীল ? [10/86/1 এবং 10/91/উপর দিকে]

(সংকেত :

i. গৃহীত বা বর্জিত তাপ বস্তুটির উষ্ণতা বৃদ্ধি ও হ্রাস।

ii. গৃহীত বা বর্জিত তাপ বস্তুটির ভর।

iii. গৃহীত বা বর্জিত তাপ বস্তুটির তাপধারণ ক্ষমতা

$H = m.s.t.$

যেখানে H = গৃহীত বা বর্জিত তাপ

m = বস্তুর ভর

s = বস্তুর আপেক্ষিক তাপ

t = বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস)

10. C. G. S. পদ্ধতিতে তাপের এককটির নাম ও সংজ্ঞা দাও।

[10/88/I]

11. F. P. S. পদ্ধতিতে তাপের এককটির নাম ও সংজ্ঞা দাও।

[10/88/II]

12. কোনও পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলতে কী বোঝ ? [10/89/I এবং 10/90/I]

(সংকেত : দু রকমভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। [10/89/I] এ যে সংজ্ঞা আছে তদনুযায়ী আপেক্ষিক তাপ একটি অনুপাত-এর কোনও একক নেই। [10/90/I] এ যে সংজ্ঞা আছে তদনুযায়ী আপেক্ষিক তাপের একক C. G. S. পদ্ধতিতে ক্যালরি প্রতি গ্রাম এবং F. P. S. পদ্ধতিতে B. Th. u. প্রতি পাউণ্ড।)

13. তামার আপেক্ষিক তাপ ·09 বলতে কী বোঝ ? [10/89/I]

(সংকেত : উত্তর তিনভাবে দেওয়া যায়—

i. m ভর বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা t° বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ লাগে সমভর বিশুদ্ধ তামার সমপরিমাণ উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে তার ·09 গুণ তাপ লাগবে।

কিংবা ii. 1 গ্রাম তামার উষ্ণতা 1°C বৃদ্ধি করতে ·09 ক্যালরি তাপ লাগবে।

কিংবা iii. 1 পাউণ্ড তামার উষ্ণতা 1°F বৃদ্ধি করতে ·09 B.Th.u. তাপ লাগবে।)

14. তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক কাকে বলে ? তুল্যাংকটির মান কত ?

[10/92/I]

(সংকেত : C. G. S. পদ্ধতিতে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক 'J'-এর মান $= 4.18 \times 10^7$ আর্গ প্রতি ক্যালরি বা 4.18 জুল প্রতি ক্যালরি।)

পদার্থের ধর্ম

1. পদার্থের ভৌত ধর্ম বলতে কী বোঝ ? [5/103/II]

(সংকেত : ভৌত ধর্ম বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য।)

2. কোন কোন বিষয়গুলো ভৌত ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ? [5/103/II]

(সংকেত : পদার্থের অবস্থা, স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, দ্রাব্যতা, তড়িৎ পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা ইত্যাদি।)

3. পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের সংজ্ঞা

দাও। [5/104/I]

4. পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার আলোচনায় সাধারণত কোন কোন বিষয়-গুলো বিবেচিত হয় ? [5/104/I]

(সংকেত : পদার্থের দাহ্যতা, পদার্থের ওপর তাপের প্রভাব, পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিড, ক্ষার, জল, বায়ু এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া ইত্যাদি।)

5. নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে কোনটি কী পদার্থ তা তাদের ভৌত ধর্মের সাহায্যে কীভাবে সনাক্ত করবে ?

i. বালি, চিনি, গন্ধক

ii. জল, স্পিরিট এবং কেরোসিন তেল

iii. গন্ধকচূর্ণ, তুঁতেচূর্ণ এবং ময়দা

iv. NH_3 গ্যাস, H_2S গ্যাস এবং O_2 গ্যাস।

(সংকেত : i. দ্রাব্যতার সাহায্যে। চিনি জলে দ্রাব্য, বালি অদ্রাব্য, গন্ধক -- CS_2-তে দ্রাব্য।

ii গন্ধের সাহায্যে।

iii. বর্ণের সাহায্যে।

iv. গন্ধের সাহায্যে। NH_3-এর গন্ধ ঝাঁঝাল H_2S-এর গন্ধ পচা ডিমের মত, O_2 গন্ধহীন।)

6. ভৌত পরিবর্তন কাকে বলে ? [6/92/II]

7. রাসায়নিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা দাও। [6/92/II]

8. ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা কর। [6/93/সারণি]

9. কোনটি ভৌত পরিবর্তন কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন তা যুক্তিসহ বল।

i. জল জমে বরফ হল।

ii. লোহাতে মরিচা পড়ল।

iii. লোহাকে চুম্বকে পরিণত করা হল।

iv. মোমবাতি পোড়ানো হল।

v. মোমকে তাপ প্রয়োগে তরল করা হল।

vi. CO_2 চালনা করে স্বচ্ছ চুনের জলকে ঘোলাটে করা হল।

vii. CO_2 গ্যাসকে শুষ্ক বরফে পরিণত করা হল।

[6/93/I]

(সংকেত : এই ধরনের বহু প্রশ্ন হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দেখতে হবে পরিবর্তনের ফলে নতুন রাসায়নিক ধর্মবিশিষ্ট কোনও সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। হলে পরিবর্তনটি রাসায়নিক, না হলে পরিবর্তনটি ভৌত।)

10. তাপমোচী ও তাপশোষী পরিবর্তন বলতে কী বোঝ ? [6/95 II]

11. একটি করে তাপমোচী ও তাপশোষী রাসায়নিক পরিবর্তনের এবং একটি করে তাপমোচী ও তাপশোষী ভৌত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দাও। [6/96/I]

(সংকেত : A. রাসায়নিক পরিবর্তন। তাপমোচী—কার্বনের দহনের ফলে CO_2 উৎপন্ন হল। তাপশোষী—H_2 এবং I_2 যুক্ত হয়ে HI গঠন করল।

B. ভৌত পরিবর্তন। তাপমোচী—চাপ প্রয়োগে গ্যাসের সংকোচন ঘটান হল। তাপশোষী—NH_4Cl-কে জলে দ্রবীভূত করা হল।)

12. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংজ্ঞা দাও। [7/97/II]

13. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সহায়ক কারণগুলোর উল্লেখ করে প্রত্যেকটির একটি করে দৃষ্টান্ত দাও। [7/98/II]

14. অনুঘটক কাকে বলে ? অনুঘটকের দুটি দৃষ্টান্ত দাও। [7/100/II]

15. মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলতে কী বোঝ ? [8/76/II]

16 যৌগিক পদার্থ বা যৌগের সংজ্ঞা দাও। [8/77/I]

17. মৌল ও যৌগের তুলনা কর। [9/86/I]

18. পরমাণু ও অণুর সংজ্ঞা দাও। [8/77/II]

19. মৌলিক অণু ও যৌগিক অণুর মধ্যে পার্থক্য কী? [8/77/II]

(সংকেত ঃ মৌলিক অণু একটি মৌলেরই এক বা একাধিক পরমাণু নিয়ে গঠিত। যেমন—Fe, Cl_2, O_2। যৌগিক অণু একাধিক বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সংযোগে গঠিত। যেমন, H_2SO_4।)

20. কিসের সংক্ষিপ্ত প্রকাশের জন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হয়? [8/80/I]

(সংকেত ঃ মৌলের নামের এবং মৌলের একটি পরমাণুর।)

21. চিহ্নের বিভিন্ন তাৎপর্যগুলো লেখ। [10/93/II]

22. আণবিক সংকেত কাকে বলে? [8/81/I]

23. আণবিক সংকেতের বিভিন্ন তাৎপর্যগুলো কী কী? [10/95/I]

(প্রশ্নপত্রে কতকগুলো চিহ্ন দিয়ে মৌলগুলোর নাম লিখতে বা মৌলগুলোর নাম দিয়ে তাদের চিহ্ন লিখতে বলা হতে পারে। আণবিক সংকেত সম্পর্কেও অনুরূপ প্রশ্ন করা হতে পারে। নবম দশমের অষ্টম সংখ্যার 79-81 পৃষ্ঠায় এবং দশম সংখ্যার 94-96 পৃষ্ঠায় বেশ কিছু মৌল ও যৌগের চিহ্ন ও সংকেত দেওয়া আছে। এগুলো ভাল ভাবে জেনে রাখ।)

24. যোজ্যতার সংজ্ঞা দাও। [8/81/II]

25. মিশ্র পদার্থ বা মিশ্রণ বলতে কী বোঝায়? সমসত্ত্ব মিশ্রণ ও অসমসত্ত্ব মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য কী? [9/87/II]

26. যৌগিক পদার্থ ও মিশ্র পদার্থের তুলনা কর। [9 88/সারণি]

27. ধাতু ও অধাতুর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসমূহের তুলনা কর। [9 89/সারণি]

(সংকেত ঃ আমরা 8টি ভৌত ধর্ম এবং 4টি রাসায়নিক ধর্ম এই মোট 12টি ধর্ম নিয়ে তুলনা করেছি। তোমরা প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত marks অনুযায়ী লিখবে। 3 বা 4 marks-এর জন্য পাঁচ-ছটি points-ই যথেষ্ট।)

28. ধাতুকল্প কাকে বলে। দুটি ধাতুকল্পের নামোল্লেখ কর। [9/90/I]

---

১ মে '৮২ সংখ্যায় আমরা পড়েছিলাম 'যন্ত্র ও বলের বিভিন্ন ক্রিয়া'। তারপরই আমাদের পড়া উচিত ছিল 'তাপ' অধ্যায়টি। কিন্তু অনবধানতাবশত ১৬ মে সংখ্যায় 'তাপ' অধ্যায়টি আলোচনা না করেই আমরা শুরু করে দিয়েছিলাম 'তাপের পরিমাণ ও তার পরিমাপ' অধ্যায়টি। এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। এই সংখ্যায় আমরা বাদ পড়ে যাওয়া 'তাপ' অধ্যায়টি আলোচনা করলাম।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি কেমন করে আমাদের এই বিশ্বপ্রকৃতিতে জড়-পদার্থকে অবলম্বন করে শক্তির বহু বিচিত্র লীলা চলছে। আমরা দেখেছি শক্তি মূলত এক হলেও প্রকাশভেদে শক্তি আট প্রকারের হতে পারে। যথা—যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি, তড়িৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, চৌম্বক শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি।

যান্ত্রিক শক্তি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। নবম শ্রেণীতে তোমাদের আরও দু প্রকার শক্তি—তাপ শক্তি এবং আলোক শক্তি সম্বন্ধে জানতে

হবে।

বর্তমান পাঠে আমরা তাপ শক্তি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করছি।

তাপ যে জড় পদার্থ নয়, এক প্রকার শক্তি এ কথা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। সে যুগের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল তাপ এক প্রকার জড় পদার্থ যার নাম দিয়েছিলেন তাঁরা ক্যালরিক (Caloric)। যে বস্তুতে ক্যালরিক বেশি সে বস্তু গরম, যে বস্তুতে ক্যালরিক কম সে বস্তু ঠাণ্ডা। গরম বস্তুতে ক্যালরিক বেশি তাই সে ক্যালরিক দান করে, ঠাণ্ডা বস্তুতে ক্যালরিক কম তাই সে ক্যালরিক গ্রহণ করে। কিন্তু ক্যালরিক পদার্থটিকে ত কই চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীরা বললেন এই ক্যালরিক পদার্থটি হল বায়ুর মতই অদৃশ্য এক পদার্থ। কিন্তু ক্যালরির যদি পদার্থই হবে তাহলে ত তার ভর থাকবে। সুতরাং ক্যালরিক বর্জন-গ্রহণের ফলে বস্তুর ভরের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ার কথা। কিন্তু কই তেমনটা ত হতে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা বললেন এই ক্যালরিক হচ্ছে এমনই এক সূক্ষ্ম পদার্থ যার কোন ভর নেই। কিন্তু এত করেও বিজ্ঞানীরা তাঁদের ক্যালরিক নামক এই উদ্ভট পদার্থটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। পদার্থটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় ক্রমশই বাড়তে লাগল। তুমি তোমার দুই করতলে ঘষাঘষি করলে। দুটি করতলই গরম হয়ে উঠল। করতল দুটিতে নিশ্চয়ই ক্যালরিক প্রবেশ করল। কিন্তু এই ক্যালরিক এল কোথা থেকে; আশেপাশের বায়ু থেকে কিন্তু তাহলে ত ক্যালরিক বর্জন করার দরুন ঐ বায়ু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা ত কই হয়নি? কামানের নল তৈরি করবার সময় তুরপুন (drilling machine) দিয়ে ধাতুখণ্ডে ছিদ্র (bore) করতে হয়। বিজ্ঞানী রামফোর্ড (Rumford) লক্ষ্য করলেন drill করবার সময় কামানের নল এবং উৎপন্ন ধাতুচূর্ণ দুই-ই বেশ তেতে ওঠে এমন কি আশপাশের বায়ুও বেশ গরম হয়ে ওঠে। তাহলে প্রয়োজনীয় ক্যালরিক আসছে কোথা থেকে? রামফোর্ড ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন প্রকৃতপক্ষে ক্যালরিক বলে কোনও পদার্থই নেই। তাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি। তুরপুন চালাতে যে যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করা হচ্ছে সেই শক্তিই কামানের নলে, ধাতুচূর্ণে ও চারপাশের বায়ুতে তাপশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

ক্যালরিক মতবাদের ওপর চরম আঘাতটি হানলেন স্যার হ্যামফ্রে ডেভী (Sir Humphrey Davey)। বায়ুশূন্য একটি আধারের মধ্যে দুখণ্ড বরফে ঘর্ষণ ঘটিয়ে তিনি তাদের জলে পরিণত করলেন। বরফ খণ্ড দুটির উষ্ণতা ছিল 29°F। আমরা জানি বরফের গলনাংক হচ্ছে 32°F। সুতরাং বরফ খণ্ড দুটির গলনের জন্য নিশ্চয়ই তাপের প্রয়োজন হয়েছে। আশেপাশে বায়ু বা অন্য কোনও জড়পদার্থ নেই, সুতরাং সেখান থেকে তাপ আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। ডেভী বললেন ঘর্ষণের ফলে বরফ খণ্ড দুটির অণুগুলোর মধ্যে গতীয় শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। অণুগুলোর এই গতীয় শক্তিই তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বরফের গলন সম্ভব করেছে।

বর্তমান গতীয় তত্ত্ব (Kinetic Theory) অনুযায়ী পদার্থের অণুগুলো কখনও স্থির বা স্থানু অবস্থায় থাকে না। তারা সর্বদাই গতিশীল। **কোনও বস্তুর অণুগুলোর এই গতীয় শক্তির মোট পরিমাণই হল বস্তুটির অন্ত-**

নিহিত তাপশক্তি। কোনও বস্তুর অণুগুলো যত বেশি গতিশীল হবে, বস্তুটিতে তাপের পরিমাণও তত বেশি হবে এবং বস্তুটি তত বেশি গরম হবে। পক্ষান্তরে কোনও বস্তুর অণুগুলো যত কম গতিশীল হবে বস্তুটিতে তাপের পরিমাণ তত কম হবে। এবং বস্তুটি তত ঠাণ্ডা হবে। সাধারণত কোনও বস্তুর অণুগুলো কখনও সম্পূর্ণ নিশ্চল বা স্থানু হয় না। বরফের মত ঠাণ্ডা বস্তুর অণুগুলোতেও কিছু না কিছু পরিমাণ গতীয় শক্তি আছেই। সুতরাং কোনও বস্তু তা সে বরফের মত কিংবা তার চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা হোক না কেন, তাতে কিছু না কিছু তাপ থাকছেই।

অবশ্য দশম শ্রেণীতে গিয়ে তোমরা দেখবে যে বস্তুর **উষ্ণতা 0°C থেকেও 273° নিচে অর্থাৎ −273°C-তে নামাতে পারলে তার অণুগুলো সম্পূর্ণ গতিহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং −273°C উষ্ণতায় বস্তুতে একেবারেই কোনও তাপ থাকে না।**

তাপ যে এক প্রকার শক্তি, কোনও জড় পদার্থ নয়—এ তথ্যের সমর্থনে অন্য যুক্তিও আছে। আমরা জানি শক্তির বিকাশ নেই—এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় মাত্র। কয়লার দহনের ফলে উৎপন্ন তাপ ইঞ্জিনের গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এক খণ্ড লোহাকে তাপ দিলে সেটি ক্রমশ তেতে প্রথমে লাল (red hot) ও পরে সাদা (white hot) হয়। এখানে তাপ রূপান্তরিত হচ্ছে আলোকশক্তিতে। বিপরীত ক্রমে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। কয়লার দহনে কয়লার অন্তর্গত রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে তাপে। এই ধরনের ঘটনাবলী থেকে কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে যান্ত্রিক শক্তি, আলোক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও অন্যান্য শক্তিগুলোর মতই তাপও এক প্রকার শক্তি।

প্রশ্ন

1. ক্যালরিক মতবাদ অনুসারে কোনও বস্তু গরম বা ঠাণ্ডা হয় কী কারণে?
2. অন্য সব পদার্থের সঙ্গে প্রাচীন বিজ্ঞানীদের কল্পিত ক্যালরিক নামক পদার্থটির কী কী পার্থক্য ছিল?
3. তাঁরা তাঁদের ক্যালরিক মতবাদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন কী জন্য?
4. বর্তমানের গতীয় তত্ত্ব অনুসারে তাপের কী রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়?
5. বরফের মত ঠাণ্ডা বস্তুতেও তাপ শক্তি থাকে কিনা যুক্তিসহ বল।
6. বস্তু কখনও সম্পূর্ণ তাপহীন হতে পারে কি? পারলে কোন অবস্থায় পারে?
7. তাপ যে জড় পদার্থ নয়, এক প্রকার শক্তি—এই তথ্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

একটা পাত্রে কিছুটা জল নিয়ে তাতে তাপ প্রয়োগ করতে থাক। দেখবে প্রযুক্ত তাপের পরিমাণ যত বাড়তে থাকছে জলটা তত বেশি গরম হয়ে উঠছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে **তাপ গ্রহণ করলে বস্তু গরম হয়।** এবং বিপরীত ক্রমে **তাপ বর্জন করলে বস্তু ঠাণ্ডা হয়।**

A এবং B দুটি হুবহু এক রকমের পাত্র নাও। A পাত্রে অল্প কিছুটা এবং B পাত্রে বেশ খানিকটা জল নাও। জলশুদ্ধ পাত্র দুটিতে একই সাথে একই সময়ের জন্য তাপ প্রয়োগ কর। পাত্র দুটিতে প্রযুক্ত তাপের পরিমাণ নিশ্চয়ই সমান। কিন্তু আঙুল ডুবিয়ে দেখ A পাত্রের জলটা বেশ গরম ঠেকছে B পাত্রের জলটা ঠিক ততটা গরম ঠেকছে না।

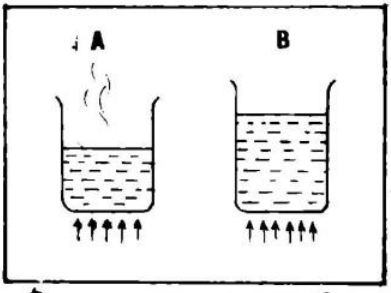

দুটি পাত্রের জলে তাপের পরিমাণ সমান। A পাত্রের জল কিন্তু B পাত্রের জলের চেয়ে গরম বেশি

সুতরাং দেখা যাচ্ছে **এই যে আমাদের গরম ও ঠাণ্ডার অনুভূতি এটা তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না** (তাহলে ত দুটি পাত্রের জলই সমান গরম ঠেকত) **নির্ভর করে বস্তুর বিশেষ একটি তাপীয় অবস্থার ওপর।** এই যে তাপীয় অবস্থা যা আমাদের ত্বকে গরম ও ঠাণ্ডার অনুভূতি জাগায়, তাকে বিজ্ঞানীরা বলেন উষ্ণতা বা তাপমাত্রা (**temperature**)। A পাত্রের জলের উষ্ণতা বেশি, তাই সেটা গরম মনে হয়েছে। B পাত্রের জলের উষ্ণতা কম, তাই সেটা অত গরম মনে হয়নি।

এবার A ও B পাত্র দুটি থেকে সমপরিমাণ জল তুলে নিয়ে একত্রে মেশাও। দেখবে মিশ্রিত জলের উষ্ণতা A পাত্রের জলের উষ্ণতা থেকে কম, কিন্তু B পাত্রের জলের উষ্ণতা থেকে বেশি। অর্থাৎ A পাত্রের জল কিছু পরিমাণ তাপ ত্যাগ করেছে, যার ফলে তার উষ্ণতা কমেছে। এবং B পাত্রের জল ঐ তাপটুকু গ্রহণ করেছে, যার ফলে তার উষ্ণতা বেড়েছে। অর্থাৎ তাপ উচ্চতর উষ্ণতা থেকে নিম্নতর উষ্ণতার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। কতক্ষণ চলেছে তাপের এই প্রবাহ ? যতক্ষণ না উভয় প্রকার জলের উষ্ণতা সমান হয়েছে।

সুতরাং উষ্ণতার (বা তাপমাত্রার) সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি

উষ্ণতা (বা তাপমাত্রা) হল বস্তুর এমন এক তাপীয় অবস্থা যা নির্ধারণ করে বস্তুটি অপর কোনও একটি বস্তুকে তাপ দেবে না তার থেকে তাপ নেবে।

একটি তুলনা দিলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে।

মনে কর P একটি সরু কাঁচপাত্র Q একটি ছড়ান কাঁচপাত্র। পাত্র দুটি একটি নলের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। নলটিকে খোলা বন্ধ করবার জন্য স্টপ-ককের (stop-cock) ব্যবস্থা আছে।

স্টপকক বন্ধ রেখে পাত্র দুটিতে সমপরিমাণ জল ঢাল। P পাত্রের জলের

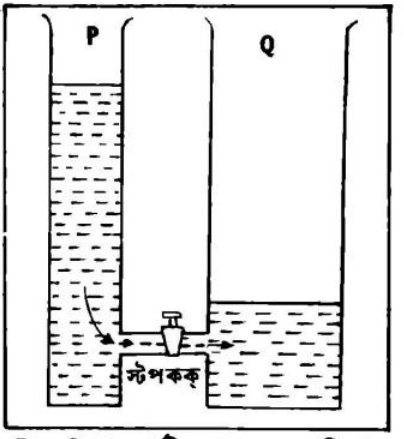

P ও Q পাত্র দুটিতে জলের পরিমাণ সমান কিন্তু P-এর জলতল Q-এর জলতলের চেয়ে উঁচু তাই জলের প্রবাহ P থেকে Q এ।

তল Q পাত্রের জলের তলের চেয়ে উচ্চতর হবে। স্টপকক খুলে দাও। লক্ষ্য কর জল P পাত্র থেকে অর্থাৎ উচ্চতর তল থেকে Q পাত্রের দিকে অর্থাৎ নিম্নতর তলের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। জলের এই

প্রবাহ কতক্ষণ ধরে বজায় থাকল? যতক্ষণ না দুটি পাত্রে জলের তল সমান হল।

P পাত্রে যদি জলের পরিমাণ Q পাত্রের জলের পরিমাণের চেয়ে কমও হয় তাহলেও জলের প্রবাহ P থেকে Q-এর দিকেই হবে। অবশ্য P পাত্রের জলতল Q পাত্রের চেয়ে উচ্চতর হতে হবে।

i. জল সর্বদা উচ্চতর তল থেকে নিম্নতর তলের দিকে প্রবাহিত হয়।

ii. জলের প্রবাহের দিক জলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না।

iii. দুটি জলতল সমান হলে তাদের মধ্যে জলের প্রবাহ হয় না।

জলের পরিমাণের সঙ্গে জলের তলের যে রকম সম্পর্ক কোনও বস্তুতে তাপের পরিমাণের সঙ্গে বস্তুটির উষ্ণতার সম্পর্কও ঠিক সেইরকমই।

i. তাপও সর্বদা উচ্চতর উষ্ণতা থেকে নিম্নতর উষ্ণতার দিকে প্রবাহিত হয়।

ii. তাপের প্রবাহ কোন বস্তু থেকে কোন বস্তুতে হবে তা বস্তু দুটির তাপের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না।

iii. দুটি বস্তুর উষ্ণতা সমান হলে তাদের মধ্যে তাপের আদানপ্রদান হয় না।

তাপ ও উষ্ণতায় পার্থক্য বোঝাতে আরও একটা তুলনার সাহায্য নিচ্ছি। দুটি

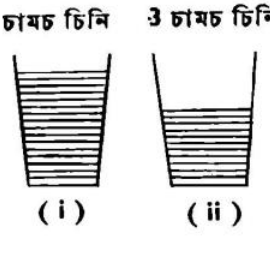

গ্লাস দুটিতে চিনির পরিমাণ সমান। কিন্তু মিষ্টতা (i)-এর কম (ii)-এর বেশি

গ্লাসের একটিতে বেশি অন্যটিতে কম জল নাও। দুটি গ্লাসেই তিন চামচ করে চিনি গুলে সরবৎ তৈরি কর। দুটি সরবতেই চিনির পরিমাণ সমান কিন্তু প্রথম সরবৎটির মিষ্টতা কম এবং দ্বিতীয় সরবৎটির মিষ্টতা বেশি। যে কোনও গ্লাস থেকে এক চামচ সরবৎ তুলে নাও। গ্লাসের সরবতে যতটা

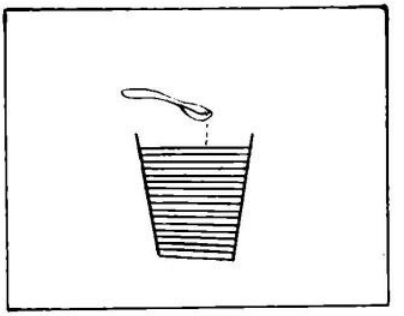

চামচের সরবতে চিনির পরিমাণ কম, গেলাসের সরবতে চিনির পরিমাণ বেশি। মিষ্টতা কিন্তু দুটিরই সমান

চিনি আছে চামচের সরবতটুকুতে চিনির পরিমাণ নিশ্চয়ই তার চাইতে কম কিন্তু মিষ্টতা গ্লাসের সরবতেরও যা, চামচের সরবতটুকুরও তাই।

সরবতে চিনির পরিমাণের সঙ্গে সরবতের মিষ্টতার সম্পর্ক যে রকম বস্তুর তাপের পরিমাণের সঙ্গে বস্তুর উষ্ণতার সম্পর্কও ঠিক সেইরকম।

i. চিনির পরিমাণ ও মিষ্টতার ক্ষেত্রে দুটি বস্তুতে তাপের পরিমাণ সমান হলেও তাদের উষ্ণতা সমান নাও হতে পারে।

ii. দুটি বস্তুর উষ্ণতা সমান হলেও বস্তু দুটিতে তাপের পরিমাণ সমান নাও হতে পারে।

নিচে তাপ ও উষ্ণতার পার্থক্যগুলো দেখান হল।

1. তাপ একপ্রকার শক্তি। কিন্তু উষ্ণতা বস্তুর এমন এক তাপীয় অবস্থা যা নির্ধারণ করে, বস্তুটি অন্য কোনও একটি বস্তুকে তাপ দেবে, না তার থেকে তাপ গ্রহণ করবে।

2. বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে বস্তুর উষ্ণতা বাড়ে, বস্তু থেকে তাপ অপসারণ করলে বস্তুর উষ্ণতা কমে। সুতরাং তাপকে কারণ ধরলে উষ্ণতাকে বলা যায় তার ফল।

3. তাপ সর্বদা উচ্চতর উষ্ণতা থেকে নিম্নতর উষ্ণতার দিকে প্রবাহিত হয়। তাপের প্রবাহ বস্তুর অন্তর্নিহিত তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।

4. দুটি বস্তুতে তাপের পরিমাণ সমান হলেও তাদের উষ্ণতা কম বেশি হতে পারে। আবার দুটি বস্তুর উষ্ণতা সমান হলেও তাদের অন্তর্নিহিত তাপের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে।

প্রশ্ন

1. উষ্ণতার সংজ্ঞা দাও। জলের পরিমাণ ও জলতলের সঙ্গে তাপ ও উষ্ণতার তুলনা করে দেখাও।
2. তাপকে কারণ এবং উষ্ণতাকে তার ফল বলা হয় কেন?
3. একটি ছোট এবং একটি বড় লোহ গোলককে ফুটন্ত জলে রেখে গরম করা হল। গোলক দুটির তাপ এবং উষ্ণতার তুলনা কর। গোলক দুটিকে পরস্পরের সংস্পর্শে আনলে তাদের মধ্যে তাপের আদানপ্রদান কী রকম হবে?
4. সরবতে চিনির পরিমাণ এবং সরবতের মিষ্টতার সঙ্গে তাপের পরিমাণ এবং বস্তুর উষ্ণতার তুলনা কর।
5. দুটি বস্তুতে তাপের পরিমাণ সমান হলেও তাদের উষ্ণতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে আবার দুটি বস্তুর উষ্ণতা সমান হলেও তাদের মধ্যে তাপের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে। কীভাবে বুঝিয়ে দাও।

আমরা দেখেছি আমাদের ত্বকের যে গরম ও ঠাণ্ডার অনুভূতি তা বস্তুর তাপের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বস্তুর উষ্ণতার ওপর। সুতরাং দুটি বস্তুর মধ্যে কোনটির উষ্ণতা বেশি কোনটির কম, তা আমরা আমাদের গরম ঠাণ্ডার অনুভূতির সাহায্যে বলে দিতে পারি। কিন্তু কোনও একটি বস্তুর উষ্ণতা ঠিক কী পরিমাণ, তা এই অনুভূতির সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয় আমাদের অনুভূতি অনেক সময়ে বিচারে ভুলও করতে পারে। কীরকম ভুল, তা নিচের পরীক্ষাটি করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

A বালতিতে স্বাভাবিক উষ্ণতার জল, B বালতিতে ঈষৎ গরম করা জল, এবং

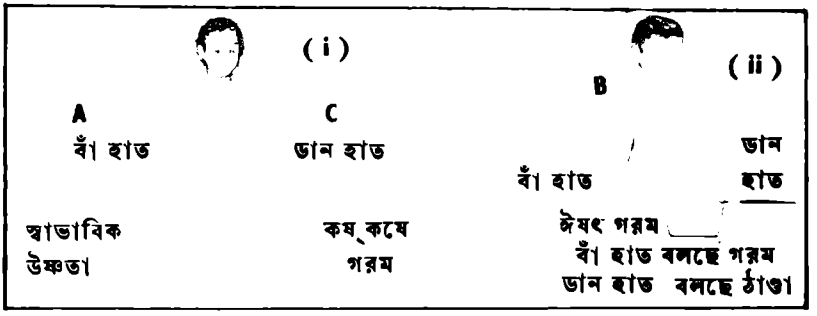

C বালতিতে কষকষে গরম জল নাও। কিছুক্ষণের জন্য তোমার বাঁ-হাত A বালতির মধ্যে এবং ডান হাতটি C বালতির মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। এবার বাঁ এবং ডান দুটো হাতই B বালতির জলে ডুবাও। তোমার বাঁ-হাতের কাছে জলটা গরম বলে বোধ হবে, কিন্তু ডান হাতের কাছে বোধ হবে ঠাণ্ডা বলে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ উষ্ণতার সূক্ষ্ম ও নির্ভুল পরিমাপের জন্য ত্বকের অনুভূতির ওপর মোটেই নির্ভর করা চলে না। এর জন্য অন্য ব্যবস্থা দরকার।

যে ব্যবস্থার সাহায্যে বস্তুর উষ্ণতা সূক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় তাকে থার্মোমিটার (Thermometre) বলা হয়।

থার্মোমিটার নানা প্রকারের হয়ে থাকে। বাড়িতে জ্বর দেখতে এবং গবেষণাগারে সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে যে সব থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলো সবই পারদ থার্মোমিটার (Mercury Thermometre)। পারদ থার্মোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তোমরা অষ্টম শ্রেণীতেই পড়েছ। উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পারদের আয়তনও একটি সুনির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পারদ থার্মোমিটারে পারদের এই আয়তন বৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বস্তুর উষ্ণতা নির্ণয় করা হয়।

দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য যেমন C.G.S., F.P.S., M.K.S., প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন একক প্রচলিত আছে, উষ্ণতা পরিমাপের জন্যও তেমনি একাধিক একক প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিগুলোকে স্কেল (Scale) বলা হয়। উষ্ণতা পরিমাপের তিনটি প্রচলিত স্কেল হল—

1. সেণ্টিগ্রেড স্কেল (Centigrade Scale) — বিজ্ঞানী সেলসিয়াস (Celcius)-এর নামানুসারে এটিকে আজকাল সেলসিয়াস স্কেল (Celcius Scale) বলা হয়।
2. ফারেনহাইট স্কেল (Fahrenheit Scale) —বিজ্ঞানী ফারেনহাইট-এর নামানুসারে এই স্কেলের নামকরণ।
3. রেয়োমিউর স্কেল (Réaumur Scale) —এটিরও নামকরণ বিজ্ঞানী রেয়োমিউরের নামানুসারে।

সেলসিয়াস স্কেলে নিম্নস্থিরাংককে (অর্থাৎ স্বাভাবিক বায়ু চাপে বিশুদ্ধ বরফের গলনাংককে) ধরা হয় 0°C এবং ঊর্ধ্বস্থিরাংককে (অর্থাৎ স্বাভাবিক বায়ু চাপে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাংককে) ধরা হয় 100°C। এই দুই স্থিরাংকের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে 100টি সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং এক একটি অংশাংকনের মান দাঁড়ায় 1°C।

ফারেনহাইট স্কেলে নিম্নস্থিরাংককে ধরা হয় 32°F এবং ঊর্ধ্বস্থিরাংককে 212°F। দুটি স্থিরাংকের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে (212 – 32)টি অর্থাৎ 180টি সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। এক একটি অংশাংকনের মান দাঁড়ায় 1°F।

রেয়োমিউর স্কেলে নিম্নস্থিরাংককে ধরা হয় 0°R এবং ঊর্ধ্বস্থিরাংককে 80°R। দুটি স্থিরাংকের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে 80টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। এক একটি অংশাংকনের মান দাঁড়ায় 1°R।

স্কেল তিনটির মধ্যে সেলসিয়াস স্কেলটিই সর্বাধিক প্রচলিত। ফারেনহাইট স্কেলটির প্রচলন ব্রিটেন ও ব্রিটিশ প্রভাবাধীন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ—তাও কেবলমাত্র সাধারণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে নয়। রেয়োমিউর স্কেলের প্রচলন বর্তমানে আর নেই বললেই হয়।

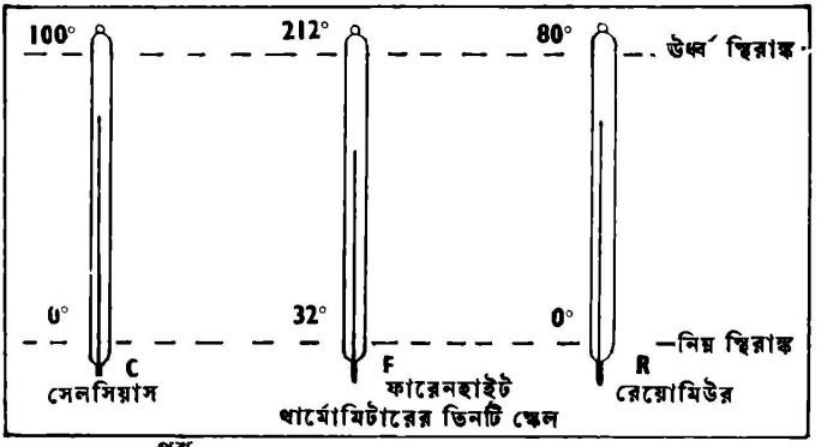

থার্মোমিটারের তিনটি স্কেল

প্রশ্ন

1. গরম ও ঠাণ্ডা বোধের সাহায্যে আমরা কিসের আন্দাজ পাই—বস্তুর তাপের না বস্তুর উষ্ণতার ?
2. ত্বকের গরম-ঠাণ্ডা বোধের সাহায্যে বস্তুর উষ্ণতা সূক্ষ্ম ও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় না কেন ?
3. থার্মোমিটার বলতে কী বোঝ ? আমরা সাধারণত যে সব থার্মোমিটার ব্যবহার করে থাকি সেগুলো কী থার্মোমিটার ? এই শ্রেণীর থার্মোমিটারে পারদের কোন ধর্মকে কাজে লাগান হয় ?
4. উষ্ণতা নির্ণয়ের প্রচলিত তিনটি স্কেলের নাম বল। কোন স্কেলে নিম্নস্থিরাংক কত এবং ঊর্ধ্বস্থিরাংক কত লেখ।

আমরা দেখেছি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে সেলসিয়াস স্কেলের আধিপত্য হলেও অনেক দেশে এখনও ফারেনহাইট স্কেলেরও ব্যাপক প্রচলন আছে। তাই অনেক সময়ে এক স্কেলে নির্ণয় করা উষ্ণতা অন্য স্কেলে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল-দুটির পারস্পরিক সম্পর্কটা আমাদের জেনে রাখা উচিত।

কোনও বস্তুর উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে যদি হয় C° এবং ফারেনহাইটে F° তাহলে প্রমাণ করে দেখান যায়—

$$\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$$

কোনও বস্তুর উষ্ণতা সেলসিয়াস বা ফারেনহাইট কোনও একটি স্কেলে দেওয়া থাকলে অপর স্কেল অনুযায়ী বস্তুটির উষ্ণতা কত হবে তা ওপরের সূত্রটির সাহায্যে সহজেই নির্ণয় করা যায়। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখ।

1. গন্ধকের গলনাংক $120^\circ C$। ফারেনহাইট স্কেল অনুযায়ী গন্ধকের গলনাংক কত হবে ?

আমরা জানি $\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$

এখানে $C=120$ দেওয়া আছে।

$$\frac{120}{5}=\frac{F-32}{9}$$

বা $24=\frac{F-32}{9}$

বা $F-32=24\cdot9$

বা $F=216+32$

বা $F=248$

অর্থাৎ ফারেনহাইট স্কেল অনুযায়ী গন্ধকের গলনাংক $248^\circ F$।

2. পারদ 674°F উষ্ণতায় ফোটে। সেলসিয়াস স্কেল অনুযায়ী পারদের স্ফুটনাংক কত ?

আমরা জানি $\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$

বর্তমান ক্ষেত্রে $F=674$

$$\frac{C}{5}=\frac{674-32}{9}$$

বা $9C=5\cdot642=3210$

বা $C=\frac{3210}{9}=356\cdot7$

পারদের স্ফুটনাংক $=356\cdot7°C$

3. একটি বস্তুর উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলেও যত ফারেনহাইট স্কেলেও ঠিক তাই। বস্তুটির উষ্ণতা কত ?

মনে করি বস্তুটির উষ্ণতা উভয় স্কেল অনুযায়ীই $X°$।

$\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$ সূত্রটিতে C এবং F এর জায়গায় X লিখে পাই $\frac{X}{5}=\frac{X-32}{9}$

বা $9x=5x-160$

বা $4x=-160$

বা $x=-40$

বস্তুটির উষ্ণতা, $-40°C$ বা $-40°F$

প্রশ্ন

1. সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল দুটির পারস্পরিক সম্পর্কসূচক সূত্রটি লেখ।
2. জ্বর দেখার ডাক্তারী থার্মোমিটারেও (Clinical Thermometre) আমাদের দেশে আজকাল সেলসিয়াস স্কেল চালু হয়েছে। তুমি তোমাদের নতুন থার্মোমিটারটি দিয়ে ছোট বোনটির জ্বর মেপে দেখলে 40°C। তোমার মা সেলসিয়াস স্কেলটেল বোঝেন না। বোনটির জ্বর ফারেনহাইট স্কেল অনুযায়ী কত, হিসেব করে মাকে বল। (উত্তর—104°F)
3. আগেকার ডাক্তারী থার্মোমিটারে 98·4°F-এ একটি লাল তীর চিহ্ন দেওয়া থাকত। 98·4°F হল সুস্থ মানুষের জিভের নিচেকার সর্বোচ্চ উষ্ণতা। বর্তমানে ডাক্তারী থার্মোমিটারেও সেলসিয়াস স্কেল ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সব নতুন থার্মোমিটারে তীর চিহ্নটি কত ডিগ্রীর দাগে থাকবে ?

(উত্তর—37°C)

4. একটি বস্তুর উষ্ণতা ফারেনহাইট স্কেলে যত, সেলসিয়াস স্কেল অনুযায়ী তার ঠিক অর্ধেক। বস্তুটির উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেল অনুযায়ী কত ? (উত্তর—160°C)

রসায়ন

পুনরনুশীলন

চিহ্ন, সংকেত ও রাসায়নিক সমীকরণ

1 রাসায়নিক সমীকরণের সংজ্ঞা দাও। [10/96/II]

2. রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ বলতে কী বোঝ ? [10/97/I]

3. রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্যসমূহ লেখ। [10/99/II]

4. রাসায়নিক সমীকরণ থেকে কী

কী বিষয় জানা যায় না ? [10/100/I]

(সংকেত : অনেক সময়ে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ দিয়ে দেওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় সমীকরণটি থেকে তুমি কী কী জানতে পারছ এবং কী কী বিষয়ে জানতে পারছ না। আমরা $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$ এই সমীকরণটি নিয়ে এই রকম আলোচনা করেছি আমাদের পাঠে।!)

5. নিম্নলিখিত ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ সমীকরণগুলো ব্যালান্স করে দেখাও।

i. $Na + Cl = NaCl$

ii. $Zn + HCl = ZnCl_2 + H_2$

iii. $KClO_3 = KCl + O_2$

iv. $Mg + CO_2 = MgO + C$

v. $CaO + HCl = CaCl_2 + H_2O$

[10/99/I]

(সংকেত : সমীকরণ Balance করার জন্য দুটি কথা মনে রাখতে হবে।

1. কোনও মৌলের পরমাণুর সংখ্যা বাম পক্ষে যত আছে ডান পক্ষেও ঠিক ততই হতে হবে।

2. মৌলকে তার পারমাণবিক অবস্থায় দেখালে চলবে না, দেখাতে হবে আণবিক অবস্থায়। অর্থাৎ সমীকরণে Cl লিখলে চলবে না, লিখতে হবে Cl_2। প্রদত্ত সমীকরণগুলোকে Balance করে লিখলে হবে এই রকম—

i. $2Na + Cl_2 = 2NaCl$

ii. $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$

iii. $2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$

iv. $2Mg + CO_2 = 2MgO + C$

v. $CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$

অনেক সময়ে বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর নাম দিয়ে দেওয়া হয় এবং রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে বলা হয়। এর জন্য বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলোর আণবিক সংকেত জানা থাকা চাই।)

গাণিতিক প্রশ্ন

ভৌত বিজ্ঞানে আমাদের একই রাশির বিভিন্ন একক সমূহের মধ্যে সম্পর্ক জানতে হয়েছে। যেমন 1 ইঞ্চি = 2·54 সে.মি., 1 মিটার = 39·37 ইঞ্চি, 1 পাউণ্ড = 453·6 গ্রাম, 1 অশ্বক্ষমতা = 746 ওয়াট্ ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোর ওপর তোমাদের সহজ সহজ গাণিতিক প্রশ্ন করা যেতে পারে।

এছাড়া বিভিন্ন রাশির সম্পর্কসূচক বেশ কয়েকটি সূত্র ও সমীকরণও আমরা শিখেছি। যেমন $P = mf$, $H = m.s.t.$, ত্বরণ $= \frac{\text{বেগ বৃদ্ধি}}{\text{সময়}}$ ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোকে ভিত্তি করেও তোমাদের খুব সোজা সোজা গাণিতিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতে পারে।

এখানে আমরা এই রকম কয়েকটি গাণিতিক প্রশ্নের নমুনা দিচ্ছি।

---

1. 140 টাকা প্রতি কিলো এবং 70 টাকা প্রতি পাউণ্ড এই দুই প্রকার দরের উলের মধ্যে কোনটি অপেক্ষাকৃত সস্তা।

1 পাউণ্ড = 453·6 গ্রাম

453·6 গ্রাম দ্বিতীয় প্রকার উলের দাম 70 টাকা

1000 গ্রাম $\left(\frac{70}{453·6} \times 1000\right)$ টাকা

অর্থাৎ 1 কিলো 154·32 টাকা

প্রথম প্রকার উলটি অপেক্ষাকৃত সস্তা।

2. 12 টাকা প্রতি গজ এবং 13 টাকা প্রতি মিটার এই দুই দরের কাপড়ের মধ্যে কোনটি দরে কম ?

1 গজ = 91.44 সে.মি.

91.44 সে.মি. প্রথম প্রকার কাপড়ের দাম 12 টাকা

100 সে.মি. $\left(\frac{12}{91.44} \times 100\right)$ টাকা

বা 13.12 টাকা

অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার কাপড়টি দরে কম।

3. একটি তরলের উষ্ণতা 122°F। সেলসিয়াস স্কেলে তরলটির উষ্ণতা কত হবে ?

আমরা জানি $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

এখানে F = 122 দেওয়া আছে।

$$\frac{C}{5} = \frac{122-32}{9} = \frac{90}{9} = 10$$

$$C = 10 \times 5 = 50$$

সেলসিয়াস স্কেল অনুযায়ী তরলটির উষ্ণতা হবে 50°C.

4. একটি বস্তুকণার বেগ ছিল 20 সে.মি. সেকেণ্ড। 5 সেকেণ্ডের মধ্যে বেগ বৃদ্ধি পেয়ে 50 সে.মি. / সেকেণ্ড হল। বস্তুকণাটির ত্বরণ কত ?

5 সেকেণ্ডে বেগ বৃদ্ধি = (50 − 20) সে.মি. / সেকেণ্ড

1 সেকেণ্ডে বেগ বৃদ্ধি $= \frac{30 \text{ সে.মি / সেকেণ্ড}}{5 \text{ সেকেণ্ড}}$

= 6 সে.মি. সেকেণ্ড$^{-2}$।

নির্ণেয় ত্বরণ 6 সে.মি. / সেকেণ্ড^2

5. 25 গ্রাম ভরের একটি বস্তু 7 সে.মি. / সেকেণ্ড^2 ত্বরণ নিয়ে চলেছে। বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বল কত ?

আমরা জানি $P = m.f.$

এক্ষেত্রে m = 25 গ্রাম, f 7 সে.মি. / সেকেণ্ড^2

P = (25 × 7) ডাইন বা 175 ডাইন

প্রযুক্ত বল 175 ডাইন।

6. একটি বস্তুর উপর 50 ডাইন বল প্রয়োগ করার ফলে তাতে 2 সে.মি. / সেকেণ্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি হল। বস্তুটির ভর কত।

$P = m.f.$ অর্থাৎ $m = P/f.$

এক্ষেত্রে P = 50 ডাইন এবং f = 2 সে.মি. / সেকেণ্ড^2

এক্ষেত্রে $m = (\frac{50}{2})$ গ্রাম বা 25 গ্রাম।

বস্তুটির ভর 25 গ্রাম।

7. একটি বালকের ভর 70 পাউণ্ড। বালকটি 21 সেকেণ্ডে 36 ফুট উঁচু একটি টিলার শীর্ষে পৌঁছল। বালকটি কী পরিমাণ কাজ করল ? বালকটির ক্ষমতা কত ?

অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে 36 ফুট উঠতে বালকটিকে কার্য করতে হয়েছে

(70×36) ফুট পাউণ্ড

$= 2520$ ফুট পাউণ্ড

21 সেকেণ্ডে কার্য করে 2520 ফুট পাউণ্ড

1 $\frac{2520}{21}$ ফুট পাউণ্ড

$= 120$ ফুট পাউণ্ড

এখন 550 ফুট পাউণ্ড / সেকেণ্ড $= 1$ অশ্বক্ষমতা

120 ফুট পাউণ্ড / সেকেণ্ড $= \left(\frac{1}{550} \times 120\right)$ অশ্বক্ষমতা

$= \cdot 218$ অশ্বক্ষমতা (প্রায়)

বালকটি 2520 ফুট পাউণ্ড কার্য করল।

বালকটির ক্ষমতা $\cdot 218$ অশ্বক্ষমতা।

8. 40 গ্রাম লোহার উষ্ণতা $5°C$ বৃদ্ধি করতে কত ক্যালরি তাপ লাগবে ? লোহার আপেক্ষিক তাপ $\cdot 11$ ক্যালরি প্রতি গ্রাম।

আমরা জানি $H = m.s.t.$

এক্ষেত্রে $m = 40$ গ্রাম

$s = \cdot 11$ ক্যালরি / গ্রাম

এবং $t = 5°C$

$H = (40 \times \cdot 11 \times 5)$ ক্যালরি

বা 22 ক্যালরি।

22 ক্যালরি তাপ প্রয়োজন হবে।

9. সীসার আপেক্ষিক তাপ $\cdot 03$। 60 ক্যালরি তাপ প্রয়োগের ফলে একখণ্ড সীসার উষ্ণতা $50°C$ বৃদ্ধি পেল। সীসার খণ্ডটির ভর কত ?

আমরা জানি $H = m.s.t.$

বা $m = \frac{H}{s.t.}$

এক্ষেত্রে $H = 60$ ক্যালরি

$s = \cdot 03$

$t = 50°C$

$m = \frac{H}{s.t.}$ গ্রাম $= \left(\frac{60}{\cdot 03 \times 50}\right)$ গ্রাম $= 40$ গ্রাম

সীসার খণ্ডটির ভর 40 গ্রাম।

10. $O°C$ উষ্ণতায় 50 গ্রাম বরফকে $25°C$ উষ্ণতা বিশিষ্ট জলে পরিণত করতে কত ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হবে ? বরফের গলনের লীনতাপ 80 ক্যালরি প্রতি গ্রাম।

$O°C$ উষ্ণতা বিশিষ্ট 50 গ্রাম বরফকে $O°C$ উষ্ণতা বিশিষ্ট জলে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় তাপ $= (50 \times 80)$ ক্যালরি

বা 4000 ক্যালরি।

50 গ্রাম জলের উষ্ণতা $O°C$ থেকে $25°C$-এ তুলতে প্রয়োজনীয় তাপ

(50×25) ক্যালরি

বা 1250 ক্যালরি।

মোট তাপ লাগবে $4000 + 1250$) ক্যালরি

বা 5250 ক্যালরি।

(দ্রষ্টব্য : C.G.S. ও F.P.S. পদ্ধতির এককগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি তালিকা নবম দশমের প্রথম সংখ্যার 96 পৃষ্ঠাতে পাবে।

নিম্নলিখিত সমীকরণগুলোর ওপর গাণিতিক প্রশ্ন আসতে পারে।

i. $w = mg$

ii. ত্বরণ $= \frac{\text{বেগ বৃদ্ধি}}{\text{সময়}}$

iii. $P = m.f.$

iv. ক্ষমতা $= \frac{\text{কৃতকার্য}}{\text{সময়}}$

v. স্থৈতিক শক্তি $= mgh$

vi. গতীয় শক্তি $= \frac{1}{2} mv^2$

vii. যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{\text{অতিক্রান্ত বাধা}}{\text{প্রযুক্ত বল}}$

viii. $H = m.s.t.$

ix. $W = J.H.$

x. $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

শ্রীঅরুণ কুমার আচার্য, শিক্ষক
মাদপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মেদিনীপুর

আপনি ঠিকই লিখেছেন। আমাদের ১ম সংখ্যার 97 পৃষ্ঠায় 4 নং প্রশ্নটির সমাধানে 73.86 টাকার জায়গায় 71.32 টাকাই হবে। ভ্রমটি সংশোধন করে দেবার জন্য ধন্যবাদ।

অমৃতসূ দাস

কথার কথা

অ্যালবাম। কিসের অ্যালবাম, না ছবির অ্যালবাম বা ডাকটিকিটের অ্যালবাম। কথাটা আমরাও কথায় বার্তায় ব্যবহার করে থাকি। এই শব্দটাকে বিদেশি বলেই মনে হয় না। যেমন বিদেশি বলে মনে হয় না চেয়ার, টেবিল, গেলাস এইসব কথাকে। এরা আমাদের যেন আত্মীয়ই হয়ে গেছে। অ্যালবাম কথাটা ইংরাজিতে এসেছে অনেক কথার মতই ল্যাটিন থেকে। পুরোন রোমে জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি টাঙানোর একটা জায়গা থাকত, তার নাম ছিল ট্যাবলেট। ট্যাবলেট মানে ওষুধের বা অন্যরকম বড়ি ছাড়াও এর একটা অর্থ হল পাথর বা কাঠের ফলক। ট্যাবলেট কথাটার অন্যান্য অর্থ ভাল অভিধান থেকে দেখে নাও। ফলকের ওপর টাঙিয়ে দেওয়া হত বা লিখে দেওয়া হত ঘোষণাপত্র বা ইস্তাহার। কিন্তু তার সঙ্গে অ্যালবামের সম্পর্ক কি? যদিও শুনতে একরকম মনে হয় না, কিন্তু ট্যাবলেট এবং অ্যালবাম কথা ছিল সমার্থক। আলবুস কথাটার অর্থ ছিল সাদা, অর্থাৎ যার ওপর কোন লেখা হয়নি। অ্যালবামও তাই—তবে সাধারণত একটা বাঁধান খাতায় অনেকগুলো না লেখা পাতা থাকলে সেটাকে লেখার কাজেও ব্যবহার করা যায় আবার ছবি, ডাকটিকিট ইত্যাদি এঁটেও দেওয়া যায়। তখনই সেটাকে বলা যায় অ্যালবাম। আবার অ্যালবামে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সই সংগ্রহ করে—সেটারও নাম অ্যালবাম হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে তার আগে অটোগ্রাফ কথাটা বসিয়ে দিতে হবে।

গনিত

পুনরনুশীলন

আর কয়েকদিনের মধ্যে তোমাদের গরমের ছুটি শেষ হবে। কারও বা হাফইয়ার্লি পরীক্ষা আরম্ভ হবে, কারও বা রেজাল্ট বেরোবে। কাজেই আমাদের রিভিশনের কাজটা এই সংখ্যায় শেষ করতে হবে। এরপর আবার নতুন পাঠ।

পাটিগণিত

গত সংখ্যায় আমরা টেস্ট পেপার থেকে কতকগুলো অঙ্ক দিয়েছিলাম। কিছু অঙ্ক আমরা আলোচনা করেছি। বাকিগুলো তোমাদের সমাধানের চেষ্টা করার কথা। জানি তোমরা বেশিরভাগই সব ক'টি প্রশ্নের সমাধান করেছ। এবারে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে। তবে এর মধ্যে কিছু অঙ্ক তোমরা সকলে নাও করতে পার। যদিও এর পার্সেন্টেজ খুবই কম তবুও এর থেকে আর কয়েকটি প্রশ্নের আজ আমরা সমাধান করব। প্রশ্নগুলো সামনে থাকলে সুবিধা হবে। কাজেই যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করব সেইগুলো আগে লিখে নেব।

7 নম্বর প্রশ্ন ঃ 54 টাকা A, B ও C-র মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন A C-র $1\frac{1}{2}$ গুণের চেয়ে 2 টাকা বেশি এবং B, C-র $2\frac{2}{5}$ গুণের চেয়ে 3 টাকা বেশি পায়।

পর্যায় ঃ এখানে 54 টাকা A, B ও C-র মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। কিন্তু A, B ও C-র অংশের অনুপাত সরাসরি দেওয়া নেই ; কিছু শর্ত আরোপ করা আছে। সেই শর্ত থেকে A, B ও C-র অংশের অনুপাত বের করতে হবে। সেদিক দিয়ে এটি সাধারণ অনুপাত পর্যায়ের অঙ্ক। আবার যেহেতু টাকা ভাগ করার ব্যাপার আছে সেই হেতু এটিকে সমানুপাতিক ভাগহার পর্যায়েরও অঙ্ক বলা যায়।

পদ্ধতি ঃ মোট 54 টাকা ভাগ করতে হবে। এখন A, C-র $\frac{3}{2}$ গুণের চেয়ে 2 টাকা বেশি পায়। A-র এই অতিরিক্ত 2 টাকা বাদ দিলে A, C-র $\frac{3}{2}$ গুণ পাবে এবং সেক্ষেত্রে মোট টাকা থেকে 2 টাকা বাদ দিয়ে মোট $(54-2)$ টাকা $=52$ টাকা ভাগ করতে হবে। আবার B, C-র $2\frac{2}{5}$ গুণের চেয়ে 3 টাকা বেশি পায়। একই ভাবে B-র এই 3 টাকা বাদ দিলে B, C-ব $2\frac{2}{5}$ গুণ পাবে এবং মোট টাকাও $52-3=49$ টাকা হবে। কাজেই এই 49 টাকার মধ্যে A ও C-র অংশের অনুপাত এবং B ও C-র অংশের অনুপাত পাওয়া যাবে। তার থেকে A, B ও C-র অংশের ধারাবাহিক অনুপাত বের করতে হবে। এরপর 49 টাকাকে সেই অনুপাতে ভাগ করে A-র কমান 2 টাকা A-কে এবং B-র কমান 3 টাকা B-কে পুনরায় দিতে হবে।

সমাধান ঃ মোট 54 টাকা A, B ও C-র মধ্যে ভাগ করতে হবে।

প্রশ্নে প্রদত্ত দুটি শর্ত হল

$$\text{A-র টাকা} = \text{C-র টাকা} \times \frac{3}{2} + 2 \text{ টাকা}$$

এবং B-র টাকা = C-র টাকা $\times \frac{12}{5} + 3$ টাকা

এখন 54 টাকা থেকে A-র 2 টাকা এবং B-র 3 টাকা বাদ দিলে থাকে $(54 - 2 - 3)$ টাকা $= (54 - 5)$ টাকা $= 49$ টাকা।

এই 49 টাকার মধ্যে

A-র টাকা = C-র টাকা $\times \frac{3}{2}$

এবং B-র টাকা = C-র টাকা $\times \frac{12}{5}$

A-র টাকা : B-র টাকা : C-র টাকা

$= \left(\text{C-র টাকা} \times \frac{3}{2}\right) : \left(\text{C-র টাকা} \times \frac{12}{5}\right) : \left(\text{C-র টাকা}\right)$

$= \frac{3}{2} : \frac{12}{5} : 1$ [C-র টাকা সব ক'টি থেকে কমন বাদ দেওয়া হল]

$= \left(\frac{3}{2} \times 10^{5}\right) : \left(\frac{12}{5} \times 10^{2}\right) : \left(1 \times 10\right)$

$= 15 : 24 : 10$

এখন $15 + 24 + 10 = 49$

A-র টাকা $= \frac{49}{49} \times 15$ টাকা $= 15$ টাকা

B-র টাকা $= \frac{49}{49} \times 24$ টাকা $= 24$ টাকা

C-র টাকা $= \frac{49}{49} \times 10$ টাকা $= 10$ টাকা

কিন্তু A আরও 2 টাকা এবং B আরও 3 টাকা পাবে।

A-র টাকা $= (15 + 2)$ টাকা $= 17$ টাকা

এবং B-র টাকা $= (24 + 3)$ টাকা $= 27$ টাকা

উত্তর ঃ A, B ও C যথাক্রমে 17 টাকা, 27 টাকা এবং 10 টাকা পাবে।

8 নম্বর প্রশ্ন ঃ চার ব্যক্তি একটি যৌথ ব্যবসা আরম্ভ করল। দ্বিতীয় ব্যক্তির মূলধন, প্রথম ব্যক্তির মূলধনের দ্বিগুণ, তৃতীয় ব্যক্তির মূলধন প্রথম দুজনের মূলধনের সমষ্টির অর্ধেক এবং চতুর্থ ব্যক্তির মূলধন অন্যদের মূলধনের সমষ্টির সমান। 36000 টাকার লাভ অংশীদারদের মূলধনের অনুপাতে বণ্টন কর।

পর্যায় ঃ এখানে যৌথ ব্যবসায়ের মোট লাভ দেওয়া আছে এবং তা মূলধনের অনুপাতে 4 জন অংশীদারের মধ্যে ভাগ করতে হবে। অতএব এটি 'সম্ভূয় সমুত্থান' পর্যায়ের অঙ্ক।

পদ্ধতি ঃ প্রথম অংশীদারের মূলধন x টাকা ধর। এবার পরপর শর্ত অনুসারে অপর ব্যক্তিদের মূলধন x-এর আকারে প্রকাশ কর। এবার 'লভ্যাংশের অনুপাত = মূলধনের অনুপাত' এই সূত্র থেকে চার ব্যক্তির লভ্যাংশের অনুপাত বের কর। এরপর সমানুপাতিক ভাগহারের পদ্ধতিতে মোট লাভ 4 অংশীদারের মধ্যে ভাগ কর।

সমাধান ঃ মোট লাভ = 36000 টাকা

মনে করি প্রথম ব্যক্তির মূলধন = x টাকা

প্রথম শর্ত হল, দ্বিতীয় ব্যক্তির মূলধন প্রথম ব্যক্তির মূলধনের দ্বিগুণ।

দ্বিতীয় ব্যক্তির মূলধন = $2x$ টাকা

দ্বিতীয় শর্ত হল, তৃতীয় ব্যক্তির মূলধন প্রথম দুজনের মূলধনের সমষ্টির অর্ধেক।

তৃতীয় ব্যক্তির মূলধন $= \frac{1}{2}(x + 2x)$ টাকা $= \frac{3x}{2}$ টাকা

তৃতীয় শর্ত হল, চতুর্থ ব্যক্তির মুলধন অন্যদের মূলধনের সমষ্টির সমান।

চতুর্থ ব্যক্তির মূলধন $= (x + 2x + \frac{3x}{2}$ টাকা)

$$= \frac{2x + 4x + 3x}{2} \text{ টাকা}$$

$$= \frac{9x}{2} \text{ টাকা}$$

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির মূলধনের অনুপাত

$$= x : 2x : \frac{3x}{2} : \frac{9x}{2}$$

$$= 1 \quad 2 : \frac{3}{2} : \frac{9}{2}$$

$$= (1 \times 2) \quad (2 \times 2) \quad \left(\frac{3}{2} \times 2\right) \quad \left(\frac{9}{2} \times 2\right)$$

$$= 2 : 4 : 3 : 9$$

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির লভ্যাংশের অনুপাত = 2 4 3 9

এখন, $2 + 4 + 3 + 9 = 18$

প্রথম ব্যক্তির লভ্যাংশ $= \frac{\overset{2000}{\cancel{36000}}}{\cancel{18}} \times 2$ টাকা $= 4000$ টাকা

দ্বিতীয় $= \frac{\overset{2000}{\cancel{36000}}}{\cancel{18}} \times 4$ টাকা $= 8000$ টাকা

তৃতীয় $= \frac{\overset{2000}{\cancel{36000}}}{\cancel{18}} \times 3$ টাকা $= 6000$ টাকা

চতুর্থ $= \frac{\overset{2000}{\cancel{36000}}}{\cancel{18}} \times 9$ টাকা $= 18000$ টাকা

উত্তর ঃ চার ব্যক্তির লভ্যাংশ যথাক্রমে 4000 টাকা, 8000 টাকা, 6000 টাকা এবং 18000 টাকা।

10 নম্বর প্রশ্ন ঃ 5 জন পুরুষ, 6 জন স্ত্রীলোক ও 7 জন বালক 5 দিনে একটি কাজ শেষ করে 51 টাকা 25 পয়সা মজুরী পেল। 1 জন পুরুষ, 1 জন স্ত্রীলোক ও 1 জন বালকের দৈনিক কাজের পরিমাণ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ হলে প্রত্যেকে কত মজুরী পেল ?

পর্যায় ঃ এখানে কিছু টাকা কয়েকজনের মধ্যে মজুরী হিসাবে ভাগ করতে হবে। কাজেই এটি সমানুপাতিক ভাগহার পর্যায়ের অঙ্ক। কিন্তু যে অনুপাতে ভাগ করতে হবে সেটি দেওয়া নেই। এখন মজুরীর পরিমাণ মজুরের সংখ্যা এবং কতদিন কাজ করা হবে তার সমানুপাতী। কাজেই কি অনুপাতে ভাগ করতে হবে তা সমানুপাতের নিয়মে বের করা যাবে। অতএব এটি আধা 'সমানুপাত' ও আধা 'সমানুপাতিক ভাগহার' পর্যায়ের অঙ্ক।

পদ্ধতি ঃ এখানে 5 জন পুরুষ 6 জন স্ত্রীলোক ও 7 জন বালককে 5 দিনের মজুরী ভাগ করে দিতে হবে 51 টাকা 25 পয়সা থেকে। 1 জন পুরুষ, 1 জন স্ত্রীলোক ও 1 জন বালকের 1 দিনের কাজের অনুপাত $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{4}$। এখন লোক সংখ্যা বাড়লে সম্পন্ন কাজের পরিমাণ বাড়বে এবং দিনের সংখ্যা বাড়লেও কাজের পরিমান বাড়বে। অর্থাৎ কাজের পরিমাণ লোক সংখ্যা ও দিনের সংখ্যার সমানুপাতী। দৈনিক কাজের অনুপাতের সংখ্যাগুলোকে লোক সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে মোট কাজের অনুপাত পাওয়া যাবে। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেকেই সমান দিন (5 দিন) কাজ করছে সেই হেতু 5 দিনে কাজের পরিমাণ প্রত্যেকেরই 5 গুণ হবে। কাজেই কাজের অনুপাত একই থাকবে। অতএব দিনের সংখ্যা গুণ করার প্রয়োজন নেই। এবার মোট কাজের অনুপাতে মজুরী ভাগ করতে হবে সমানুপাতিক ভাগহারের পদ্ধতিতে। এবার পুরুষদের মোট মজুরীকে পুরুষের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে 1 জন পুরুষের মজুরী পাওয়া যাবে। একইভাবে 1 জন স্ত্রীলোক ও 1 জন বালকের মজুরী পাওয়া যাবে।

সমাধান ঃ মোট মজুরী = 51 টাকা 25 পয়সা = 5125 পয়সা। এখানে 5 জন পুরুষ, 6 জন স্ত্রীলোক ও 7 জন বালক 5 দিন ধরে একটি কাজ শেষ করে।

1 জন পুরুষ, 1 জন স্ত্রীলোক ও 1 জন বালকের দৈনিক কাজের অনুপাত = $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$।

এখন লোক সংখ্যা ও দিনের সংখ্যা বাড়লে কাজের পরিমাণও বাড়বে।

কাজের পরিমাণ, লোক সংখ্যা ও দিনের সংখ্যার সমানুপাতী।

5 জন পুরুষ, 6 জন স্ত্রীলোক ও 7 জন বালকের দৈনিক কাজের অনুপাত

$$= \left(\frac{1}{2} \times 5\right) : \left(\frac{1}{\cancel{3}} \times \overset{2}{\cancel{6}}\right) \quad \left(\frac{1}{4} \times 7\right)$$

$$= \frac{5}{2} : 2 \quad \frac{7}{4}$$

$$= \left(\frac{5}{\cancel{2}} \times \overset{2}{\cancel{4}}\right) : \left(2 \times 4\right) : \left(\frac{7}{\cancel{4}} \times \cancel{4}\right)$$

$$= 10 : 8 : 7$$

প্রত্যেকেই 5 দিন ধরে কাজ করেছে।

5 জন পুরুষ, 6 জন স্ত্রীলোক ও 7 জন বালকের 5 দিনের কাজের অনুপাত $10 : 8 : 7$ হবে।

আলোচনা ঃ দেখ 5 জন পুরুষ, 6 জন স্ত্রীলোক ও 7 জন বালকের 5 দিনের কাজের অনুপাত = $(10 \times 5) \quad (8 \times 5) : (7 \times 5) = 10 : 8 : 7$।

(5 কমন বাদ গেল)

এখন $10+8+7=25$

$$5 \text{ জন পুরুষের মজুরী} = \frac{5125}{25} \times 10 \text{ প.} = 2050 \text{ প.}$$

$$6 \text{ জন স্ত্রীলোকের মজুরী} = \frac{5125}{25} \times 8 \text{ প.} = 1640 \text{ প.}$$

$$7 \text{ জন বালকের মজুরী} = \frac{5125}{25} \times 7 \text{ প.} = 1435 \text{ প.}$$

$$1 \text{ জন পুরুষের মজুরী} = \frac{2050}{5} \text{ প.} = 410 \text{ প.} = 4 \text{ টা. } 10 \text{ প.}$$

$$1 \text{ জন স্ত্রীলোকের মজুরী} = \frac{1640}{6} \text{ প.}$$

$$= 273 \text{ প. প্রায়} = 2 \text{ টা. } 73 \text{ প.}$$

$$1 \text{ জন বালকের মজুরী} = \frac{1435}{7} \text{ প.} = 205 \text{ প.}$$

$$= 2 \text{ টাকা } 5 \text{ পয়সা}$$

উত্তর ঃ প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকের মজুরী যথাক্রমে 4 টা. 10 প., 2 টা. 73 প. ও 2 টা. 5 প.।

12 নম্বর প্রশ্ন ঃ A ও B-র টাকার অনুপাত 2 : 3। তারা C-কে কি অনুপাতে টাকা ধার দিলে A, B ও C-র টাকার অনুপাত 3 4 : 3 হবে।

পর্যায় ঃ এখানে A ও B-র টাকার অনুপাত দেওয়া আছে। বের করতে হবে A ও B কি অনুপাতে C-কে টাকা ধার দিয়েছিল। অতএব এটি সাধারণ অনুপাত পর্যায়ের অঙ্ক।

পদ্ধতি ঃ A ও B-র টাকার অনুপাত 2 : 3 অনুপাতের সংখ্যাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা x দিয়ে গুণ করলে A ও B-র টাকার পরিমাণ পাওয়া যাবে। A ও B-র C-কে টাকা ধার দেওয়ার পর A, B ও C-র টাকার অনুপাত 3 4 : 3। একইভাবে অনুপাতের সংখ্যাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা y দিয়ে গুণ করলে তাদের টাকার পরিমাণ পাওয়া যাবে। A ও B-র প্রথমে যে পরিমাণ টাকা ছিল তার থেকে C-কে টাকা ধার দেওয়ার পর যে পরিমাণ টাকা থাকল তা বিয়োগ করলে তারা C-কে কত টাকা ধার দিয়েছিল পেয়ে যাবে। C-কে দেয় এই দুজনের টাকার যোগফলই C-র প্রাপ্ত টাকার সমান হবে। ফলে x ও y-এর একটি সমীকরণ হবে। এর থেকে x-কে y-এর আকারে প্রকাশ কর। এবার A-র দেয় টাকা পূর্ব রাশি এবং B-র দেয় টাকা উত্তর রাশি ধরে অনুপাতটি বের কর। অনুপাতটি x ও y দিয়ে প্রকাশিত হবে। আগেই x-কে y-এর আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সম্পর্কটি এই অনুপাতে প্রয়োগ করলে পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি y আকারে প্রকাশিত হবে। y কমন বাদ যাবে। ফলে অনুপাতটি বেরিয়ে যাবে।

সমাধান ঃ প্রথমে A ও B-র টাকার অনুপাত = 2 : 3 মনে করি A-র $2x$

টাকা এবং B-র $3x$ টাকা ছিল। C-কে টাকা ধার দেওয়ার পর A, B ও C-র টাকার অনুপাত = 3 : 4 : 3।

মনে করি এক্ষেত্রে A-র $3y$ টাকা, B-র $4y$ টাকা এবং C-র $3y$ টাকা হল।

A, C-কে $(2x-3y)$ টাকা ধার দিয়েছে এবং B, C-কে $(3x-4y)$ টাকা ধার দিয়েছে।

C-র মোট টাকা $= (2x-3y+3x-4y)$ টাকা

$= (5x-7y)$ টাকা।

$5x-7y=3y$

or, $5x=7y+3y=10y$

$x=\frac{10y}{5}=2y$

এখন $\frac{\text{C-কে A-র দেয় টাকা}}{\text{C-কে B-র দেয় টাকা}}=\frac{2x-3y}{3x-4y}$

$=\frac{2.2y-3y}{3.2y-4y}$

$=\frac{4y-3y}{6y-4y}$

$=\frac{y}{2y}=\frac{1}{2}$

উত্তর ঃ A ও B C-কে 1 2 অনুপাতে টাকা ধার দিয়েছিল।

রিভিশনে জুনের দুটি সংখ্যায় যে প্রশ্নগুলো সমাধান করা হল না, সেগুলোর উত্তর মিলিয়ে নিও।

2. 240 টাকা, 432 টাকা ও 540 টাকা।
4. 90 টাকা, 81 টাকা এবং 108 টাকা।
5. 610 টাকা, 1515 টাকা এবং 2125 টাকা।
11. 48 টাকা, 64 টাকা 80 টাকা।
13. 48%।

বীজগণিত

বীজগণিতে গত সংখ্যায় আমরা টেস্ট পেপার থেকে যে সব অঙ্কগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো বিভিন্ন সূত্রের প্রয়োগ সংক্রান্ত অঙ্ক। আজ টেস্ট পেপার থেকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ, গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. সংক্রান্ত কিছু অঙ্ক আলোচনা করব।

উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর ঃ

1. $6-t-12t^2$
2. $x^2-6xy+5y^2-4yz-z^2$
3. $x^2-a^2-5x+a+6$

4. $(x-1)(x-2)(x+3)(x+4)+6$
5. $x^2+2xy+x+y^2+y-6$
6. $(x+1)^4+4(x-1)^4$
7. $x^2-10a-b^2-4b+21$
8. $px^2-(p^2+1)x+p$
9. $8x-3-4x^2$
10. $x^2+qx-p^2+5pq-6q^2$
11. x^2-x-a^2-3a-2
12. $x^2-y^2-z^2-2yz+x-y-z$
13. $(x^2-1)(x+2)x-8$
14. $(a+b)^2-5a-5b+6$
15. $9+9x-4x^2$
16. $m^2-3mn+2n^2+m-2n$
17. $(x^2-1)(y^2-1)+4xy$
18. $a^2-b^2-c^2-2bc-a-b-c$
19. $12-8x+x^2$
20. $2\left(a^2+\frac{1}{a^2}\right)-\left(a-\frac{1}{a}\right)-7$
21. $(a^2-1)(b^2-1)+4ab.$

আলোচনা ঃ দেখ, 1, 9, 15 এবং 19 নম্বর অঙ্ক একই ধরনের। সবগুলো দ্বিঘাত রাশি। অতএব মিডলটার্ম পদ্ধতিতে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে। তবে 9 নম্বরের অঙ্কটি একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে। ওখানে $8x$ মাঝখানে না দিয়ে প্রথম পদে আছে। এটিকে মাঝখানে নিয়ে যাও এবং মাঝের পদটি প্রথমে নিয়ে এস। এরপর মিডলটার্ম পদ্ধতি প্রয়োগ কর।

9 নম্বর ঃ

সমাধান ঃ

$8x-3-4x^2$	রাফ গণনা
$=-3+8x-4x^2$	
$=-3+6x+2x-4x^2$	$-3\times(-4)=12$
$=-3(1-2x)+2x(1-2x)$	x এর সহগ $=8$
$=(1-2x)(-3+2x)$	এখন $12=6\times2$
$=(1-2x)(2x-3)$	আবার $6+2=8$

আলোচনা ঃ 2, 6, 12, 17, 18 এবং 21 নম্বর অঙ্কগুলোতে প্রদত্ত রাশিটিকে দুটি বর্গের অন্তররূপে অর্থাৎ a^2-b^2 আকারে প্রকাশ করে $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ সূত্র দিয়ে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

2 নম্বর অঙ্কে $5y^2=9y^2-4y^2$ বসিয়ে এগিয়ে যাবে। 6 নম্বর অঙ্কে $x+1=a$ এবং $x-y=b$ ধরলে প্রদত্ত রাশিটি a^4+4b^4 এ পরিণত হবে। তারপর পদ্ধতি মত এগোবে।

12 এবং 18 নম্বর অঙ্ক দুটি হুবহু একরকম। একটিতে x, y, z দিয়ে এবং অপরটিতে a, b, c দিয়ে রাশিটি দেওয়া আছে।

12 ও 18 নম্বরের পদ্ধতি ঃ এখানে রাশিটিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে একটি ভাগ দুটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করে উৎপাদকে পরিণত করা যাবে। অপর ভাগটি যা আছে সেইভাবেই রাখতে হবে। দেখতে হবে কোন অংশটিতে বর্গাকার পদ বা $2ab$ আকারের পদ নেই। সেই অংশটি যেমন আছে সেইরকম রেখে দিতে হবে। তবে এগুলোর মধ্যে —কমন পেলে —কমন নেবে। দেখা যাবে যে অংশটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একটি উৎপাদক অপর অংশটির সমান। তাহলে এবার কাজ হবে এই সমান অংশটিকে কমন নেওয়া। তবেই তোমাদের কাজ শেষ হবে।

18 নম্বরের সমাধান ঃ

$$\begin{aligned}
&a^2-b^2-c^2-2bc-a-b-c\\
&=a^2-(b^2+c^2+2bc)-(a+b+c)\\
&=a^2-(b+c)^2-(a+b+c)\\
&=\{a+(b+c)\}\{a-(b+c)\}-(a+b+c)\\
&=(a+b+c)(a-b-c)-(a+b+c)\\
&=(a+b+c)(a-b-c-1)
\end{aligned}$$

বিশ্লেষণ ঃ $=a^2-b^2-c^2-2bc$ এই অংশটুকু a^2-b^2 আকারে প্রকাশ করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা হল আর বাকি অংশ থেকে —কমন নেওয়া হল। ব্র্যাকেটে $(a+b+c)$ থাকল। এবার দেখ প্রথম অংশের একটি উৎপাদকও আবার $(a+b+c)$ অতএব এই $(a+b+c)$ কমন নেওয়া হল।

আলোচনা ঃ 17 ও 21 নম্বরের অঙ্ক দুটিও এক ধরনের।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে ব্র্যাকেটের অংশটুকু গুণ করে ভাঙ্গিয়ে দাও। এরপর সম্পূর্ণ রাশিটিকে দুটি বর্গের অন্তররূপে প্রকাশ করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

17 নম্বরের সমাধান ঃ

$$\begin{aligned}
&(x^2-1)(y^2-1)+4xy\\
&=x^2y^2-x^2-y^2+1+4xy\cdots\cdots \quad [(x^2-1)(y^2-1) \text{ অংশটি গুণ করে ভাঙ্গান হল।}]\\
&=x^2y^2+1+2xy-x^2-y^2+2xy \qquad [\ 4xy=2xy+2xy\ ]\\
&=(xy)^2+1^2+2.xy.1-(x^2+y^2-2xy)\\
&=(xy+1)^2-(x-y)^2\\
&=\{(xy+1)+(x-y)\}\{(xy+1)-(x-y)\}\\
&=(xy+1+x-y)(xy+1-x+y)
\end{aligned}$$

আলোচনা ঃ 3, 7, 10, 11 ও 16 নম্বর অঙ্ক এক ধরনের।

পদ্ধতি ঃ 3 নম্বর অঙ্কটি দেখ। রাশিটির পদগুলোকে x-এর power বা ঘাত অনুসারে সাজালে সেটি x-এর দ্বিঘাত রাশির আকার লাভ করে। এবার x বিহীন পদগুলি দেখ। পদগুলো নিয়ে আর একটি a-র দ্বিঘাত রাশি হয়, এই দ্বিঘাত রাশিটিকে মিডলটার্ম পদ্ধতিতে উৎপাদকে পরিণত কর। এবার সম্পূর্ণ রাশিটি x-এর

দ্বিঘাত রাশি যার x বিহীন পদটি দুটি রাশির উৎপাদক। এই আকারের উৎপাদক মিডলটার্ম পদ্ধতিতে তোমরা আগে যেমন করেছ সেভাবে এগিয়ে যাও।

3 নম্বরের সমাধান ঃ

$x^2-a^2+5x+a+6$

$=x^2+5x-a^2+a+6$ [x-এর ঘাত অনুসারে সাজান হল]

$=x^2+5x-(a^2-a-6)$ [x বিহীন পদগুলো থেকে — কমন নেওয়া হল]

$=x^2+5x-(a^2-3a+2a-6)$ [x বিহীন পদগুলোকে মিডলটার্ম পদ্ধতিতে ফেলা হচ্ছে]

$=x^2+5x-\{a(a-3)+2(a-3)\}$

$=x^2+5x-(a-3)(a+2)$ [এরপর x-এর দ্বিঘাত রাশির মিডলটার্ম পদ্ধতি প্রয়োগ হবে]

$=x^2+(a+2)x-(a-3)x-(a-3)(a+2)$

$=x(x+a+2)-(a-3)(x+a+2)$

$=(x+a+2)\{x-(a-3)\}$

$=(x+a+2)(x-a+3)$

আলোচনা ঃ 13 নম্বর অঙ্কটিতে x^2-1 কে $(x+1)(x-1)$ আকারে ভাঙ্গালে 4 নম্বর অঙ্কের মত আকৃতিটা হয়। 4 নম্বরের অঙ্কটি যে পদ্ধতির অঙ্ক তা তোমরা জান। খেয়াল রেখ 4টি উৎপাদকের মধ্যে দুটি দুটি করে এমনভাবে নিয়ে ভাঙ্গাবে যাতে একটি অংশে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ছোট উৎপাদকটি থাকে এবং অপর অংশতে বাকি দুটি থাকে।

13 নম্বরের সমাধান ঃ

$(x^2-1)(x+2)x-8$

$=(x+1)(x-1)(x+2)x-8$

$=\{(x+2)(x-1)\}\{(x+1)x\}-8$ [সবচেয়ে বড় $x+2$ এবং সবচেয়ে ছোট $x-1$]

$=(x^2-x+2x-2)(x^2+x)-8$

$=(x^2+x-2)(x^2+x)-8$

$=(a-2)a-8$ [$x^2+x=a$ ধরে]

$=a^2-2a-8$

$=a^2-4a+2a-8$

$=a(a-4)+2(a-4)$

রাফ গণনা
$1\times(-8)=-8$
a-র সহগ -2.
এখন $-8=-4\times2$
আবার $-4+2=-2$

$=(a-4)(a+2)$

$=(x^2+x-4)(x^2+x+2)$ [$a=x^2+x$ আবার বসান হল]

আলোচনা ঃ 5 ও 14 নম্বর অঙ্ক দুটি এক ধরনের। 14 নম্বরের অঙ্কে $-5a-5b$ এই অংশটুকুতে 5 কমন নিলে দাঁড়ায় $-5(a+b)$ অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাশিটি হয়—$(a+b)^2-5(a+b)+6$. এবার $a+b=x$ ধরলে x-এর দ্বিঘাত রাশি

হয়। এরপর মিডলটার্ম পদ্ধতিতে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে। 5 নম্বরের অঙ্কে $x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$ হয়। তাহলে রাশিটি দাঁড়ায় $(x+y)^2+(x+y)-6$. এবার $x+y=a$ ধরলে a-র দ্বিঘাত রাশি হয়। কাজেই মিডলটার্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

5 নম্বরের সমাধান ঃ

$=x^2+2xy+x-y^2+y-6$

$=x^2+2xy+y^2+x+y-6$

$=(x+y)^2+(x+y)-6$

$=a^2+a-6$ [$x+y=a$ ধরে]

$=a^2+3a-2a-6$

রাফ গণনা

$1\times(-6)=-6$

a-র সহগ $=1$

$-6=3\times(-2)$

আবার $3-2=1$

$=a(a+3)-2(a+3)$

$=(a+3)(a-2)$

$=(x+y+3)(x+y-2)$ [$a=x+y$ আবার বসান হল]

20 নম্বরের পদ্ধতি ঃ এখানে এক জায়গায় $a^2+\frac{1}{a^2}$ আছে আবার আর এক জায়গায় $a-\frac{1}{a}$ আছে। এখন $\frac{1}{a}$ কে b ধরলে $a^2+\frac{1}{a^2}=a^2+b^2$ এবং $a-\frac{1}{a}=a-b$, a^2+b^2 এর দুটি সূত্র আছে। $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$. আবার $a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$. এখানে প্রদত্ত রাশিতে $a-b$ আছে। কাজেই $a-b$ দিয়ে সূত্রটি অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রটি প্রয়োগ করতে হবে। এখন $(a-b)^2+2ab=\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+2a.\frac{1}{a}=\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+2$. ফলে প্রদত্ত রাশিটির পদগুলিতে $\left(a-\frac{1}{a}\right)^2$ $\left(a-\frac{1}{a}\right)$ এবং অখণ্ড সংখ্যা থাকবে। কাজেই $a-\frac{1}{a}=x$ ধরলে x এর একটি দ্বিঘাত রাশি হবে। এবার মিড্‌লটার্ম পদ্ধতিতে উৎপাদক নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ

$2\left(a^2+\frac{1}{a^2}\right)-\left(a-\frac{1}{a}\right)-7$

$=2\left\{\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+2a.\frac{1}{a}\right\}-\left(a-\frac{1}{a}\right)-7$

$=2\left\{\left(a-\frac{1}{a}\right)^2+2\right\}-\left(a-\frac{1}{a}\right)-7$

$=2(x^2+2)-x-7$ $\left[a-\frac{1}{x}=x \text{ ধরে}\right]$

$=2x^2+4-x-7$

রাফ গণনা

$2\times(-3)=-6$

x এর সহগ $=-1$

এখন $-6=-3\times2$

$=2x^2-x-3$

$=2x^2-3x+2x-3$

$=x(2x-3)+1(2x-3)$

$=(2x-3)(x+1)$ আবার $-3+2=-1$

$=\left\{2\left(a-\frac{1}{a}\right)-3\right\}\left\{a-\frac{1}{a}+1\right\}$

$=\left(2a-\frac{2}{a}-3\right)\left(a-\frac{1}{a}+1\right)$

$=\left(2a-3-\frac{2}{a}\right)\left(a+1-\frac{1}{a}\right)$

যে অঙ্কগুলো সমাধান করা হয়নি, সেগুলো তোমরা বাড়িতে কষবে। উত্তর মিলিয়ে নিও।

1. $(2-3t)(3+4t)$
2. $(x-y+z)(x-5y-z)$
4. $(x^2+2x-6)(x^2+2x-5)$
6. $(5x^2-2x+1)(x^2-2x+5)$
7. $(a-b-7)(a+b-3)$
8. $(x-p)(px-1)$
10. $(x-p+3q)(x+p-2q)$
11. $(x-a-2)(x+a+1)$
12. $(x-y-z)(x+y+z+1)$
14. $(a+b-3)(a+b-2)$
15. $(3+4x)(3-x)$
16. $(m-2n)(m-n+1)$
19. $(2-x)(6-x)$
21. $(ab+a-b+1)(ab-a+b+1)$

এবার টেস্ট পেপার থেকে কিছু ল.সা.গু. এবং গ.সা.গু. নিয়ে আলোচনা করা যাক। এগুলো তোমরা বাড়িতে কষবে।

ল.সা.গু. নির্ণয় কর ঃ

1. x^4-1, x^3-x^2-x+1, x^3+2x+1
2. x^3-2x+1, x^4-x^3, x^3+x^6
3. $4x(x^3-4)$, $2x^4+4x^3-16x^2$, $2x^2+8x+8$
4. $a^3-b^2-c^2+2bc$, $a^2-b^2+c^2-2ac$, $(a+b-c)^2$
5. $2x^3+x^2-x$, $6x^2+x-2$, $12x^3-x-6$
6. x^3+y^3, x^3-y^3, $x^4+x^2y^2+y^4$
7. $24+4x-4x^2$, $6x^4+48x$, $8x^4+32x^3+32x^2$
8. x^3-9x, $x^4+6x^3+9x^2$, $2x^3+2x^2-12x$
9. a^2+6a+8, a^2+5a+6, a^3+4a^2+4a+3
10. a^3-1, a^4+a^2+1, a^2-2a+1.

আলোচনা ঃ পদ্ধতি নতুন করে আলোচনা করার কিছুই নাই। ১৬ মে-র সংখ্যাটি ভাল করে দেখ। সেখানে শুধু পদ্ধতি আলোচনা করা হয়নি, কিভাবে সহজে

অঙ্কগুলো কষা যায় তাও আলোচনা করা হয়েছে। রাশিগুলোকে উৎপাদকে পরিণত করে কোন সহজ উপায়ে তার থেকে ল.সা.গু.-র জন্য উৎপাদকগুলো বাছা যায় তা আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এগুলো তোমরা কষবে। উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও।

উত্তর ঃ

1. $(x^2+1)(x^2-1)^2$
2. $x^3(x^3+1)(x-1)^2$
3. $4x^2(x+2)^2(x+4)(x-2)$
4. $(a+b-c)^2(a-b+c)(a-b-c)$
5. $x(x+1)(2x-1)(3x+2)(4x-3)$
6. x^6-y^6
7. $24x^2(x+2)^2(3-x)(x^2-2x+4)$
8. $2x^2(x+3)^2(x+4)(x-3)$
9. $(a+4)(a+3)(a+2)(a^2+a+1)$
10. $(a-1)^2(a^2+a+1)(a^2-a+1)$

গ সা. গু. নির্ণয় কর ঃ

1. a^3-4a, $-a^2+5a+6$, $a^4-a^3-2a^2$
2. x^3+x^2+x+1, x^6+1, x^4+2x^2+1
3. x^3+8, x^3-2x^2-5x+6, x^3+4x^2+8x+8
4. x^2+3x+2, x^3-4x, $2x^4+2x^3-12x^2$
5. $3x^3-7x^2-18x-8$ এবং $2x^3-3x^2-17x-12$
6. $8x^4+27x$, $2x^4+11x^3+12x^2$, $8x^3-4x^2-18x+9$
7. $2x^3+7x^2+2x-3$, $3x^3+12x^2+9x$, $2x^3-x^2-2x+1$
8. x^2-x-2, x^3+1, $(x+1)^2$
9. $2x^5-10x^3-4x^2$, $2x^4-2x^3-12x^2$
10. $3a(a^2-a-6)$ $6a^2(a^2+4a+4)$, $9a^3-18a^2+72a$

আলোচনা ঃ ১ মে সংখ্যায় পদ্ধতির বিশদ আলোচনা হয়েছে। উৎপাদকগুলো বেছে নেওয়ার সহজ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। ১ মে-র সংখ্যাটি ভাল করে দেখে নাও। তারপর অঙ্কগুলো কষে ফেল।

ল.সা.গু., গ.সা.গু রিভিশন দিতে গিয়ে কিন্তু একটা উপরি লাভ হচ্ছে। কারণ ল.সা.গু. বা গ.সা.গু. করার জন্য প্রথমে প্রদত্ত রাশিগুলোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে। কাজেই উৎপাদকে বিশ্লেষণও বেশি পরিমাণে প্র্যাকটিস হচ্ছে। এটাই উপরি লাভ। গ.সা.গু. করার সময় আর একটি কথা মনোরাখবে। ধর, তুমি কষ্ট করে সমস্ত রাশিগুলোর উৎপাদক বের করলে কিন্তু একটিও সাধারণ উৎপাদক পাওয়া গেল না। তাহলে কি গ.সা.গু হবে না? নিশ্চয় হবে। তখন নির্ণেয় গ.সা.গু. 1 (এক) হবে। কারণ যে কোন রাশিকে 1 দিয়ে গুণ করলে রাশিটির কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক রাশির একটি উৎপাদক 1 হবেই।

যে রাশিগুলোর গ.সা.গু. তোমাদের কষতে দেওয়া হল তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে vanishing method প্রয়োগ করতে হবে। কাজেই নবম দশমের যে সংখ্যায়

vanishing method আলোচনা করা হয়েছে সেই সংখ্যাটি ভাল করে দেখে নিও আবার। শুধু 6 নম্বরের একটি রাশির উৎপাদক এখানে আলোচনা করা যাক। কারণ এটির একটু বৈচিত্র্য আছে। রাশিটি হল—

$$8x^3-4x^2-18x+9.$$

রাশিটিতে x-এর বিভিন্ন ঘাতযুক্ত পদ আছে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে x-এর মান কত হলে রাশিটি শূন্য হয় তা প্রথমে দেখতে হয়। কিন্তু রাশিটিকে যদি x-এর কোন একটি গুণিতকের ($2x$, $3x$, $4x$ ইত্যাদি) বিভিন্ন ঘাতযুক্ত পদে প্রকাশ করা যায় তখন সেভাবে প্রকাশ করে তারপর vanishing method প্রয়োগ করা যায়। যেমন এক্ষেত্রে

$$8x^3-4x^2-18x+9$$

$$=(2x)^3-(2x)^2-9.2x+9 \qquad [\ 2x\text{-এর বিভিন্ন ঘাতে প্রকাশ করা হল}\ ]$$

$$=a^3-a^2-9a+9 \qquad [\ 2x=a \text{ ধরা হল}\ ]$$

রাশিটি a-র বিভিন্ন ঘাতযুক্ত পদ দিয়ে তৈরি হল। কাজেই vanishing method এখানে প্রয়োগ করতে হবে। এখানে $a=1$ হলে রাশিটি 0 হবে।

$a-1$ একটি উৎপাদক। এবারে সাজিয়ে বাকি কাজটি করতে হবে।

$$a^3-a^2-9a+9$$
$$=a^2(a-1)-9(a-1)$$
$$=(a-1)(a^2-9)$$
$$=(a-1)(a^2-3^2)$$
$$=(a-1)(a+3)(a-3)$$
$$=(2x-1)(2x+3)(2x-3)$$

প্রশ্নগুলোর উত্তর ঃ

1. a. 2. x^2+1. 3. $x+2$. 4. 1. 5. $(x+1)(x+4)$. 6, $2x+3$ 7. $x+1$. 8. $x+1$. 9. $2x^2(x+2)$. 10 $3a$.

জ্যামিতি

উপপাদ্যগুলো এর মধ্যে নিশ্চয় তৈরি হয়ে গেছে। টেস্ট পেপার-এ তোমরা এ পর্যন্ত যে সব উপপাদ্য শিখেছ সেগুলোকে ভিত্তি করে extra বিশেষ নেই। কাজেই তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই থেকে extra সমাধান করবে। এগুলো সমাধানের সময় চিন্তাধারার পাঁচটি উপাদানকে মনে রেখ। সেগুলো হল—

1. যা প্রমাণ করবে তা বারবার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।

2. স্বীকারে কি কি তথ্য দেওয়া আছে সেগুলো দেখে নিতে হবে।

3. এবার প্রয়োজনীয় তথ্যটি প্রমাণের জন্য এক, দুই, তিন করে কতকগুলো সাধারণ তথ্য চিন্তা করতে হবে।

4. এরপর 3 নম্বরে যেসব তথ্যগুলো চিন্তা করলে সেগুলোর মধ্যে কোনটি স্বীকারের মধ্যে পাওয়া যায় তা দেখতে হবে।

5. এবার এই তথ্যগুলো কাজে

1. গত কয়েকটি সংখ্যার গণিতাংশের ভুল সংশোধন এখানে দেওয়া হল।

চতুর্থ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৮৫	ত্রুটী অনুশীলনের জন্য	সংশোধন
	$4x^2+3y^2-z^2-4xy+4yz$	$+3y^2$-এর জায়গায় $-3y^2$ হবে
পঞ্চম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৮৬	অনুশীলনের জন্য (1)-এর উত্তর	$2(9x-7a)(8a-7x)$
ষষ্ঠ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭২	জটিলতা বৃদ্ধিতে যে অঙ্কটি আছে সেটি হচ্ছে	$+2b^2$-এর জায়গায়
	$x^2+bx-a^2+3ab+2b^2$	$-2b^2$ হবে
	ফলে এর সমাধানেও ভুল আছে	

লাগিয়ে প্রমাণ করার দিকে এগোতে হবে।

পরবর্তী পাঠ আরম্ভ করার আগে অন্তত পক্ষে 15টি **extra** সমাধান করবে।

সমাধান ঃ

প্রথম লাইনে	$+2b^2$-এর জায়গায়	$-2b^2$
দ্বিতীয়	$-2b^2$	$+2b^2$
তৃতীয়	$-2b^2$	$+2b^2$

দেখ প্রথম লাইনে $-2b^2$ থাকলে দ্বিতীয় লাইনে $-$ কমন নেওয়ার পর সেটি $+2b^2$ হয়ে গেল। ফলে তৃতীয় লাইনেও সেটি $+2b^2$ থাকবে। মাঝের পদ $-3ab$কে আমরা ভাঙ্গিয়েছি $-2ab$ $-ab$ দিয়ে। এখন $-2\times(-1)=+2$ হয়। -2 হয়ই না। কাজেই $-2b^2$ হলে ভাঙ্গানটিও ভুল হয়। কিন্তু $+2b^2$ হলে ঠিক হয়। ছাপার একটি চিহ্ন ভুলের জন্য পুরো আঁকাটাই ভুল হয়ে যায়। আর ঐ তিনটি স্টেপএ $2b^2$ চিহ্নটি ঠিকমত বসালে অঙ্কটি ঠিক হয়ে যায়। কাজেই খুব সাবধান। আমার সবচেয়ে আনন্দ লাগল যে তোমরা নবম দশম থেকে অঙ্ক খুবই ভাল শিখেছ যার জন্য ভুলটা সহজেই বের করে ফেললে। যারা ভুলটা বুঝতে পারে তারা অঙ্ক সবচেয়ে ভাল বোঝে, ভাল পারে।

পরিমিতি

টেস্ট পেপার থেকে পরিমিতির জন্য গত সংখ্যায় কতকগুলো অঙ্ক আমরা তুলেছিলাম। কিছু অঙ্কের আলোচনা আমরা করেছিলাম। বাকিগুলো তোমাদের কষার কথা। যারা সব কটি পেরেছ তারা উত্তর মিলিয়ে নিও। হয়ত কেউ কেউ সব পারনি। তাই আজ আর কয়েকটি প্রশ্ন বেছে নিয়ে আলোচনা করব। বাকি অঙ্কগুলো মার্চ থেকে মে পর্যন্ত সংখ্যাগুলো দেখে নিলেই পারবে।

4 নম্বর প্রশ্ন ঃ একটি ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 800 সে.মি., 780 সে. মি. এবং 500 সে মি. হলে ঐ ক্ষেত্রটির সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর পরিমাপ কত হবে ?

চিত্রগত ধারণা ঃ একটি ত্রিভুজ আছে যার বাহুগুলো অসমান। এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান একটি বর্গক্ষেত্র আছে।

পদ্ধতি ঃ ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে a, b, c ধরে $s=\frac{a+b+c}{2}$ এই সূত্র থেকে অর্ধপরিসীমা s বের কর। এবার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ এই সূত্র থেকে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের কর। এবার শর্ত হল একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ঐ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান। অর্থাৎ সরাসরি বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পেলে। এরপর বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহু)^2 এই সূত্র প্রয়োগ করে বাহু = কত সমাধান কর।

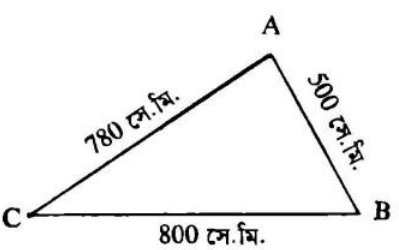

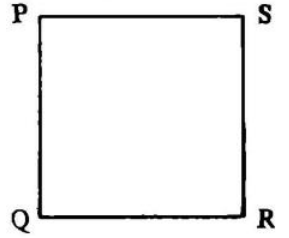

মনে করি A B C ত্রিভুজের বাহুগুলো যথাক্রমে $a=800$ সে.মি.
$b=780$ সে.মি.
$c=500$ সে.মি.

ত্রিভুজটির অর্ধ পরিসীমা $s=\frac{a+b+c}{2}$

$=\frac{800+780+500}{2}$ সে.মি.

$=\frac{2080}{2}$ সে.মি.

$=1040$ সে মি.

ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল

$=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$=\sqrt{1040(1040-800)(1040-780)(1040-500)}$ বর্গ সে.মি.

$=\sqrt{1040\times240\times260\times540}$ বর্গ সে.মি.

$=\sqrt{104\times24\times26\times54\times10000}$ বর্গ সে মি.

$=\sqrt{13\times8\times4\times6\times13\times2\times6\times9\times100^2}$ বর্গ সে.মি.

$=\sqrt{13^2\times2^3\times6^2\times3^2\times100^2\times16}$ বর্গ সে.মি.

$=13\times2\times6\times3\times100\times4$ বর্গ সে.মি.

$=187200$ বর্গ সে.মি.

প্রশ্ন অনুসারে একটি বর্গক্ষেত্রের (PQRS) ক্ষেত্রফল $=187200$ বর্গ সে.মি.।
আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহু)^2

(বাহু)$^2=187200$

বাহু $=\sqrt{187200}$ সে.মি.

$=432{\cdot}6$ সে.মি. (প্রায়)

উত্তর ঃ বর্গক্ষেত্রটির বাহুর দৈর্ঘ্য 432·6 সে মি. ।

5 নম্বর প্রশ্ন ঃ 120 মিটার দীর্ঘ ও 80 মিটার প্রশস্ত একটি বাগানের ভিতরে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সমান্তরালে 2 মিটার চওড়া দুটি রাস্তা আছে। প্রতি বর্গমিটার 1 টাকা 25 পয়সা হিসাবে ওই রাস্তা পাকা করতে কত খরচ পড়বে ?

চিত্রগত ধারণা ঃ একটি বাগান আছে। বাগানটি আয়তাকার। বাগানটির মধ্যে দৈর্ঘ্য বরাবর 2 মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। অর্থাৎ রাস্তাটির দৈর্ঘ্য বাগানের দৈর্ঘ্যের সমান এবং প্রস্থ 2 মিটার আর একটি রাস্তা প্রস্থ বরাবর আছে। অর্থাৎ এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য বাগানের প্রস্থের সমান। এই রাস্তার প্রস্থও 2 মিটার। তাহলে এই রাস্তা দুটি মাঝখানে পরস্পরকে ছেদ করবে। এই অংশটুকু বর্গাকৃতি হবে এবং এর বাহু রাস্তার চওড়ার সমান অর্থাৎ 2 মিটার।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে রাস্তা দুটির ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির দৈর্ঘ্য, বাগানটির দৈর্ঘ্যের সমান এবং প্রস্থ 2 মিটার। এবার ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ এই সূত্রের সাহায্যে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল বের কর। আবার প্রস্থ বরাবর রাস্তাটির দৈর্ঘ্য বাগানের প্রস্থের সমান এবং প্রস্থ 2 মিটার। ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ এই সূত্রের সাহায্যে এই রাস্তাটির ক্ষেত্রফলও বের কর। রাস্তা দুটি মাঝখানে যেখানে ছেদ করেছে সেই অংশটুকু বর্গাকৃতি। এই বর্গক্ষেত্রের বাহু 2 মিটার। অতএব ক্ষেত্রফল = (বাহু)^2 এই সূত্র থেকে ঐ অংশটুকুর ক্ষেত্রফল বের কর। এবার রাস্তা দুটির ক্ষেত্রফল যোগ কর। এই যোগফলের মধ্যে মাঝের বর্গাকার ক্ষেত্রটি দু বার ধরা হয়েছে। অতএব একবার কমাতে হবে। অর্থাৎ বিয়োগ করতে হবে। এবার এই ক্ষেত্রফলকে একক ক্ষেত্রফলের খরচ দিয়ে গুণ করলে মোট খরচ পাওয়া যাবে।

সমাধান ঃ

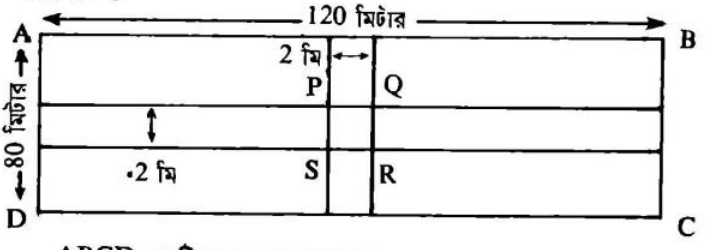

ABCD একটি আয়তাকার বাগান।

বাগানটির দৈর্ঘ্য 120 মিটার এবং প্রস্থ 80 মিটার।

বাগানটির ভেতরে দৈর্ঘ্য বরাবর এবং প্রস্থ বরাবর দুটি 2 মিটার চওড়া রাস্তা আছে। এই রাস্তা দুটি আয়তাকার।

দৈর্ঘ্য বরাবর রাস্তাটির দৈর্ঘ্য = 120 মিটার

এবং প্রস্থ = 2 মিটার

এই রাস্তাটির ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

= 120 × 2 বর্গমিটার

= 240 বর্গমিটার

প্রস্থ বরাবর রাস্তাটির দৈর্ঘ্য = 80 মিটার

এবং প্রস্থ = 2 মিটার

এই রাস্তাটির ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

= 80 × 2 বর্গমিটার

= 160 বর্গমিটার

এই দুটি ক্ষেত্রফলের সমষ্টি = (240 + 160) বর্গমিটার

= 400 বর্গমিটার

এই রাস্তা দুটি PQRS অঞ্চলে পরস্পর ছেদ করেছে।

এই 400 বর্গমিটারের মধ্যে PQRS দুবার ধরা হয়েছে। অতএব একবার বাদ দিতে হবে।

এখন PQRS একটি বর্গক্ষেত্র যার বাহুর দৈর্ঘ্য = 2 মিটার।

PQRS বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল = (বাহু)^2 = 2^2 = 4 বর্গমিটার

যে পরিমাণ রাস্তা পাকা করা হবে তার ক্ষেত্রফল = (400 − 4) বর্গমিটার

= 396 বর্গমিটার

1 বর্গমিটার পাকা করতে খরচ = 1 টাকা 25 পয়সা

= 125 পয়সা

396 = 125 × 396 পয়সা

= 49500 পয়সা

= 495 টাকা

উত্তর ঃ রাস্তা দুটি পাকা করতে 495 টাকা খরচ হবে।

10 নম্বর প্রশ্ন ঃ একটি সমবাহু ত্রিভুজ ও একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত $\sqrt{3} : 2$. বর্গক্ষেত্রটির কর্ণ 60 সে.মি. হলে সমবাহু ত্রিভুজটির পরিসীমা কত ?

চিন্তাগত ধারণা ঃ একটি সমবাহু ত্রিভুজ ও একটি বর্গক্ষেত্র আছে। এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত $\sqrt{3}$ 2। যেহেতু $2 > \sqrt{3}$, অতএব বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফলের থেকে বড়। বর্গক্ষেত্রটির কর্ণ 60 সে.মি.।

সমাধান ঃ বর্গক্ষেত্রটির কর্ণ এবং আর যে কোন দুটি সন্নিহিত বাহু নিয়ে একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ গঠিত হবে। বর্গক্ষেত্রটির বাহু a সে.মি. ধরে এই সমকোণী ত্রিভুজে (ভূমি)^2 + (লম্ব)^2 = (অতিভুজ)^2 সূত্রটি প্রয়োগ কর। ভূমির দৈর্ঘ্য = লম্বের দৈর্ঘ্য = বর্গক্ষেত্রটির বাহুর দৈর্ঘ্য = a সে.মি.। ফলে a-র মান অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রটির বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে যাবে। এবার বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (বাহু)^2 এই সূত্র থেকে বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবে। এখন সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{\sqrt{3}}{4}$(বাহু)^2. অতএব সমবাহু ত্রিভুজটির বাহু b সে.মি. ধরে তার ক্ষেত্রফল বের কর। শর্ত অনুসারে $\frac{\text{সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল}}{\text{বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল}}$ = $\frac{\sqrt{3}}{2}$. এই শর্ত থেকে b-এর মান পেয়ে যাবে। এবার সমবাহু ত্রিভুজটির পরিসীমা = 3 × বাহু = $3b$. এখানে b-এর মান বসালে পরিসীমা বেরিয়ে যাবে।

সমাধান ঃ

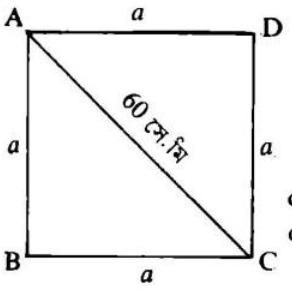

ABCD বর্গক্ষেত্রটির $\overline{AC}$ কর্ণ। $\overline{AC}=60$ সে.মি

মনে করি বাহুগুলো প্রত্যেকটি a সে.মি.

এখন, ABC সমকোণী ত্রিভুজের $\overline{AC}$ অতিভুজ।

আমরা জানি,

$(\text{ভূমি})^2+(\text{লম্ব})^2=(\text{অতিভুজ})^2$

$(\overline{BC})^2+(\overline{AB})^2=(\overline{AC})^2$

or, $a^2+a^2=60^2$

or, $2a^2=60^2=3600$

$a^2=\frac{3600}{2}=1800$

এখন বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল$=(\text{বাহু})^2$

$=a^2=1800$ বর্গ সে.মি.

PQR একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

মনে করি, প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য$=b$ সে.মি.

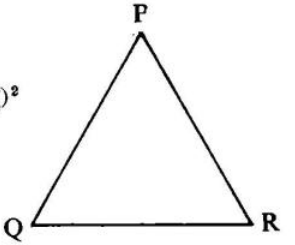

আমরা জানি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল$=\frac{\sqrt{3}}{4}(\text{বাহু})^2$

PQR সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল$=\frac{\sqrt{3}}{4}b^2$

প্রশ্ন অনুসারে $\frac{\text{সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল}}{\text{বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

or, $\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}b^2}{1800}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

or, $\frac{\sqrt{3}b^2}{1800\times 4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

or, $\frac{b^2}{7200}=\frac{1}{2}$

or, $b^2=\frac{7200}{2}=3600$

$\sqrt{3600}=\sqrt{60^2}$

$=60$ সে.মি.

এখন সমবাহু ত্রিভুজটির পরিসীমা$=3\times$ বাহু

$=3b=3\times 60$ সে.মি.

$=180$ সে.মি.

উত্তর ঃ সমবাহু ত্রিভুজটির পরিসীমা 180 সে.মি.।

জুনের দুটি সংখ্যায় যে প্রশ্নগুলো সমাধান করা হয়নি সেগুলোর উত্তর মিলিয়ে নাও।

3. 15 সে.মি. 6. 736 বর্গ মি. 7. 2·4 সে.মি. 8. 864 বর্গ মি.
11. 2100 বর্গ মি. 12. 7·5 মি., 2·5 মি., 1·5 মি.।

দীপক সেনশর্মা

জীবন-বিজ্ঞান

পুনরনুশীলন

আগের দিন বিস্তৃতভাবে বলেছি, পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে গেলে এখন থেকেই কোন কোন দিকে লক্ষ্য রেখে পড়াশুনা করা উচিত এবং উত্তর লেখার ধরণটা কেমন হওয়া দরকার। আজ কিছু প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় তোমাদের কিছু বস্তুমুখী প্রশ্ন (প্রতিটি ১ বা ২ নম্বর করে, মোট ২০ নম্বর), একটি বড় প্রশ্ন (১৪ নম্বর) ও আটটি মাঝারি প্রশ্ন (প্রতিটি ৭ নম্বর করে) থাকে। মোট ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয়। বাকি ১০ নম্বর থাকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। আগের দিন বলেছি, বড় ও মাঝারি প্রশ্নগুলোও হয় তিনটি বা চারটি ছোট ছোট প্রশ্নের সমষ্টি। তাই, ১ বা ২ নম্বরের তথাকথিত বস্তুমুখী প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর বরাদ্দ থাকলেও আসলে সারা প্রশ্নপত্রেই এইরকম অসংখ্য প্রশ্ন ছড়িয়ে থাকে। তাই প্রথমে এই ধরনের কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি। তবে খেয়াল রেখ, তোমাদের পাঠ্য বিষয়ের প্রায় প্রতিটি পংক্তি থেকেই বস্তুমুখী প্রশ্ন আসা সম্ভব। এখানে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা হবে সেগুলোই কিন্তু সব নয়।

এর মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যে ছোট ছোট প্রশ্নগুলো তোমাদের দিয়েছি, সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে তৈরি করে নিয়েছ। এখন যে প্রশ্নগুলো বলব, তার বেশিরভাগই বিভিন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও এই বছরের **Test paper** থেকে নেওয়া। এদের মধ্যে দুয়েকটি প্রশ্ন একেবারেই সিলেবাস বহির্ভূত ; সেগুলোর পাশে তারকাচিহ্ন (*) দেওয়া আছে। সবগুলো প্রশ্নেরই নম্বর ১ করে। যেগুলোর নম্বর তার চেয়ে বেশি, সেগুলোর পাশে নম্বর দেওয়া থাকল। কয়েকটি প্রশ্নের ভাষা একটু বিভ্রান্তিকর কিন্তু সে ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি তোমরা হতে পার, তাই প্রশ্নগুলো ঠিক যেমন এসেছে, সেই ভাষাতেই রেখেছি। একই কারণে, কিছু প্রশ্নে সাধুভাষা এবং কিছু প্রশ্নে চলিত ভাষা দেখতে পাবে। তবে উত্তরগুলো দেব চলিত ভাষায়।

তোমাদের পড়াশুনা এবং ব্যক্তিগত জ্ঞান কতদূর হয়েছে, তা যাতে সহজে পরখ করতে পার, (এখন ত বটেই, দরকারমত ভবিষ্যতেও), সেই জন্য প্রশ্নগুলো আগে এক জায়গায় দিয়ে দেওয়া হল। উত্তর-গুলো আছে তার পরে। না হলে, প্রশ্ন দেখতে গেলে উত্তরে চোখ পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

এবার প্রশ্নগুলো দেখে নাও।

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য

১. কোষস্থিত কোন সুনির্দিষ্ট অঙ্গাণু (Organalle)-র মধ্যে শ্বসন কার্য সম্পন্ন হয় ?

২. একটি প্রাণীর নাম কর যাহা জল ও বায়ু উভয় পরিবেশেই শ্বাসকার্য করিতে পারে।

৩. কোন উদ্ভিদে শ্বাসমূল পাওয়া যায় ?

৪. যে শ্বসন পদ্ধতিতে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, তাহাকে কি বলে ?

৫. কোন পদ্ধতিতে আলোকশক্তি খাদ্যের ভেতর স্থিতিশক্তিরূপে আবদ্ধ হয় ?

৬. কোন প্রকার উদ্ভিদকলায় সালোক-সংশ্লেষ সংঘটিত হয় ?

৭. দহন ও শ্বসনের মধ্যে দুইটি প্রধান পার্থক্য কী কী ? (২)

৮. ফটোলিসিস কী ?

৯. পার্থক্য লেখ ঃ
অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসন। (২)

১০. মৃত্তিকামধ্যস্থ উদ্ভিদমূলে সালোক-সংশ্লেষ হয় না কেন ?

১১. জীবদেহে শ্বাসক্রিয়া কোথায় হয় ?

১২. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে 'অঙ্গার আত্তীকরণ' বলা হয় কেন ? (২)

১৩. 'এনার্জি কারেন্সি' কী ?

১৪. NADP-র সম্পূর্ণ নাম কী ?

১৫. একটি প্রাণীর নাম কর যার অবাত শ্বসন হয়।

১৬. ক্লোরোফিলের উপাদান দুইটির নাম লিখ।

১৭. ভেলামেন কী ? ইহার কাজ কী ? (২)

১৮. সালোকসংশ্লেষের বহিঃশর্তগুলো কী কী ?

১৯. তিমি ও কেঁচোর শ্বাসঅঙ্গের নাম লেখ।

২০. অ্যালভিওলাস কোন অঙ্গে দেখা যায় ?

২১. শ্বাসহার কাকে বলে ?

২২. বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন কর ঃ

ক. বাতাস হইতে রক্তে O_2-এর স্থানান্তর ঘটে (ক্লোমশাখানালীতে, অ্যালভিওলাইতে, শ্বাসনালীতে)।

খ. ব্যাঙাচির দেহে গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে (মুখবিবরের মাধ্যমে, ফুলকার মাধ্যমে, ত্বকের মাধ্যমে)।

গ অবাত শ্বসনে উৎপন্ন হয় (কোহল গ্লুকোজ, O_2)।

ঘ. অস্থায়ী পদার্থ অক্সিহিমোগ্লোবিন O_2 পরিত্যাগ করে (রক্তে, শিরায়, দেহকোষে, ফুসফুসে)।

২৩. কোন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ নিজদেহে শক্তি আবদ্ধ করে ?

২৪. সূর্যালোকের প্রায় কত শতাংশ সালোকসংশ্লেষে ধরা পড়ে ?

২৫. ইস্ট (yeast) সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না কেন ?

*২৬. সালোকসংশ্লেষের কোন দশায় জল বিশ্লিষ্ট হয়

২৭. সালোকসংশ্লেষের কোন দশায় শর্করা সংশ্লেষিত হয়

২৮. কোন মৌলের অভাবে ক্লোরোফিল প্রস্তুত হয় না ?

২৯. ইথাইল অ্যালকোহলের সংকেত কী ?

৩০. সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ

ক. শ্বসনের সময় গাছ ত্যাগ করে (CO_2, O_2, N_2)।

খ. পাইরুভিক অ্যাসিড যে প্রক্রিয়ার সর্বশেষ উৎপাদন, তাহা (সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র, কেলভিন চক্র, গ্লাইকোলিসিস, সালোকবিশ্লেষণ)।

৩১. সালোকসংশ্লেষে শক্তির উৎস কী ?

৩২. অবাত ও সবাত শ্বসন—এই দুয়েরই সাধারণ (common) দশাটি কী ?

৩৩. একটি জলজ প্রাণীর শ্বাসঅঙ্গের নাম কর।

৩৪. কোষের একটি অঙ্গানুর নাম কর যাহা সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে।

৩৫. শ্বসনে সাধারণত কী জাতীয় খাদ্য ব্যবহৃত হয় ?

৩৬. এমন একটি গাছের নাম কর যার

দেহে সালোকসংশ্লেষ হয় না।

৩৭. শ্বসন ও শ্বাসকার্যের মধ্যে পার্থক্য কী ?

৩৮ অবাত শ্বসন ও কোহল সন্ধানের মধ্যে একটি পার্থক্য লেখ।

৩৯. সালোকসংশ্লেষে মেসোফিল কলার গুরুত্ব কী ?

৪০. ঘটপত্রী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কী ?

৪১. কোষের কোন কোন অংশে শ্বাসক্রিয়ার বিক্রিয়া ঘটে ?

৪২. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস কী ?

*৪৩. মাইটোকনড্রিয়ার অভ্যন্তরের ভাঁজগুলোকে কী বলে ?

৪৪. চিংড়ির শ্বাসকণাকে কী বলে ?

৪৫. গ্লাইকোলিসিস কাহাকে বলে ?

৪৬. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উপজাত বস্তু কী ?

৪৭. ফটোলাইসিস কোথায় হয় ?

৪৮. শক্তিমুক্ত করা ছাড়া শ্বসনের একটি কাজ উল্লেখ কর।

৪৯. কোন উদ্ভিদের কাণ্ডে সালোকসংশ্লেষ ঘটে ?

৫০. শ্বসনের মূল উদ্দেশ্য কী ?

৫১. ATP-র সম্পূর্ণ নাম কী ?

পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক

১. ভিটামিন 'A'-র উৎস কী ? ইহার অভাবে কোন রোগ হয় ?

২. কোন ভিটামিনের অভাবে মানুষ রাতকানা হয় ?

৩. মানবদেহে কোন ভিটামিন সংশ্লেষিত হইতে পারে ?

৪ BMR-এর সম্পূর্ণ নামটি কী ?

৫. উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন দুইটি স্বল্প মৌলিক উপাদানের (trace elements) নাম কর।

৬. পার্থক্য লেখ—
   ক. পরিপাক ও আত্তীকরণ
   খ. উপচিতি ও অপচিতি
   গ. পরজীবী ও মৃতজীবী।
   (২×৩)

৭. কোন ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি রোগ হয় ?

৮. পেরিস্টলসিস কাহাকে বলে ?

*৯. খাদ্য গ্রহণের পূর্বে মানুষের রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ কত ?

১০. টিটানি রোগ কেন হয় ?

১১. একটি মিথোজীবী উদ্ভিদের নাম কর।

১২. পরভোজী উদ্ভিদের দুটি উদাহরণ দাও।

১৩. ভিটামিন B_1-এর অভাবে কোন রোগ হয়।

১৪. শরীরের কোন অঙ্গে ভিলাই থাকে।

*১৫. পার্থক্য লেখ—সহ এনজাইম ও অ্যাপোএনজাইম। (২)

১৬. প্রোটিন ও স্নেহপদার্থের মধ্যে দুইটি পার্থক্য লেখ। (২)

১৭. ক্লোরোসিস রোগের কারণ কী ?

১৮. ভিটামিন B_1-এর অপর নাম কী ?

১৯. সুষমখাদ্য বলতে কী বোঝ ?

২০. পার্থক্য লেখ—
   ক. পরজীবী ও পরাশ্রয়ী।
   খ. মাইক্রোএলিমেন্টস ও ম্যাক্রোএলিমেন্টস।
   গ. অন্তঃকোষীয় ও বহিঃকোষীয় পরিপাক। (২×৩)

২১. বিপাকীয় জল কাকে বলে ?

২২. দুটি উদ্ভিদের নাম কর যারা সরাসরি প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ করে।

২৩. সুষম খাদ্যের একটি উদাহরণ দাও।

২৪. ভিটামিন 'D' ছাড়া মানবদেহে আর কোন ভিটামিন সংশ্লেষিত হয় ?

২৫. মানবদেহে প্রোটিনের এত গুরুত্ব কেন ?
২৬. একটি জৈব অনুঘটকের নাম লেখ।
২৭. দুটি প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের নাম লেখ।
২৮. দেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যে খাদ্য-রস শোষিত হইয়া প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে গৃহীত হওয়ার নাম কী ?
২৯. স্নেহপদার্থ কোন কোন মৌল লইয়া গঠিত ?
৩০. K-ভিটামিন কোন পদার্থে দ্রাব্য (জলে, স্নেহপদার্থে) ?
৩১. কার্বন ও বোরোন—ইহাদের কোনটি মাইক্রোএলিমেণ্ট ?
৩২. আন্তঃকোষীয় পরিপাক হয় কোন প্রাণীর ?
৩৩. উৎসেচকের দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৩৪. মুখের লালায় কোন উৎসেচক থাকে ?
৩৫. আয়োডিনের অভাবে কোন হরমোন ক্ষরিত হয় না ?
৩৬. সবুজ গাছের দ্বারা সংগৃহীত নাইট্রোজেনের উৎস কী ?
৩৭. স্বভোজী কাহাদের বলে ?
৩৮. দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কেন ?
৩৯. দুটি পরজীবী উদ্ভিদের নাম লেখ।
৪০. ভিটামিন 'A'-র অপর নাম কী ?
৪১. আলু থেকে আমরা কী ধরনের খাদ্য পাই ?
৪২. BMR কাকে বলে ?
৪৩. খাদ্যে নিয়াসিনঅ্যামাইডের অভাব ঘটিলে কী রোগ হয় ?
৪৪. সহবাসী উদ্ভিদ কাহাদের বলে ?
৪৫. রেটিনল ও ক্যালসিফেরল কোন জাতীয় ভিটামিন ?
৪৬. ভিটামিন ডি-র রাসায়নিক নাম কী ?
৪৭. অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ও ফাইলো-কুইনোন কোন জাতীয় ভিটামিন ?

রক্ত ও সংবহন

১. রক্ত কী জাতীয় কলা ? (১)
২. পার্থক্য লেখ—
ক. জাইলেম ও ফ্লোয়েম।
খ. হিমোগ্লোবিন ও হিমোসায়ানিন।
গ. আস্রবণ ও ব্যাপন। (২×৩)
৩ কোন কলার ভিতর দিয়া মূল হইতে পাতায় জল যায় ?
৪. প্লাজমা ব্যতীত স্তন্যপায়ীর রক্তের অপর যে কোন দুইটি উপাদানের নাম কর।
৫. যে কলার মাধ্যমে উদ্ভিদের খাদ্য সংবহন (translocation of food) হয়, সেই কলার নাম লেখ।
৬. থ্রম্বোসাইটের কাজ কী ?
৭. সিরাম কী ?
৮. মানুষের তরল কলার নাম কী ?
৯. রক্তে শতকরা কত ভাগ হিমোগ্লোবিন থাকে ?
১০. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর—
শ্বেতকণিকার প্রধান কার্য (লোহিতকণিকা প্রস্তুত করা, ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করা, তাপ সরবরাহ করা, রক্তচঞ্চন করা)।
১১. নিউক্লিয়াসবিহীন একটি প্রাণী-কোষের নাম লেখ।
১২. চিত্র অঙ্কন কর—একটি শ্বেতরক্ত-কণিকা ; মানুষের একটি লোহিত-রক্তকণিকা। (২×২)
১৩. ফাইব্রিন কী ?
১৪. পার্থক্য লেখ—
ক. রক্তরস ও রক্তকণিকা (২)

১৫. রসের উৎস্রোত কাকে বলে ?
১৬. প্লাজমার কাজ কী ?
১৭. অণুচক্রিকা কী ?
১৮. হেপারিন কী ?
১৯. কোন বৈশিষ্ট্য দেখিয়া স্তন্যপায়ীর লোহিত রক্তকণিকা চেনা যায় ?
২০. আমাদের দেহে কোন প্রকার শ্বেত-কণিকা অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করে ?

১. হ্যাঁ অথবা না লেখ—
ক. তিমি মাছ ফুসফুসের সাহায্যে এবং কৈ মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
খ. অর্কিড একপ্রকার পরভোজী উদ্ভিদ।
গ. মানুষের লোহিত রক্তকণিকা অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন হয়।

২. সঠিক উত্তরে এই চিহ্ন (√) বসাও—
ক. অবাতশ্বসনে লাগে (অক্সিজেন / নাইট্রোজেন / কার্বন-ডাই-অক্সাইড / কিছুই না।)
খ. কেঁচো শ্বাসকার্য চালায় (ফুলকার সাহায্যে / ত্বকের সাহায্যে / নেফ-রিডিয়ার সাহায্যে।)

৩. মানবদেহের একটি কঠিন ও একটি তরলকলার নাম লেখ।
৪. জীবের জীবনীশক্তি কোথায় সঞ্চিত থাকে ?
৫. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী ?

এবার এদের উত্তরগুলো বলে দেব। উত্তর লেখার সময় এখানে বলে দেওয়া পয়েন্টগুলো এবং উত্তরের ভাষা, দুদিকেই লক্ষ্য রাখবে। কয়েকটা প্রশ্নের সম্বন্ধে কিছু কথা বলার আছে। সেগুলো উত্তরের পাশে ব্র্যাকেটে বলে দেব। সে কথাগুলো অবশ্য তোমাদের জানার জন্য, লেখার জন্য নয়।

উত্তর—সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য

১. কোষস্থিত মাইটোকন্‌ড্রিয়ার মধ্যে শ্বসনকার্য সম্পন্ন হয়। (এখানে বলার কথা, গ্লাইকোলিসিস অংশটি কিন্তু হয় সাইটোপ্লাজমে, আর ক্রেবের অম্লচক্র ঘটে মাইটোকন্‌ড্রিয়ার অভ্যন্তরে। তবে এখানে মাইটো-কন্‌ড্রিয়ার কথাই জানতে চাওয়া হয়েছে।)

২. শিঙি মাছ, জল ও বায়ু উভয় পরি-বেশেই শ্বাসকার্য করতে পারে।

(এ ব্যাপারে অন্যান্য জীয়ল মাছ, যেমন মাগুর, কৈ ইত্যাদি, তাদের উদাহরণও দেওয়া যায়। এদের প্রত্যেকেরই অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকে।)

৩. সুন্দরী গাছে শ্বাসমূল দেখতে পাওয়া যায়।

৪. এই শ্বসন পদ্ধতিকে সবাত শ্বসন বলে।

৫. সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে।

৬. উদ্ভিদের পাতায় ক্লোরোফিল যুক্ত মেসোফিলকলায় সালোকসংশ্লেষ সংঘটিত হয়। (উদ্ভিদ দেহের যে কোনও কোষ, যার মধ্যে ক্লোরোফিল আছে, এবং, যেটিতে সূর্যালোক পৌঁছয়, তাতেই সালোকসংশ্লেষ সম্ভব ; কিন্তু এখানে বিশেষ 'কলা'র নাম জানতে চাওয়া হয়েছে। তাই সালোকসংশ্লেষের প্রয়োজনে বিশেষ-ভাবে গঠিত মেসোফিলকলাই এই প্রশ্নের উত্তর।)

৭.

শ্বসন	দহন
১. জীবকোষের ভিতর উৎসেচকের সহায়তায় ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে ঘটে।	১. জীবকোষের বাইরে উৎসেচক ব্যতিরেকে অতি দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।
২. উৎপন্ন শক্তি প্রধানত ATP অণুতে সঞ্চিত হয়ে প্রয়োজন মত কোষের দরকারে ব্যবহৃত হয়।	২. উৎপন্ন শক্তি তাপ ও আলোকরূপে নির্গত হয়।

(উত্তরটা এইভাবে টেবিল করে লিখতে হবে। এখানে দুটো পার্থক্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ১৬ ফেব্রুয়ারির সংখ্যাতে ১১৭ পাতায় যে টেবিলটা দেওয়া আছে, তাতে চারটে পয়েন্ট আছে। এই পয়েন্ট চারটের প্রথম তিনটে পরীক্ষকের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা খুবই জরুরী, কারণ তিনটে পয়েন্টই একইরকম প্রয়োজনীয়। তাই প্রথম দুটো পয়েন্ট জুড়ে একটা পয়েন্ট করে নেওয়া হয়েছে। পুরনো পড়া খুলে টেবিলটা দেখে নিও, তাহলে বুঝতে পারবে, কিভাবে পরীক্ষার হলে বসে দরকার মত তৈরি উত্তরের পরিবর্তন করতে হয়।)

৮. আলোর সহায়তায় কোনও বস্তুর বিশ্লিষ্ট হওয়াকে ফটোলিসিস বলে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আলোকের দ্বারা উদ্দীপ্ত ক্লোরোফিল কর্তৃক জলের বিশ্লিষ্ট হওয়ার ঘটনাটিকে ফটোলিসিস বলে। (অনেক সময় বলা থাকে, 'একটি বাক্যে উত্তর দাও।' তখন শুধু দ্বিতীয় বাক্যটি লিখবে।)

৯. ১৬ ফেব্রুয়ারির সংখ্যাতে ১১২ পাতায় দেখে নাও।

১০. মৃত্তিকা মধ্যস্থ উদ্ভিদমূলে ক্লোরোফিল থাকে না বলে সালোকসংশ্লেষ হয় না।

১১. জীবদেহে কোষের অভ্যন্তরস্থ সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়াতে শ্বাসক্রিয়া হয়। (প্রশ্নে 'শ্বাসক্রিয়া' শব্দটি দ্বারা 'শ্বসন' বোঝান হয়েছে। অনেক প্রশ্নেই 'শ্বসনের' পরিবর্তে 'শ্বাসকার্য' এবং 'শ্বাসকার্যের' পরিবর্তে 'শ্বসন' কথাটির উল্লেখ থাকে। আবার 'শ্বাসক্রিয়া' শব্দটিও থাকতে পারে। প্রশ্নের ধরন দেখে কী চাওয়া হয়েছে তা বুঝে নিতে হবে।)

১২. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই খাদ্য প্রস্তুতির সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের কার্বন বা অঙ্গার ঐ শর্করার অঙ্গীভূত হয়ে উদ্ভিদদেহে গৃহীত হয়। এই কারণে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে 'অঙ্গার আত্তীকরণ' বলা হয়।

১৩. এটিপি (ATP)-কে এনার্জি কারেন্সি বলা হয়।

১৪. NADP-র সম্পূর্ণ নাম নিকোটিন্যামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট (Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate)।

১৫. ফিতা কৃমির অবাত শ্বসন হয়। (ফিতা কৃমি মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রে পরজীবীরূপে বাস করে।)

১৬. ক্লোরোফিলের উপাদান দুটি— ক্লোরোফিল 'এ' এবং ক্লোরোফিল

'বি'। (নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, আসলে ক্লোরোফিলের উপাদান চারটি ; ওপরের দুটি ছাড়াও আছে 'ক্যারোটিন' আর 'জ্যানথোফিল'।)

১৭. ভেলামেন (Velamen) এক বিশেষ ধরনের মূল যা এপিফাইটস (Epiphytes) নামক উদ্ভিদসমূহের দেহে দেখতে পাওয়া যায়। ভেলামেন বায়ু থেকে জলীয়বাষ্প শোষণ করে উদ্ভিদকে সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে। (এই সঙ্গে ১ এপ্রিল সংখ্যার ১১২ পাতা দেখে নাও।)

১৮. সালোকসংশ্লেষের বহিঃ শর্তগুলো হল—১. আলোক, ২. কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ৩. জল এবং ৪. উষ্ণতা। (১৬ জানুয়ারির সংখ্যাতে ১০৪ পাতায় 'বাহ্য শর্ত' বলে এগুলো দেওয়া আছে।)

১৯. তিমির শ্বাসঅঙ্গ ফুসফুস এবং কেঁচোর দেহত্বক। (নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, মৎস্য ছাড়া অন্য সব শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীই ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য করে। আর, তিমি যে একটি স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণী, সেকথা ত সবাই জানে।)

২০. অ্যালভিওলাস ফুসফুসের মধ্যে দেখা যায়।

২১. শ্বাসকার্যের সময় নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং গৃহীত অক্সিজেনের আয়তনের অনুপাতকে শ্বাসহার বলে। সুতরাং,

$$\text{শ্বাসহার} = \frac{\text{নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আয়তন}}{\text{গৃহীত অক্সিজেনের আয়তন}}$$

শ্বাসহার একটি সংখ্যা।

২২. ক. অ্যালভিওলাইতে।
খ. ফুলকার মাধ্যমে।
গ. কোহল।
ঘ. দেহকোষে।

২৩. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়।

২৪. সূর্যালোকের প্রায় 20 শতাংশ সালোকসংশ্লেষে ধরা পড়ে। [এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, পাতার ওপর পতিত সূর্যালোকের পরিমাণ যদি 100% হয়, তার প্রায় 85% পাতার দ্বারা শোষিত হয় এবং 15% প্রতিফলিত হয়ে পরিবেশে ফিরে আসে। পাতা কর্তৃক শোষিত ঐ 85% আলোকের মধ্য থেকে প্রায় 20% সালোকসংশ্লেষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

২৫. ইস্টের দেহে ক্লোরোফিল না থাকায় ইস্ট (yeast) সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না। (ইস্ট এক ধরনের এককোষী উদ্ভিদ।)

২৬. সালোকসংশ্লেষের আলোকদশায় জল বিশ্লেষিত হয়।

২৭. সালোকসংশ্লেষের অন্ধকারদশায় শর্করা সংশ্লেষিত হয়। (তোমাদের সিলেবাসে যদিও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে যে আলোকদশা এবং অন্ধকারদশার নামটুকুও তোমাদের জানার দরকার নেই, তবুও বেশিরভাগ স্কুলের পরীক্ষাতেই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে। তাই এটুকু জেনে রাখা ভাল।

২৮. লৌহের অভাবে ক্লোরোফিল প্রস্তুত হয় না। (১ এপ্রিল পৃঃ ১১৩ দেখ।)

২৯. ইথাইল অ্যালকোহলের সংকেত C_2H_5OH.

৩০. ক. কার্বন-ডাই-অক্সাইড।
খ. গ্লাইকোলিসিস।

৩১. সালোকসংশ্লেষে শক্তির উৎস আলোক

(সাধারণত সূর্যালোক)। (আলোকের ফোটন কণা বা Photon particles আলোকশক্তি বহন করে নিয়ে এসে পাতার ওপর পড়ে। সেই শক্তিই ক্লোরোফিলের মাধ্যমে ধাপে ধাপে খাদ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

৩২. অবাত ও সবাত শ্বসনের সাধারণ দশাটির নাম গ্লাইকোলিসিস।

৩৩. একটি জলজ প্রাণীর, যেমন রুই মাছের, শ্বাসঅঙ্গের নাম ফুলকা।

৩৪. সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে, কোষের এমন একটি অঙ্গাণুর নাম ক্লোরোপ্লাস্ট। (ভুল করে ক্লোরোফিল বলে ফেল না কিন্তু। ক্লোরোফিল থাকে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে।)

৩৫. শ্বসনে সাধারণত সরল শর্করা (যেমন, গ্লুকোজ) জাতীয় খাদ্য ব্যবহৃত হয়।

(নিশ্চয়ই মনে আছে, এইজন্য শর্করা জাতীয় খাদ্যকে শক্তিপ্রদানকারী খাদ্য বলা হয়। এইসঙ্গে খেয়াল রেখ, স্নেহপদার্থ এবং প্রোটিনও প্রয়োজনমত শ্বসনে ব্যবহৃত হতে পারে।)

৩৬ ছত্রাক (যেমন, ব্যাঙের ছাতা) এক ধরনের উদ্ভিদ, যার দেহে সালোকসংশ্লেষ হয় না। (ব্যাঙের ছাতার মধ্যে ক্লোরোফিল নেই। এটি একটি মৃতজীবী উদ্ভিদ।)

৩৭. ১৬ ফেব্রুয়ারির সংখ্যাতে পৃঃ ১২১ দেখ। এই প্রশ্নটিতে ৩ বা ৪ নম্বর থাকা উচিত। একান্তই যদি ২ নম্বরের প্রশ্ন আসে, তাহলেও ৩ থেকে ৭ নম্বর পয়েন্ট লিখতে হবে।

৩৮. কেবল জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের দ্বারাই অবাত শ্বসন সম্ভব, কিন্তু কোহল সন্ধান শুধু উৎসেচকের উপস্থিতিতেও ঘটতে পারে।

৩৯. মেসোফিলকলায় ক্লোরোফিলপূর্ণ ক্লোরোপ্লাস্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে। এছাড়াও মেসোফিলকলা পাতায় অবস্থিত হওয়ায় এটি পত্রবিন্যাসের মাধ্যমে যথেষ্ট সূর্যালোক এবং বায়ুর সান্নিধ্যে আসে। ফলে উদ্ভিদের মোট সালোকসংশ্লেষের প্রায় সবটুকুই এই মেসোফিল কলায় সংঘটিত হয়।

৪০. ঘটপত্রী উদ্ভিদ তার পাতার অগ্রভাগে ঘটের আকৃতিযুক্ত অংশটির সাহায্যে কীটপতঙ্গ ধরে এবং তাকে পরিপাক করে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। (প্রকৃতপক্ষে ঘটপত্রী উদ্ভিদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথাই লেখা যায়। কিন্তু ১ নম্বরের জন্য এটুকুই যথেষ্ট তাছাড়া এর বেশি তোমাদের জানারও কথা নয়।)

৪১. কোষের সাইটোপ্লাজমের গ্লাইকোলিসিস পর্যায়ের এবং মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরে ক্রেবের অম্লচক্রের বিক্রিয়া ঘটে। অর্থাৎ, শ্বাসক্রিয়ার দুইটি অংশের বিক্রিয়া কোষের দুইটি স্থানে ঘটে থাকে। (আগেই বলেছি এই 'শ্বাসক্রিয়া' কথাটা বেশ বিভ্রান্তিকর। এটা দিয়ে 'শ্বাসকার্য' আর 'শ্বসন' কোনটাই স্পষ্ট করে বোঝায় না। কিন্তু প্রশ্ন দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে শ্বাসক্রিয়া কথাটি এখানে 'শ্বসন' বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে।)

৪২. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস জলের প্রতি অণুর মধ্যে উপস্থিত একটি করে অক্সিজেন পরমাণু। (এখানে বলে রাখি, বৈজ্ঞানিকেরা যদিও প্রথমে ভেবেছিলেন যে এই অক্সিজেনের কিছুটা CO_2 এবং কিছুটা H_2O থেকে আসে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিল (Hill) প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে নির্গত

অক্সিজেন শুধু জলের অক্সিজেন পরমাণু থেকেই সৃষ্ট হয়।)

৪৩. মাইটোকন্ড্রিয়ার অভ্যন্তরের ভাঁজ-গুলোকে বলে ক্রিস্টা (Crista), বহুবচনে ক্রিস্টি (Cristae)। (১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার ৯৮ পাতায় ছবি আর বিবরণ দেখে নিও)।

৪৪. চিংড়ির শ্বাসকণার নাম হিমোসায়ানিন (Haemocyanin)। (১ মার্চ সংখ্যার ১১৬ পাতা আর ১৬ মে সংখ্যার ১১১ পাতা দেখে নিও। এই ধরনের উত্তরগুলোতে মূল শব্দটার ইংরাজি বানান পাশে লিখে দিতে পারলে ভাল; তবে বানান ভুল করলে খুব খারাপ।)

৪৫ শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোষের সাইটো-প্লাজমের মধ্যে সরল শর্করা (যেমন, গ্লুকোজ) ভেঙ্গে পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হওয়ার বিক্রিয়াকে গ্লাই-কোলিসিস বলে। (প্রাণীদের ক্ষেত্রে, যখন অবাত শ্বসন চলতে থাকে, তখন পাইরুভিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। এই বিক্রিয়াটিকেও গ্লাইকোলিসিসের মধ্যেই ফেলা হয়। তবে, এই প্রশ্নের উত্তরে ওপরের বাক্যটি লিখলেই যথেষ্ট।)

৪৬. সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উপজাত বস্তু অক্সিজেন গ্যাস। ('উপজাত' মানে, কোনও বিক্রিয়ার ফলে যে যে বস্তু-গুলোর সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে অপ্রধান বস্তু যেটি। সালোকসংশ্লেষে প্রধান বস্তুটি গ্লুকোজ আর অপ্রধান বা 'উপজাত' বস্তুটি অক্সিজেন)।

৪৭. দুয়েকটি প্রাণীর ব্যতিক্রম বাদে, উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গে ক্লোরোফিল পূর্ণ ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত কোষের সাইটো-প্লাজমে ফটোলিসিস হয়।

৪৮. শ্বসনের অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের সমতা রক্ষা করা।

৪৯. ফণীমনসা উদ্ভিদটির কাণ্ডে সালোক-সংশ্লেষ ঘটে। [এ ব্যাপারে বলি, কাণ্ডে বাকলের নিচে ক্লোরোফিলযুক্ত কোষ থাকে। কিন্তু সূর্যালোক পুরু অস্বচ্ছ বাকল ভেদ করে ঐ কোষ-গুলোতে পৌঁছাতে পারে না বলে ঐ কোষগুলোতে সালোকসংশ্লেষ হতে পারে না। কিন্তু, উদ্ভিদটির তরুণ অবস্থায় তার কাণ্ড যখন সবুজ থাকে, তখন কিছু পরিমাণ সালোক-সংশ্লেষ কাণ্ডেও ঘটে। যে উদ্ভিদ-গুলোর পরিণত অবস্থাতেও কাণ্ডের রং সবুজ থেকে যায়, তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু ফণী-মনসা গাছের উদাহরণ দেওয়া হল, কারণ, ফণীমনসা বা অন্যান্য ক্যাকটাস গাছের বেশির ভাগ (বা, সব) পাতাগুলোই কাঁটায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, এবং কাণ্ডটি সবুজ থাকে। ফলে ঐ ধরনের উদ্ভিদগুলোর ক্ষেত্রে কাণ্ডই প্রয়োজনীয় সালোকসংশ্লেষের প্রায় সবটুকু (অথবা, সবটুকু) করে থাকে।]

৫০. শ্বসনের মূল উদ্দেশ্য, খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিকরূপে সঞ্চিত থাকা রাসায়নিক শক্তিকে মুক্ত করে তার সাহায্যে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা।

৫১. ATP-র সম্পূর্ণ নাম অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেট (Adenosine irs phosphate)।

পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাকের উত্তর

১. ভিটামিন-'এ'-র উৎস প্রাণীজ পদার্থের মধ্যে কডলিভার অয়েল, হ্যালিবাট লিভার অয়েল, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদি, এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে গাজর ও সবুজ শাক পাতা।

ভিটামিন 'এ'-র অভাবে রাতকানা, জেরফথ্যালমিয়া ও জেরোডার্মা রোগ হয়। (মনে আছে ত', যেকোনও কমলা, হলুদ বা লাল রঙের প্রাকৃতিক খাবার থেকেই ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। আর ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত যে কোনও একটি রোগের নাম চাইলে 'রাতকানা' রোগের নাম বলবে, কারণ, দেহে ভিটামিন 'এ'-র অভাব ঘটতে শুরু করলে সবচেয়ে আগে রাতকানা রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। বিশেষ করে এই প্রশ্নটার প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই ধরনের প্রশ্ন, যার মধ্যে একাধিক ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে, সে গুলোর উত্তর করার সময় প্রত্যেকটি অংশের উত্তর আলাদা আলাদা paragraph-এ লিখবে।

২. ভিটামিন 'এ'-র অভাবে মানুষ রাতকানা হয়।

৩. মানবদেহে ভিটামিন 'ডি' সংশ্লেষিত হতে পারে। [দেহত্বকের উপর সূর্যালোকের অতি বেগুনী রশ্মি পড়লে ত্বকে ভিটামিন 'ডি' সংশ্লেষিত হয়। মানবদেহের ক্ষুদ্রান্ত্রের বসবাসকারী কিছু ব্যাকটিরিয়া কয়েকটি খাদ্য থেকে (যেমন, মাছ) ভিটামিন 'K' উৎপন্ন করতে পারে কিন্তু এইভাবে প্রাপ্ত ভিটামিন 'K'-র পরিমাণ অল্প, এবং, এই সংশ্লেষকার্য ঘটায় প্রকৃতপক্ষে জীবাণুগুলো, মানবদেহ নয়।

তাই উত্তরে ভিটামিন 'ডি'-র কথা বলবে।]

৪. BMR-এর সম্পূর্ণ নামটি বেসাল মেটাবলিক রেট (Basal metabolic rate)

(তোমাদের সিলেবাসে যে কয়টি এই ধরণের সংক্ষিপ্ত ইংরাজী নাম আছে, তাদের যে কোনটারই সম্পূর্ণ নাম আসতে পারে। সেক্ষেত্রে পাশে ইংরাজী ভাষায় পুরো নামটি লেখা উচিত।)

৫. এইরূপ দুইটি স্বল্প মৌলিক উপাদানের নাম বোরোন (অধাতু) এবং জিংক (ধাতু)। [১ এপ্রিলের পড়াতে 'Trace elements' এর বাংলা করা আছে 'গৌণ মৌলিক উপাদান।' 'স্বল্প' এবং 'গৌণ' দুটি কথাই ঠিক। তোমার মনে হতে পারে, তোমার অজানা পরিভাষাটি, যেমন, 'গৌণ'-র বদলে 'স্বল্প' দেখলে পরীক্ষার হলে চিনতে অসুবিধা হবে কিনা। অসুবিধা হবে না, কারণ, এই ধরনের শব্দগুলির পাশে মূল ইংরাজী শব্দটি দেওয়া থাকবে। খেয়াল করবে, দুটি পদার্থের নাম এমনভাবে আমরা বেছে নিয়েছি, যাতে একটি অধাতু (বোরোন) এবং অন্যটি ধাতু (জিংক) হয়। উত্তরে এধরনের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষককে খুশি করে।]

৬. ক. পরিপাক ও আত্তীকরণের পার্থক্য ঃ

পরিপাক	আত্তীকরণ
১. বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে গৃহীত খাদ্যকে ধাপে ধাপে ভেঙে ফেলে সরলতর রূপে পরিণত করার নাম পরিপাক।	১. পরিপাকের পর, অথবা, সরাসরি গৃহীত সরল খাদ্যকে শোষণের পর কোষের প্রোটোপ্লাজমের অঙ্গীভূত করার নাম আত্তীকরণ।
২. পরিপাক সাধারণত বহিঃকোষীয়। একেবারে নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে অবশ্য অন্তঃকোষীয় পরিপাক ঘটে।	২. আত্তীকরণ সর্বদাই অন্তঃকোষীয়।

খ. উপচিতি ও অপচিতির পার্থক্য ঃ

উপচিতি	অপচিতি
১. বিপাকের অন্তর্ভুক্ত যে প্রক্রিয়াগুলোর ফলে দেহে শক্তি সঞ্চিত হয়, দেহের ক্ষয় পূরণ হয়, বা, দেহের বৃদ্ধি ঘটে, তাদের উপচিতি প্রক্রিয়া বলে।	১. বিপাকের অন্তর্ভুক্ত যে প্রক্রিয়াগুলোর ফলে দেহের শক্তি ব্যয় হয়, দেহের ক্ষয় ঘটে এবং দেহের সঞ্চিত খাদ্য কমে যায়, তাদের অপচিতি প্রক্রিয়া বলে।
২. উপচিতি একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া।	২. অপচিতি একটি ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া।
৩. উপচিতিতে দেহের শুষ্ক ওজন বাড়ে।	৩. অপচিতিতে দেহের শুষ্ক ওজন কমে।

গ. পরজীবী ও মৃতজীবীর পার্থক্য

পরজীবী	মৃতজীবী
১. এই ধরনের পরভোজী উদ্ভিদেরা জীবিত পোষক উদ্ভিদের দেহের ওপর বাস করে।	১. এই ধরনের পরভোজী উদ্ভিদেরা মৃত জীবদেহের ওপর বাস করে।
২. এরা পোষক উদ্ভিদের দেহ থেকে পোষক উদ্ভিদের দেহের অভ্যন্তরে প্রস্তুত খাদ্য শোষণ করে তার মাধ্যমে পুষ্টি লাভ করে।	২. এরা মৃত জীবদেহের পচনের ফলে উৎপন্ন সরল খাদ্য শোষণ করে পুষ্টি লাভ করে।
৩. শোষণের জন্য এদের 'হস্টোরিয়া' নামক এক ধরনের বিশেষ মূল থাকে।	৩. এদের হস্টোরিয়া থাকে না।
৪. পরজীবী উদ্ভিদ আংশিক বা পূর্ণ পরজীবী হতে পারে। অর্থাৎ এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকতে পারে।	৪ মৃতজীবীরা সর্বদাই পূর্ণ পরভোজী। এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না।

(এ ব্যাপারে ১ এপ্রিল সংখ্যার ১১১ পৃষ্ঠা অবশ্যই দেখে নিও।)

৭. ভিটামিন 'সি' বা আসকরবিক অ্যাসিডের অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।

৮. পৌষ্টিকতন্ত্রের যে সুবিন্যস্ত সঙ্কোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়া খাদ্যকে মুখ থেকে পায়ুর দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, তাকে পেরিস্টলসিস বলে।

৯. খাদ্য আগে মানুষের রক্তে শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ 80—100 mg%। 1 mg% মানে 100 ml. রক্তে 1 mg গ্লুকোজ।)

১০. দেহে যে কোনও কারণে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে টিটানি রোগ হয়।

১১. একটি মিথোজীবী উদ্ভিদের নাম মটর গাছ। (শিম্বজাতীয় বা রাইজোবিয়াম শ্রেণীর মিথোজীবী উদ্ভিদেরা তাদের মূলে এক বিশেষ ধরনের ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে মিথোজীবীত্ব প্রদর্শন করে।)

১২. পরভোজী উদ্ভিদের দুটি উদাহরণ স্বর্ণলতা (পরজীবী) এবং ব্যাঙের ছাতা (মৃতজীবী)।

১৩. ভিটামিন B_1-এর অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।

১৪. শরীরের ক্ষুদ্রান্ত্রের ভেতরের দেওয়ালে যে শ্লেষ্মাঝিল্লী (Mucous membrane) থাকে, সেখানে ভিলাই থাকে।

১৫. জীবদেহে কয়েকটি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ অপর কয়েকটি অ-প্রোটিন জাতীয় পদার্থের সঙ্গে মিলিত হলে তবে উৎসেচকের কাজ করতে সক্ষম হয়। প্রথম জাতীয় পদার্থগুলোকে অ্যাপোএনজাইম এবং দ্বিতীয় ধরনের পদার্থগুলোকে সহএনজাইম বলে। (অ্যাপোএনজাইম ও সহএনজাইমের ইংরাজি নাম যথাক্রমে Apoenzyme ও Coenzyme .)

১৬. প্রোটিন ও স্নেহপদার্থের মধ্যে দুইটি পার্থক্য ঃ

প্রোটিন	স্নেহপদার্থ
১. প্রোটিন একটি নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ এবং অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংযুক্তিতে সৃষ্ট।	১. স্নেহপদার্থ, নাইট্রোজেন-বর্জিত পদার্থ এবং গ্লিসারল ও বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে সৃষ্ট।
২. প্রতি গ্রাম প্রোটিন থেকে 4 কিলো ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়, তবে, প্রোটিন প্রধানত দেহগঠনকারী খাদ্য-রূপে কাজ করে।	২. প্রতি গ্রাম স্নেহপদার্থ থেকে 9 কিলো ক্যালারি শক্তি পাওয়া যায়, এবং, স্নেহপদার্থ দেহে সঞ্চিত শক্তিপ্রদান কারী খাদ্যের কাজ করে।

(নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, কোনটাই বাদ দেওয়া যায় না বলে দুটি পয়েন্টের মধ্যেই চারটি পয়েন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।)

আজ এই পর্যন্ত উত্তর দেওয়া থাকল। এর পরের দিন বাকি ছোট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে কিছু বড় প্রশ্ন আলোচনা করে দেব।

দেবাশিস বিশ্বাস

কর্মশিক্ষা

গত সংখ্যায় সার প্রয়োগের আলোচনা করেছি। প্রাণীজ সার কিভাবে প্রস্তুত করবে, সে কথাও বলেছি। বলা হয়নি শুধু উদ্ভিজ্জ সার তৈরির পদ্ধতি। সে কথা আজ বলব।

আরও বলব দু-এক রকম সব্জি উৎপাদনের প্রণালীর কথা। সব শেষে ফুলের চাষ। এ লেখা যখন তোমরা হাতে পাবে তার কিছুদিনের মধ্যেই স্কুল খুলে যাবে তখন ফসলের চাষ বা ফুলের চাষ কিংবা ওই দুটোই আরম্ভ করে দিতে পারবে।

সব্জি চাষ সম্পর্কে আরও কিছু কথা

গাছপালার দেহের মধ্যেই গাছের খাদ্য থাকে। এ কথা শুনে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ নিশ্চয়ই! কিন্তু কথাটা সত্যি। এই কারণেই গাছপালা পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তা গাছের পক্ষে খুবই মূল্যবান। এইভাবে কাঁচা গাছপালাকে পচিয়ে যে সার প্রস্তুত করা হয় তাকে Compost বা পাতাপচা সার বলে। উদ্ভিজ্জ সার বলতে একেই বোঝায়।

কম্পোস্ট তৈরি করার প্রণালী জেনে নেওয়া যাক। যেখানে জল জমে থাকার সুযোগ আছে এমন জায়গায় কম্পোস্ট তৈরি করার অসুবিধে। তাই উঁচু জায়গা খুঁজে নিতে হবে। প্রথমে একটা গর্ত করতে হবে ২০′ (লম্বা) × ৪′ (চওড়া) × ৪ (গভীর)। মাঝখান দিয়ে একটা পার্টিশন দেওয়া থাকবে। গর্তটাকে পাকা করে নেওয়াই ভাল; না হলে জৈব সারের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো জলের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যাবে। পুকুরের কচুরিপানা, বাগানের যত ঘাসপাতা সব ওই গর্তের মধ্যে ফেলে প্রতিটি জিনিস ১ ফুট করে স্তরে স্তরে সাজাও। স্তরগুলোকে কখনই হাত দিয়ে চেপে দিও না; কারণ স্তরগুলোর মধ্যে দিয়ে বায়ু চলাচল দরকার। ঘাসপাতা বা কচুরিপানার প্রতি ফুট স্তরের ওপরে দু'আঙুল পুরু করে গোবর দাও এবং গোবরের ওপরে আবার দু'আঙুল পুরু করে মাটি চাপা দাও। যদি গোমূত্র পাওয়া যায় তাহলে ওই স্তরের ওপরে ছিটিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যাবে। এইভাবে কয়েকটি স্তর করে নিয়ে গর্তটি ভরাট হয়ে গেলে স্তূপটির ওপরে গোবর ও মাটি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দাও। কম্পোস্টের পচনক্রিয়া যাতে তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় সেজন্যে কিছু $(NH_4)_2SO_4$ অর্থাৎ এমোনিয়াম সালফেট কিংবা হাড়-গুঁড়ো প্রয়োগ করলে ভাল হয়। দেড় মাস পরে স্তূপটিকে সরিয়ে দ্বিতীয় চেম্বারে দিতে হবে; তাহলে স্তূপের ওপরকার ও নিচেকার অংশগুলোর পচনক্রিয়া ঠিকমতন হবে। চার-পাঁচ মাসের মধ্যে দেখবে কম্পোস্ট তৈরি হয়ে গেছে।

এবারে কয়েক রকম **শাকসব্জি চাষের মোটামুটি বিবরণ** তুলে ধরছি। এ তালিকাটি মাঠে ব্যবহারিক কাজের সময় তোমাদের উপকারে লাগবে।

সব্জির নাম, রোপণ/বপনের পদ্ধতি ও দূরত্ব (সারি × গাছ) (১)	প্রতি একরে বীজের পরিমাণ, বপনের সময় (২)	প্রতি একরে জৈব ও অজৈব সারের পরিমাণ (৩)
ঢেঁড়স ১½′ × ১′	৪–৯ কিগ্রা.। দু'বার চাষ ঃ জানুয়ারি– মার্চ, জুলাই।	১৫ গাড়ি গোবরসার বা কম্পোস্ট, ১০০ কেজি এমোঃ সালফেট বা ৪৮ কেজি ইউরিয়া, ১০০ কেজি সুপার ফসফেট, ২৪ কেজি মিউরিয়েট অব পটাস সার।
বেগুন ২½′ × ২′	২০০–২৫০ গ্রা. তিনবার চাষ ঃ ফেব্রুয়ারি– মার্চ, জুন– জুলাই, অক্টোবর– নভেম্বর।	১০–২০ গাড়ি গোবরসার বা কম্পোস্ট, ৬৬ কেজি ইউরিয়া, ১৮০ কেজি সুপার ফসফেট, ৫০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাস।
মিষ্টি কুমড়ো, লাউ– মাদায় বীজ বপন করতে হয়; ৪½′ × ৪½′	১২০০–১৬০০ গ্রা. দু'বার চাষ ঃ ডিসেম্বর– জানুয়ারি, এপ্রিল–জুন।	১০–২০ গাড়ি গোবরসার বা কম্পোস্ট। ২০০ গ্রা. হাড়গুঁড়ো, ৫০ কেজি এমোঃ সালফেট।
ফুলকপি ২′ × ২′	২০০–২৫০ গ্রা. বীজ-তলায় বীজ বোনার সময় জুলাই– সেপ্টেম্বর মূল জমিতে চারা লাগানর সময় আগস্ট – নভেম্বর।	৩০–৪০ গাড়ি গোবরসার বা কম্পোস্ট। শেষ চাষের আগে ১৭৫ কেজি সুপার ফসফেট ও ৫০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাস। ১ মাস পর ৬০ কেজি ইউরিয়া দু'বারে দিতে হবে।
বাঁধাকপি ২½′ × ২′	২০০–২৫০ গ্রা.। বীজ-তলায় বীজ বোনার সময় আগস্ট– অক্টোবর মূল জমিতে চারা লাগানর সময় সেপ্টেম্বর– নভেম্বর।	ঐ
মূলা ১′ × ১½′	৩ কেজি। মূল জমিতে বোনা হয় জুন–নভেম্বর।	১০–১৫ গাড়ি গোবরসার বা কম্পোস্ট। গাছ সামান্য বড় হলে ৬০ কেজি এমোঃ সালফেট, ২৪ কেজি পটাস, ৬০ কেজি সুপার ফসফেট।

বীট, গাজর ১′×৯″	২·৫ কেজি। বীজতলায় বীজ বোনার সময় আগস্ট – অক্টোবর ; মূল জমিতে চারা লাগানর সময় সেপ্টেম্বর– নভেম্বর।	ঐ
পালং শাক। ছিটিয়ে বোনা হয়, পরে পাতলা করে দিতে হয়।	১৫– ২০ কেজি। মূল জমিতে বোনা হয় জুলাই –ডিসেম্বর।	ঐ

যে সব্জিগুলোর উল্লেখ করা হল তার মধ্যে দু'একটি ফসলের সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নেওয়া যাক।

ফুলকপির চাষ ঃ ফুলকপিতে ভিটামিন-বি এবং প্রোটিন থাকে। শীত-কালই ফুলকপি চাষের পক্ষে উপযোগী। ফুলকপির জলদি জাতের বীজ বোনা হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর, নাবী জাতের বীজ বোনার সময় নভেম্বরের মাঝমাঝি। প্রতি একর জমির জন্যে ২০০– ২৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। জলধারণের ক্ষমতাযুক্ত উর্বর জমিতে ফুলকপির চাষ ভাল হয়। হাল্কা বেলেমাটি বা ভারী এঁটেল মাটি কোনটাই ফুলকপি চাষের পক্ষে সুবিধাজনক নয়, তবে প্রচুর পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ করলে ওই মাটিতে ফুলকপির চাষ হতে পারে।

বীজতলায় চারা উৎপন্ন করার পদ্ধতি তোমরা আগেই জেনেছ। চারার বয়স মাসখানেক হলে তা মাঠে লাগাবার উপযোগী হয়। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে ২ ফুট, একটি গাছ থেকে আর একটি গাছের দূরত্ব হবে ২ ফুট। বিকেল বেলা চারা রোপণ করা উচিত। চারা রোপণের পরেই একটু জলসেচন দরকার। চারা রোপণের সময় দেখতে হবে যেন চারার সবচেয়ে নিচের পাতাটি মাটির নিচে থাকে।

জমি তৈরি করার সময় গোবরসার বা কম্পোস্ট ছাড়াও একর প্রতি ৯০ কে. জি. সুপার ফসফেট ৯০ কে. জি. পটাসিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভাল করে মেশাতে হবে। গাছ একটু বড় হবার পর চাপান সার (top dressing) হিসেবে একর প্রতি ১৭৫ কে. জি. এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। এই সার তিনবারে ব্যবহার করা দরকার— চারা দাঁড়াবার পর ৩৭ কে. জি. মাসখানেক পর ৯০ কে. জি., আর ফুল ধরতে আরম্ভ করলে বাকি সারটুকু।

ফুলকপির ফলন বাড়াতে হলে নিয়মিত জলসেচন এবং উত্তম পরিচর্যা চাই। গাছ লাগাবার পর প্রথম কয়েকদিন হাল্কাভাবে, তারপর অবস্থা বুঝে ৩– ৫ দিন অন্তর জলসেচ দিতে হবে। ফুল আসবার সময় একটু বেশি জল দেওয়া দরকার। তবে সাবধান, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দিলে গাছের গোড়া পচে যাবে। আগাছা দমন এবং আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্যে মাটি মাঝে মাঝে কুপিয়ে দিলে ভাল হয়। গাছ লাগাবার মাসখানেক পর গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করে দিতে হয়। গাছের সারির দু'ধার দিয়ে যে নালা তৈরি করা হয়েছে তার সাহায্যে জলসেচন করতে হয়।

ফুলকপির ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার

নিরেট ভাব এবং রঙের ওপর। ফুলকপি তোলবার দু'তিন দিন আগেই ওই গাছের দু'একটা পাতা দিয়ে ফুলটাকে ঢেকে রাখলে সাদা রঙ পাওয়া যায়। ফুলের রঙ বাদামী বা হলদে হওয়ার কারণ হচ্ছে রোদ, বৃষ্টি কুয়াশা বা পোকামাকড়ের আক্রমণ। যখন ফুলটা বেশ শক্ত থাকে তখনই ফুল তোলবার সময়। জলদি (আর্লি পাটনাই) জাতের ফুলকপি ৬০—৮০ দিনে, মাঝারি (কাট্‌কি) জাতের কপি ৮০—১০০ দিনে এবং নাবী (লেট্ স্নোবল, লেট্ বেনারস) জাতের কপি ১০০—১২০ দিনের মধ্যে তোলবার উপযোগী হয়। ভোরে অথবা সন্ধ্যায় ফুলকপি তোলা উচিত।

ফুলকপির প্রধান শত্রু সুতলি পোকা, শুঁয়োপোকা আর পিঁপড়ে। পিঁপড়ে চারা-গাছের গোড়া কেটে দেয়, পাতা খেয়ে ফেলে। সুতলি পোকা ফুল ফুটো করে ফুল নষ্ট করে দেয়। জমির কাছাকাছি ঝোপ জঙ্গল থাকলে পোকার উৎপাত বেশি হয়। এদের মোকাবিলা করতে হলে গ্যামাকসিন, ডি-ডি-টি, ম্যালাথন ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ নিয়মিত ছেটাতে হবে। ওষুধ ছড়াবার এক সপ্তাহের মধ্যে ফুল তোলা উচিত হবে না।

ফুলের চাষ

যে প্রকল্পটি আমরা হাতে নিয়েছি তার দুটি ভাগ : শাকসব্জির চাষ ও ফুলের চাষ। 'জোটে যদি মোটে একটি পয়সা, খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি'—বলেছিলেন হজরত মহম্মদ কিন্তু যদি দুটি পয়সা পাও—তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন—'ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী'। ফুলের সমাদর সর্বত্র—ঘরে-বাইরে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, মাথার খোঁপায়, মানুষের নামে, বাড়ির নামে। কবির উপমায় আছে ফুল—'ফুলের মত মুখ'।

গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শরৎকালে যেসব মরশুমী ফুলের চাষ করা যায় সেগুলো হল : মর্নিং গ্লোরি, জিনিয়া, সূর্যমুখী, মোরগঝুঁটি, ইয়েলো কসমস, দোপাটি (বালসান)।

শীতকালীন মরশুমী ফুলের নাম : ডালিয়া, ডেইজি, ডায়ানথাস, গাঁদা (মেরীগোল্ড), চেরীগোল্ড, ক্যালেণ্ডুলা, ক্রিসেনথিমাম, কার্নেশন, কসমস, কর্নফ্লাওয়ার, হোলিহক।

রজনীগন্ধা, জিপসোপিলা — এইসব মরশুমী ফুল সব ঋতুতেই ফোটে।

বড় বড় শহরের স্কুলে যথেষ্ট জমির অভাবে ফুলের চাষ করা একটা সমস্যা। সেজন্য টবে ফুলের চাষ করা হয়। শুধু ফুল কেন—বেগুন, লঙ্কা ইত্যাদি সব্জির চাষও টবে স্বচ্ছন্দে করা যায়। মাটি, কাঠ বা টিনের টব তৈরি করা যায়। অপ্রয়োজনীয় জল নিষ্কাশনের জন্যে টবের তলার দিকে কয়েকটি ছিদ্র থাকে।

টবে মাটি প্রস্তুত করবে কিভাবে ? এ জন্যে যা যা দরকার তার তালিকা দিচ্ছি :

১. দোঁয়াশ মাটি : গাছের শিকড় শক্ত করে।

২. বালি : টবের জল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩. পাতাপচা সার : মাটিকে সচ্ছিদ্র করে তোলে, মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, মাটির তাপমাত্রা ঠিক রাখে।

৪. গোবর সার : উদ্ভিদকে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান যোগায়।

৫. চুণ : মাটির অম্লত্ব নিবারণ করে।

৬. কয়লা গুঁড়ো : টবের তলদেশে ১ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিলে টবের জল নিষ্কাশনে সুবিধে হয়।

৭. হাড় গুঁড়ো : মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ায়।

টবের মাটিতে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ কি-কম হবে? তার তালিকাটি লক্ষ্য কর :

গাছের নাম	দোঁয়াশ মাটি	বালি	গোবরসার	পাতাপচা	চুণ
সবরকম মরশুমী ফুল	১ ভাগ	১½ ভাগ	৩ ভাগ	—	—
মরশুমী ফুলের চারা তৈরি	১½	১½	১	৩ ভাগ	—
লিলি, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা	৩	২	২	২	—
পাতাবাহার	২	২	২	৪	১ ভাগ
ফলের গাছের কলমের জন্য	৪	২	২	-	—

সব্জি ও ফুলের চাষের পদ্ধতি জানা হল। এবার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নাও।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ করতে হলে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখবে ?

মাটির উত্তম কর্ষণ আগাছা বিনাশ ; গাছের রোগ ও পোকামাকড় দমন মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব বুঝে জমিতে ফসল নির্বাচন ঠিক সময়ে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ ও জলসেচন।

আগাছা কী কী ক্ষতি করে ?

শস্যের ফলন কম হয় শস্যের মূল্য হ্রাস পায় ; জমির বিক্রয়মূল্য কমে যায় ; চাষের খরচ বাড়ে পোকামাকড় ও রোগের উৎপাত হয় ; জলসেচের খরচ বাড়ে।

আগাছা দমনের পদ্ধতি কী ?

উত্তম কর্ষণ পরিষ্কার বীজের ব্যবহার বীজ ধারণের পূর্বে আগাছার ধ্বংসসাধন ; নতুন আগাছা সৃষ্টি বন্ধ করা ; পর্যায়ক্রমে ফসলের চাষ রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ (যথা, আয়রন সালফেট, সোডিয়াম ক্লোরেট, অ্যামাইন সল্ট ইত্যাদি)।

একই জমিতে বার বার একই ফসলের চাষ করা অনুচিত কেন ?

একটি বিশেষ ফসল যে নির্দিষ্ট খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে বাঁচে, সে উপাদান ফুরিয়ে যাবে বার বার ওই একই ফসলের চাষ করলে। এই কারণে একটি জমিখণ্ডে পর্যায়ক্রমে ফসল (rotation of crop) চাষ করা উচিত। □

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

শারীর শিক্ষা

অ্যাথলেটিকস

[বাধ্যতামূলক]

গত দুটি সংখ্যায় তোমাদের দৌড়বার কলাকৌশল নিয়ে বলেছি। এবার আসছি সট্-পাট্ বা লৌহ বল নিক্ষেপণ করার কলাকৌশল। প্রথমে বলে রাখি লোহার বল কিন্তু ছোঁড়া হয় না, ছুঁড়লেই নিয়ম-বিরুদ্ধ হবে। লৌহ বলকে হাওয়ায় ঠেলে ফেলা হয়—তার জন্যই একে সট্-পাট্ বলা হয়।

সট্-পাট্-এর প্রাথমিক মৌলিক কলা কৌশলগুলো তোমাদের অষ্টম শ্রেণীতেই শেখার কথা কম ওজনের বল নিয়ে। নবম শ্রেণীতে সেইগুলো নির্ধারিত ওজনের বল নিয়ে (অর্থাৎ ৫ কেজি বালকদের ও ৪

কেজি বালিকাদের) অনুশীলন করার কথা। যেহেতু এই নতুন সিলেবাস তোমরা আগের বছর পাওনি তাই আমি অষ্টম শ্রেণীতে যেগুলো করার কথা ছিল তোমাদের সুবিধার জন্য সেইগুলো এখানে আলোচনা করছি। এগুলো ভাল করে অনুশীলন করে রপ্ত করতে পারলেই তোমরা অনায়াসেই ৫ বা/৪।কেজি ওজনের লোহার বল ফেলতে পারবে। অবশ্যই লোহার বল ছোঁড়ার জন্য শরীরকে মজবুত করে নিতে হবে—বিশেষ করে হাতের শক্তি প্রয়োজন। লৌহ-বল নিক্ষেপনের কলাকৌশল শেখার জন্য আমি কৌশলগুলোকে পাঁচ,ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। ভাগ ভাগ করে নিলে তোমাদের শিখতে ও অনুশীলন করতে সুবিধে হবে।

ক. **লৌহ বলকে হাতের ওপর ধরে রাখা [hold]**

খ. **শরীরে বল স্থাপন করা বা রাখা [Placement]**

গ. **বলকে বায়ুতে ঠেলে দেওয়া বা হাত থেকে মুক্তি দেওয়া [Delivery]**

ঘ. **স্থান পরিবর্তন [Glide or Shift]**

ঙ. **বিপরীত দিকে ফেরা [Reverse]**

ক. লৌহ বলকে হাতের ওপর ধরে রাখা [hold]

যে কোন জিনিসকে ফেলতে হলে আগে শিখতে হবে কি করে সেটাকে ধরবে। ধরা যদি ঠিক না হয় তাহলে কোন জিনিসই ভাল করে ফেলতে পারবে না। আগেই বলেছি লৌহ বল ছোঁড়া হয় না—ঠেলে ফেলা হয়। তাই হাতে রাখার পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের। হাতের পাঁচটি আঙুলই স্বাভাবিকভাবে ছড়িয়ে নিয়ে (জোর করে ছড়ানর চেষ্টা করবে না) হাতের তালু ও আঙুলের তলদেশের সংযোগস্থল লৌহ বলটাকে রাখ বলটা যাতে দুই পাশে গড়িয়ে না যায় তার জন্য বুড়ো ও কড়ে আঙুল দুটোকে দুই পাশে রাখবে।

খ. বলকে শরীরের ওপর স্থাপন করা [Placement]

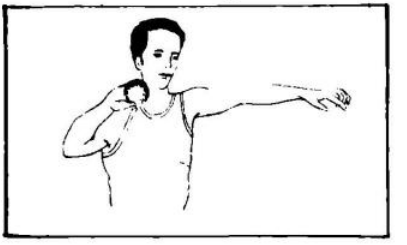

'ক'-এর মত বলকে হাতে নিয়ে কাঁধের ও গলার সংযোগস্থলে চোয়ালের নীচে রাখ। বুড়ো আঙুল ও তর্জনী ভেতরের দিকে থাকবে। কনুইটা বাইরের দিকে

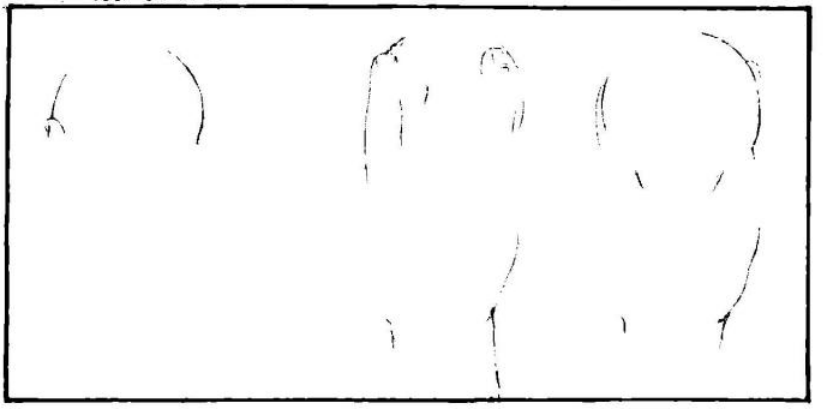

অনেকটা কাঁধের লাইনে রাখার চেষ্টা করবে। কনুই নিচের দিকে নামালেই কিন্তু নিয়মভঙ্গ হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে অর্থাৎ ছোঁড়ার মত হয়ে যেতে পারে। বাঁ হাতটাকে হাল্কাভাবে ওপরের দিকে বা সামনের দিকে রাখবে, দৃষ্টি সামনে থাকবে।

গ. বলকে শূন্যতে ঠেলে দেওয়া বা হাত থেকে মুক্তি দেওয়া [Delivery]

'ক' ও 'খ' শেখার পরই বলকে কি করে শূন্যতে দূরে ঠেলে ফেলবে সেটা শিখতে হবে। শেখার জন্য এইটাকে কয়েকটি ধাপে ধাপে করলে, শেখাটা সহজ হবে ও শরীরে সমন্বয় গড়ে উঠবে।

১. সোজা দাঁড়িয়ে শুধু হাতের সাহায্যে ফেলা-সোজা দাঁড়িয়ে, দু পায়ের মধ্যে ২০-২৫ সে.মি. ফাঁক রেখে, পা দুটোকে পাশাপাশি রাখ। 'খ'-এর অবস্থান থেকে শুধু হাতের সাহায্যে বলকে ওপরের দিকে ৪০°-৪২° কোণ বরাবর ঠেলে দূরে ফেলার চেষ্টা কর। মনে রাখবে এই সময়

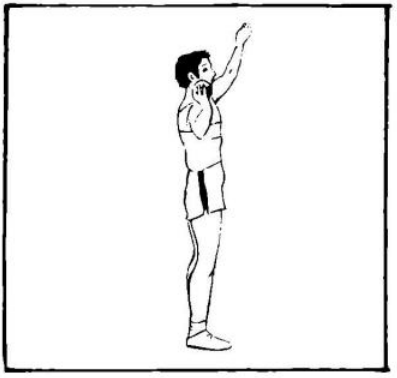

কনুই বাইরের দিকে, আঙুলের ডগাগুলো ভিতরের দিকে, দৃষ্টি বলের দিকে অবশ্যই থাকবে। বল যখন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে আঙুলগুলো দিয়ে বলে জোরে ধাক্কা বা আঘাত দেবে যাতে বল আর একটুদূরে যায়। হাঁটু ভাঙ্গবে না ও কোমর ঘুরবে না।

২. '১'-এর অবস্থান অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ভাল করে রপ্ত করে নেবার পর,

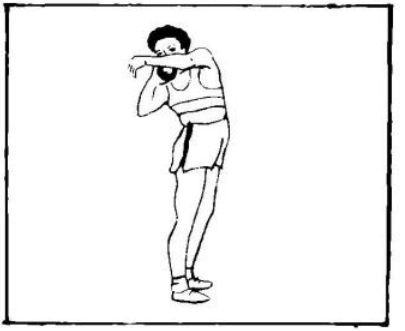

একই অবস্থা থেকে শুধুমাত্র কোমর থেকে ওপরের শরীর ঘুরিয়ে নিয়ে বলকে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্যই হাঁটু ভাঙ্গবে না।

৩. '২'-এর অবস্থান থেকেই অর্থাৎ কোমর থেকে ওপরের শরীরকে ঘুরিয়ে নিয়ে, এবার তার সঙ্গে পায়ের হাঁটু ভেঙ্গে বলকে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ

পায়ের, কোমরের জোরকে হাতের জোরে মিশিয়ে বল ফেলার চেষ্টা করবে।

৪. ওপরের ১, ২, ৩-এ তোমরা বল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করে ফেলতে হয়

শিখলে। এবার তোমাদের শিখতে হবে বল ফেলার সঠিক অবস্থানটাকে।

যদি বলটা ডান হাতে ছোঁড়, তাহলে ডান পা-টাকে ভিতরের দিকে ও বাঁ পা-টাকে বল যেদিকে ফেলবে সেই দিকে নিয়ে রাখ। দুটি পায়ের মধ্যে ৯০ সে.মি.-এর মত ব্যবধান থাকবে। বাঁ পায়ের পাতা ও ডান পায়ের গোড়ালি একই সরলরেখায় বল ফেলার দিকে রাখার চেষ্টা করবে। ডান পায়ের হাঁটু ভেঙ্গে কোমর থেকে

শরীরের ওপর অংশকে পিছনের দিকে নিয়ে যাও। দৃষ্টি বল যেদিকে ফেলবে তার উল্টো দিকে সোজাসুজি রাখ। বাঁ হাত বুকের কাছে কনুই ভেঙ্গে আলতোভাবে রাখ। ডান হাতে বল নিয়ে 'খ'-এর অবস্থানে রাখ। ডান হাতের কনুই, হাত ও বাঁ কাঁধ অনেকটা একই সরলরেখায় রাখার চেষ্টা করবে। এই অবস্থান থেকে বল ফেলার সময় প্রথমে ডান পায়ের মাংসপেশীর সাহায্য নেবে। সঙ্গে সঙ্গে পাছা ঘুরবে ও ওপরের দিকে ঠেলে দেবে যাতে পায়ের মাংসপেশীর শক্তি, কোমরের শক্তি এক হয়ে হাতে শক্তি জোগায়। এই অবস্থা থেকে গ (৩)-এর মত করে বলকে শূন্যে ঠেলে ফেলবে। এইগুলো কিন্তু পর পর একই পর্যায়ক্রমে হবে—মাঝখানে কোন রকম বিরতি দেওয়া চলবে না। বল হাত থেকে ছেড়ে যাওয়ার আগে বা পরের মুহূর্তে শরীরকে সোজা রাখার চেষ্টা করবে।

ঘ. স্থান পরিবর্তন [Glide or Shift]

শরীরের মধ্যে গতিশীলতা আনার জন্য গ্লাইড বা শিফট করা হয়। লৌহ বল ২·১৩৫ মি. ব্যাসযুক্ত একটা বৃত্ত থেকে নিক্ষেপ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই যদি বেশি দূরে ফেলতে চাও তাহলে অবশ্যই শরীরের মধ্যে গতিশীলতা আনতে হবে। এই গতিশীলতা আনার জন্য গ্লাইড বা শিফট বিশেষ প্রয়োজনীয়।

যেদিকে বল ফেলবে তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াও। ডান পা সামনে রাখ ও গোড়ালির কাছে বাঁ পায়ের পাতাকে আলতোভাবে ছুঁইয়ে রাখ। ওজনটা ডান পায়ের ওপরই প্রধানত থাকবে। বাঁ হাত হাল্কাভাবে ওপরে বা সামনের দিকে রাখ। ডান হাতে বল নিয়ে 'খ'-এর অবস্থানে এস। এই অবস্থা থেকে বাঁ-পাকে সজোরে

দুলিয়ে ওপরে নিয়ে গিয়ে আবার নিচে নিয়ে এস। নিচে আনার সঙ্গে সঙ্গেই ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে শরীরকে নিচে নামিয়ে গোড়ালি দিয়ে মাটিতে সজোরে ধাক্কা মেরে শরীরকে বল ফেলার দিকে

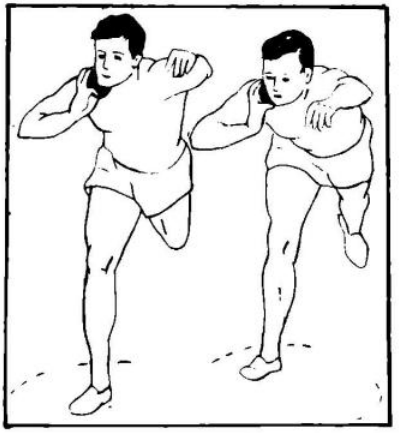

নিয়ে এস। একই সঙ্গে কিন্তু বাঁ-পাকে সজোরে বল ফেলার লাইনে নিয়ে আসতে হবে। এখন তুমি গ (৪)-এর অবস্থানে এসে গিয়েছ ও তার মত করে বল ঠেলে ফেলবে শূন্যে। যখন স্থান পরিবর্তন করবে তখন মনে রাখবে মাটির খুব ওপরে উঠবে

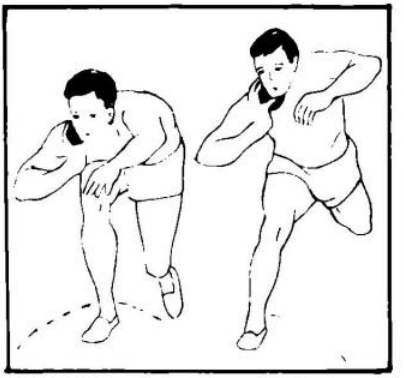

না। তাহলে কিন্তু কোন সুবিধেই পাবে না গ্রাইড থেকে।

ঙ. বিপরীত দিকে ফেরা

[Reverse]

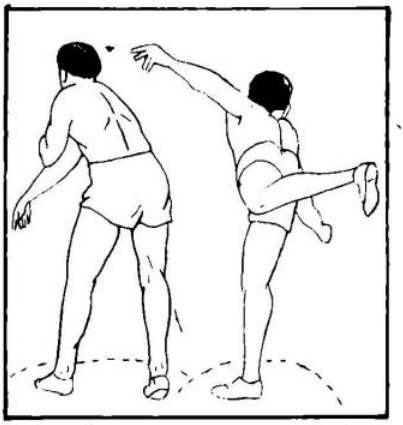

বলটা শূন্যে ফেলার সময় শরীরের মধ্যে প্রচণ্ড গতিশীলতা থাকে—এই গতিশীলতাটা কমাবার জন্যই বিপরীত দিকে ফিরতে হবে, না হলে বৃত্তের বাইরে চলে যাবে ও এটা নিয়মবিরুদ্ধ হবে। তাই বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ের উপর ভর করতে হবে। ডান পায়ে হাঁটু সামান্য ভাঙবে ও ওজনটা ডান পায়ে চলে আসবে।

অমিয় সাহা

প্রবালের জীবনচক্র

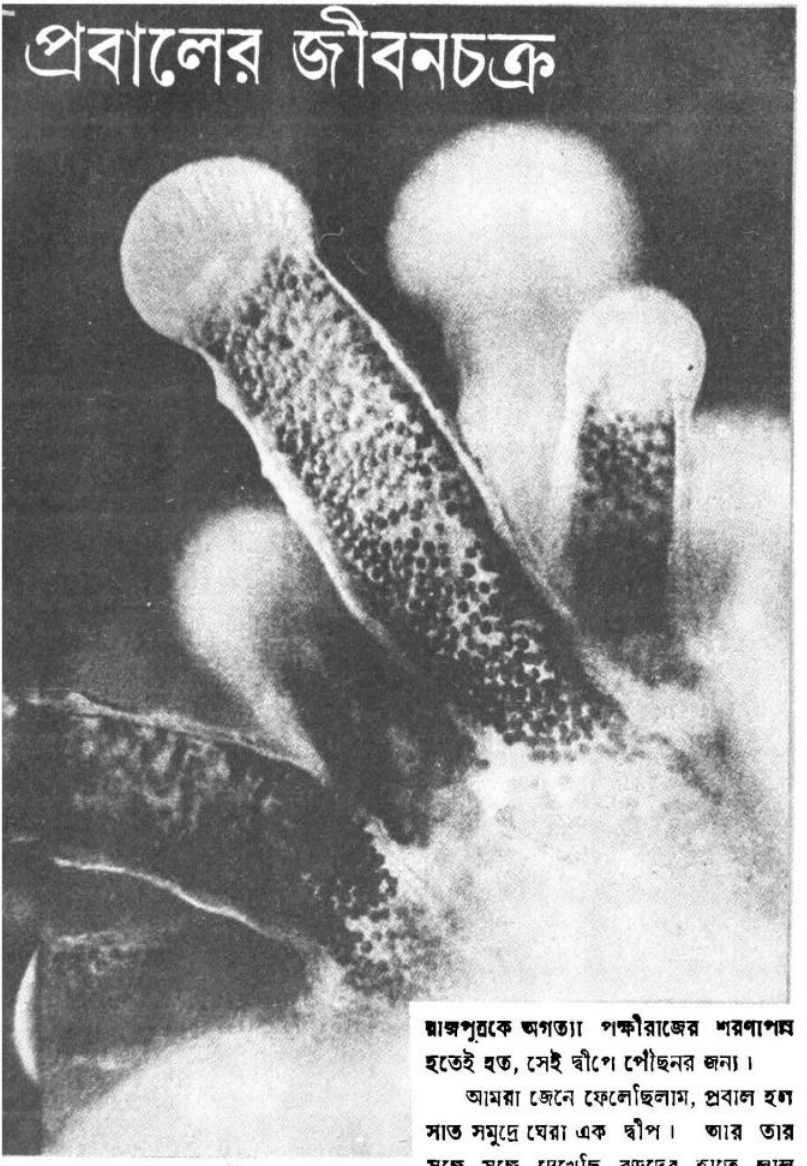

অরুণ আইন

ছোটবেলায় গল্প শুনেছি, এক প্রবাল দ্বীপে বন্দী ছিল দুঃখিনী রাজকন্যা। সাত সমুদ্রে ঘেরা সেই নির্জন প্রবাল দ্বীপ। রাজপুত্রকে অগত্যা পক্ষীরাজের শরণাপন্ন হতেই হত, সেই দ্বীপে পৌঁছনর জন্য।

আমরা জেনে ফেলেছিলাম, প্রবাল হল সাত সমুদ্রে ঘেরা এক দ্বীপ। আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি বড়দের হাতে লাল আংটি, রুপো দিয়ে বাঁধান। জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, প্রবালের (পলা) আংটি। অর্থাৎ এক কথায় প্রবাল আমাদের মোটেই অপরিচিত নয়। ছোটবেলা থেকেই

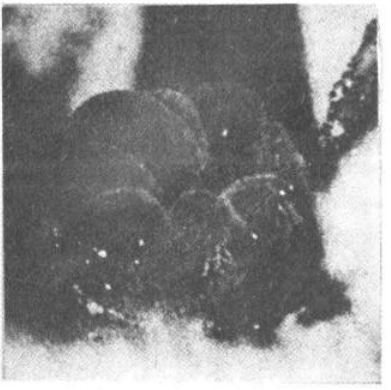

শত্রুর ভয়ে প্রবাল ঢুকে পড়েছে তার শক্ত খোলার ভেতরে। (৪½ গুণবর্ধিত)

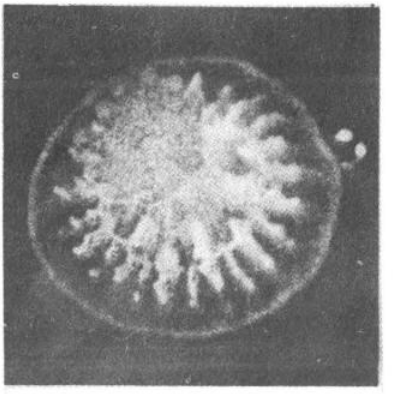

প্রবাল শূককীট (৫০ গুণ বর্ধিত)

চিনেছি তাকে। অত কথা কি,—সর্বোপরি হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথ ত ছিলেনই,—সেখানে পড়েছি—

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর
বিহঙ্গেরা।

অর্থাৎ ছোটবেলার সেই রূপকথা থেকে বড় হয়ে সাহিত্য পাঠ পর্যন্ত সর্বত্রই প্রবাল। তাই প্রবাল আমাদের খুবই পরিচিত। তবু...। হ্যাঁ, একটা 'তবু' কিন্তু তারপরও থেকে যাচ্ছে। আর সেই

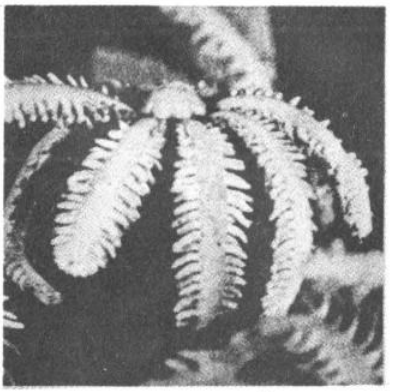

খোলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আসল প্রবাল। (৪½ গুণ বর্ধিত)

তবুটা হল—বস্তুত প্রবাল সম্বন্ধে আমরা জানি ঠিক কতটা।

সাত সাগরের অতলতলের বাসিন্দা প্রবাল কিন্তু প্রাণী হিসাবে বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তার বিচিত্র জীবনচক্র আর অপরূপ বৈচিত্র্যের জন্য।

বহু আগে মানুষের সাধারণ ধারণা

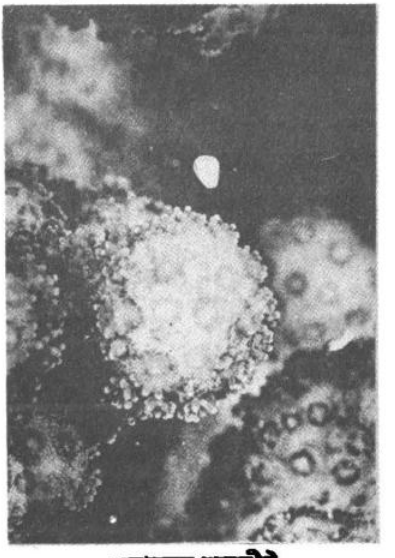

প্রবালের শূককীট

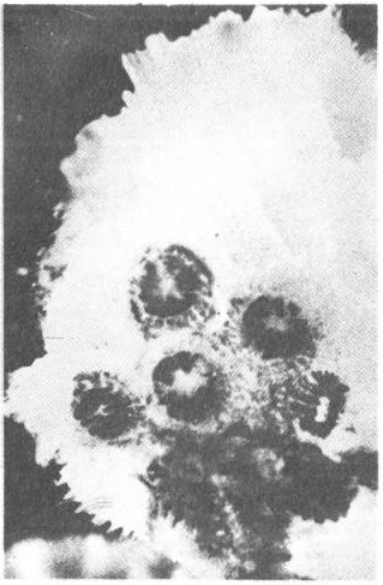

শক্ত খোলের ভেতর আসল প্রবালের শরীর। (বহুগুণ বর্ধিত)

ছিল, প্রবাল এক ধরনের সাগর উদ্ভিদ। অবশ্য এ ধারণা পোষণ করার জন্য পুরনো যুগের মানুষকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। এবারের প্রচ্ছদ দেখলেই বোঝা যাবে —বহু প্রবালের চেহারা অনেকটা কেন

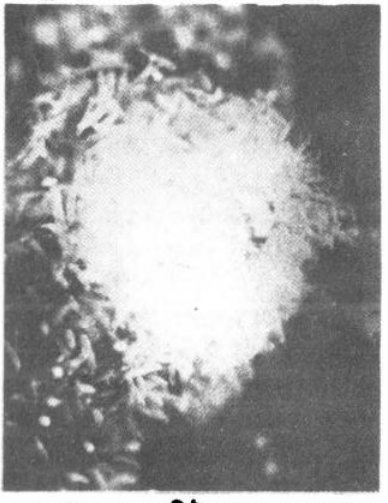

প্রবালের শূককীট খেয়ে ফেলেছে প্রোটোজোয়া। (১৩০ গুণ বর্ধিত)

ঠিক লতাগুল্ম বা উদ্ভিদের মতই। প্রবাল বহু রকম আছে। তাদের কারো কারো চেহারা আবার ডাণ্ডার ফাড়িং বা পোকা-মাকড়ের মতও।

প্রবালের জন্ম ডিম থেকে। যেমন প্রজাপতির। প্রজাপতির জন্মকথা সবার জানা। প্রথম ডিম, ডিম থেকে শুঁয়ো বা শূককীট তারপর আসল প্রাণীটিরপরিপূর্ণরূপে বেরিয়ে আসা। প্রবালের জন্মও ঠিক এইভাবে।

প্রথম কথা হল, প্রবাল জন্মায় কখন। হ্যাঁ, প্রবালের জন্মেরও আবার সময়ক্ষণ আছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে চাঁদের কলায় হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে দেখা গেছে প্রবালের

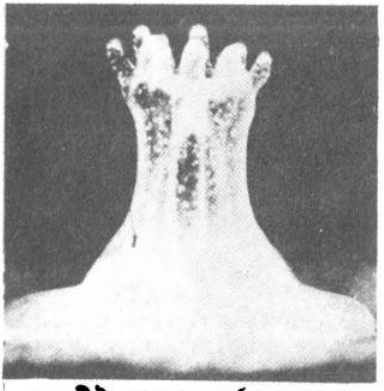

শূককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রবাল জন্ম নিল। (৮০ গুণ বর্ধিত)

জন্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ণিমায় আর শীতকালে অমাবস্যাই হল প্রবাল জননীর ডিম পাড়ার প্রশস্ত সময়। কেন তা কিন্তু আজও বেশ রহস্যময়। বিজ্ঞানীরা আজও এর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

ডিম পাড়ার পর তার থেকে বেরোয় শূককীট বা প্রবালের শুঁয়োপোকা। ডিম থেকে বেরবার পরই শূককীটরা তাদের

প্রবাল দ্বীপ

শরীরের ছোট ছোট শুঁয়ো বা লোম দিয়ে দাঁড় কেটে সাঁতার কাটতে থাকে অতল সাগরের বুকে। লাখ লাখ নয়, কোটি কোটি এই রকম শুঁয়ো যখন ভেসে বেড়াতে থাকে প্রবাল অরণ্যে— তখন সে এক দেখার মত দৃশ্য।

সাত থেকে দশ দিন শূককীটরা ঘুরে বেড়ায় সাগর জলে একটা মনের মত বাসার সন্ধানে। মন-পসন্দ বাসাটি পাওয়া গেলেই শূককীটরা সেখানে স্থিত হয়। এই বাসা তারা খুঁজে পায় প্রবাল দ্বীপেরই কোন ফাঁক-ফোকরে। বাসা ত পাওয়া গেল এবার প্রবালদের প্রতীক্ষা, পরিপূর্ণ প্রবাল হয়ে ওঠার জন্য।

শূককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রবালের রূপ পেতে সময় লাগে প্রায় চার সপ্তাহ। সম্পূর্ণ প্রবাল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রয়োজন হয় খাদ্যের। তখন শুরু হয় প্রবালের শিকার। তাদের শিকার ধরার প্রক্রিয়াটি বড় বিচিত্র। প্রবালের শরীরের শুঁড় থেকে বেরোয় এক ধরনের আঠাল রস, এই রস ও শুঁড়ের সাহায্যে শিকারকে ধরে তারা তাদের মুখের ভেতর টেনে আনে।

প্রবালের সবচেয়ে উপযুক্ত বাসভূমি হল সাগরের ১৮০ ফুট কম গভীরতায় এবং জলের উষ্ণতা যেখানে ৬৮° থেকে ৮৬° ফারেনহাইট।

শূককীট থেকে ফুটে বেরবার পর পরই প্রবাল তার দেহ থেকে এক ধরনের সাদা রসক্ষরণ করতে থাকে। এই রস তার নরম দেহকে ঘিরে এক ধরনের শক্ত খোল তৈরি করে। অনেকটা শঙ্খ বা শামুকের খোলার মত। প্রবালের মৃত্যুর পর এই শক্ত জমাট খোলাই ধীরে ধীরে জমে উঠে তৈরি করে প্রবালের প্রবাল দ্বীপ।

প্রবালের সবচেয়ে বড় বিপদ যখন সে ডিম কিংবা শূককীট অবস্থায় ভেসে বেড়ায়। সেই সময় সমুদ্রের এককোষী প্রাণী যেমন

প্রোটোজোয়া, সামুদ্রিক কাঁকড়া, শামুক, চিংড়িমাছ, তারকামাছ ইত্যাদি এদের লাখে লাখে গিলে খায়। অবশ্য শুধু ডিম বা শূককীটই নয় সমুদ্রের এইসব প্রাণীদের একটা প্রধান খাদ্য হল পূর্ণাঙ্গ প্রবাল। তবে, কথা হল, প্রবাল হল রাবণের গুষ্টি। লাখে লাখে তারা শত্রুদের পেটে গেলেও জন্ম হার তাদের কোটি কোটি। ফলে প্রবাল দ্বীপ গড়ে তোলার জন্য সব সময় নতুন প্রবালরা সাগরতলে জন্ম নিচ্ছেই। তবে কি কারণে এখনও জানা যায়নি—প্রবালদের এইসব শত্রুরা কিন্তু স্বাস্থ্যবান শূককীটদের কেন যেন রেহাই দিয়ে যায়।

প্রবালরা যে শুধু একচেটিয়া অন্য প্রাণীদের খাদ্যই হয়ে আসছে তা নয়। বরং ঠিক উল্টোটাই। প্রবাল খুব হিংস্র এবং মাংসাশী প্রাণী। হিংস্র অর্থে এরা জীবন্ত শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কাবু করে। কোন কোন প্রবাল আবার খুব বিষাক্ত। অতি সম্প্রতি এক আমেরিকান ডুবুরী রবার্ট এফ সিসন

প্রবালের বিচিত্র রূপ। (১০ গুণ বর্ধিত)

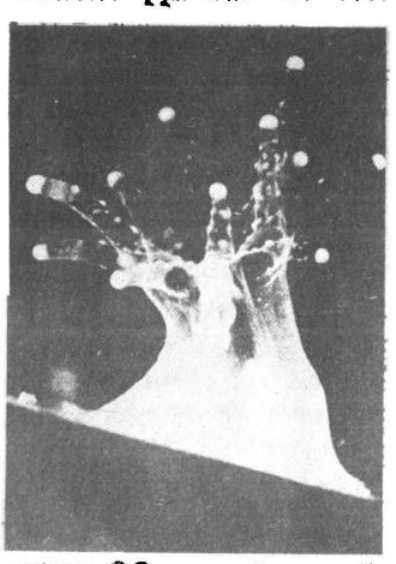

প্রবালকে মাছ পর্যন্ত খেতে দেখেছেন। তিনি সে কথা যখন বলেন, তখন বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে যান। কারণ, প্রবাল তার চেয়েও বড় প্রাণী মাছ শিকার করে খায় একথা এতদিন অজানাই ছিল। সিসন তাঁর কথার প্রমাণস্বরূপ প্রবালের মাছ শিকারের ছবি পর্যন্ত তুলে এনে হাজির করেন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এই ধরনের আর কোন ঘটনা শোনাও যায়নি বা এমন ছবিও এই প্রথম। এই ছবিটি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। জেনে রেখ, এটি প্রবাল বিষয়ে পৃথিবীর এক অতি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধর্মী ছবি।

এবার আসি অ্যালগাইদের কথায়। অ্যালগাইরা প্রবালের জীবনচক্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অ্যালগাই হল এক ধরনের সামুদ্রিক এককোষী প্রাণী। দেখা গেছে এরা প্রবালের শুঁড় বা দাঁড়ায় বাসা বাঁধে। এই অ্যালগাইরাই প্রবালের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কিভাবে, তা কিন্তু আজও বৈজ্ঞানিকরা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তবে, অ্যালগাইরা আবার বিনিময়ে প্রবালের দেহস্থিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রেট এবং ফসফেট গ্রহণ করে।

অবশেষে আসি প্রবাল কিভাবে সামুদ্রিক দ্বীপ বা প্রাচীর তৈরি করে সেই কথায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, নতুন প্রবাল দ্বীপ গড়া প্রবালদের প্রায় পারিবারিক ব্যবসা। বংশ পরম্পরায় তারা গড়ে চলে প্রবাল দ্বীপ বা প্রবাল প্রাচীর। নতুন প্রবাল জন্ম নেবার পর তারা সরে আসে তাদের পুরনো ঘরসংসার ছেড়ে। ছেড়ে এসে প্রবাল দ্বীপের বা প্রাচীরের অন্য অংশে বাঁধে তাদের নতুন ঘরবাড়ি। মৃত্যুর পর প্রবালের নরম শরীর মিলিয়ে যায় সাগর জলে। কিন্তু থেকে যায় তার

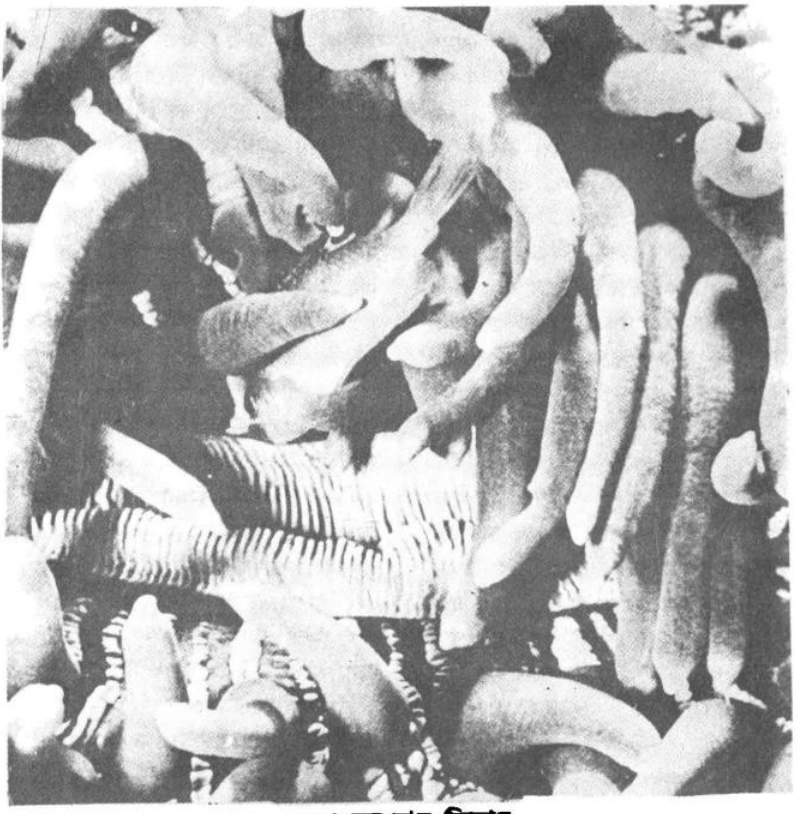

প্রবালের মাছ শিকার

বহিঃশরীরের শক্ত আবরণ। সেই আবরণ আকারে মাত্র এক ইঞ্চির ২৫ ভাগের এক-ভাগ। কিন্তু কোটি কোটি মৃত প্রবালের খোল জমে জমে একদিন দ্বীপের অন্য অংশ গড়ে উঠতে থাকে।

সবশেষে প্রবাল সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বোধহয় না বললেই নয়। শক্ত খোলা দিয়ে তৈরি যে প্রবাল দ্বীপ সেই প্রবাল দ্বীপ একদিন হয়ে ওঠে মানুষের বসবাসোপ-যোগী। সেখানে বেড়ে ওঠে গাছ-গাছালী —গাছের পাতায় বাসা বাঁধে সাগর বিহঙ্গের দল। আর সবচেয়ে যা আশ্চর্য তা হল, চারদিকে নোনাজলের অতলান্ত সাগর—কিন্তু দ্বীপের ভেতর যে জলের আধার তা কিন্তু মিষ্টি, মানুষ আর পশু-পাখির পেয়।

পুরাণে আছে মহাঋষি দধীচি নাকি নিজের বুকের হাড় দিয়েছিলেন ইন্দ্রকে বজ্র তৈরি করার জন্য। তাতে সাধিত হয়েছিল দেবতাদের সার্বিক কল্যাণ। তবে প্রবালকেও কি বলতে হবে এ যুগের সাগরী দধীচি। তার বুকের হাড় দিয়ে তিল তিল করে সে গড়ে তোলে সাগরের বুকে দ্বীপ—মানুষের ইপ্সিত ডাঙ্গাটুকু। □

আমাদের বাবা নজরুল ইসলাম

কল্যাণী কাজী

১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে আমি কাজী পরিবারের ছোট বৌ হয়ে আসি। বাবা, অর্থাৎ নজরুল তার অনেক আগে থেকেই অসুস্থ। ঠিক কবে থেকে তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন তা আমার পক্ষে সঠিক বলা মুশকিল। ১৯৩৯ সালে আমার শ্বাশুড়ি প্রমীলা কাজীর নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাত হওয়ায় বাবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ও নানারকম যোগ সাধনার দ্বারা তাঁকে ভাল করবার চেষ্টা করতে থাকেন। মা-র এই আকস্মিক অসুস্থতায় বাবা হয়ত খুবই মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। যতদূর জানি ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই বাবার অসুস্থতার খবর প্রথম সবাই জানতে পেরেছিলেন। বাবা ঐ দিন বেতারের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। এর কিছুদিন আগে থেকেই বাবার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। মায়ের কাছে শুনেছি ঐ অনুষ্ঠানে বাবা কিছুই বলতে পারছিলেন না। তখন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অসুস্থতার কথা ঘোষণা করেন। এছাড়া আমার স্বামী কাজী অনিরুদ্ধের মুখে শুনেছি রূপবাণীতে কোনও একটি সিনেমার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গিয়ে হঠাৎ প্রখ্যাত নট প্রয়াত ধীরাজ ভট্টাচার্যের গালে চড় মেরে বাবা বেরিয়ে এসেছিলেন। মনে হয় বাবা হয়ত এসময় থেকেই ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন।

আমার খুবই দুর্ভাগ্য যে, বাবা এবং মা-কে সুস্থ অবস্থায় পাইনি। তবুও যতটুকু সময় তাঁদের কাছে থেকে সেবা করবার সুযোগ পেয়েছি তাতেই আমি ধন্য। যতটুকু শুনেছি পারিবারিক জীবনে সুস্থ অবস্থায় তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, স্নেহশীল পিতা এবং অত্যন্ত অতিথিবৎসল। বন্ধু বা সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই উদার। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে না খেয়ে যেতে পারতেন না। এটা বাবার সুস্থ অবস্থা থেকেই চলে আসছিল। এ বাড়িতে থেকে কত ছেলেমেয়ে যে মানুষ হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। অথচ তেমন অর্থস্বাচ্ছন্দ কোনকালেই ছিল না।

মা বলতেন, তিনি অসুস্থ হবার পর বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতেন এবং মাকে সঙ্গ দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে তাস খেলতেন। ছেলেরা ছিল তাঁর নয়নের মণি। বুলবুলদাদা মারা যাবার পর বাবার মানসিক বিপর্যয়ের খবর আজ সকলেরই জানা। শুনেছি, উন্মত্ত অবস্থায় বাবাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হত। একবার আমার স্বামী দুষ্টুমি করায় তাঁর দিদিমা (গিরিবালা দেবী) বাবার ঘরে তাঁকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। বাবা স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে জানলার আলগা গরাদ দু হাতে বেঁকিয়ে আমার স্বামীকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়েও দেখেছি নাতি-নাতনিরা কেউ কাঁদলে তাদেরকে দেখিয়ে কোলে তুলে নেবার ইশারা করতেন। একবার আমার বড় ছেলেকে দোলনা থেকে তুলে নিয়ে মায়ের কাছে দেন। আমি যে

তাঁর ছেলের বৌ একথা ভালই বুঝতেন। কারণ তাঁকে পরিচর্যা করার সময় কখনই তাঁকে বিরক্ত হতে দেখিনি।

মায়ের নিম্নাঙ্গ অবশ হলেও অদ্ভুত মনের জোরে শুয়ে শুয়ে তরকারি কুটতেন, আমাদের খাবার তদারকি করতেন, বাবাকে খাইয়ে দিতেন, নাতি-নাতনির জন্যে জামা সেলাই করতেন—এমন কি স্টোভটা কাছে এনে দিলে শরীরের অর্ধেকটা উঠিয়ে মাঝে মাঝে রান্নাও করতেন। মায়ের ঘরেই আমাদের প্রায় সারাদিন কাটত, আর মায়ের চওড়া নিচু চৌকিটাই ছিল আমাদের গল্প করার জায়গা। অসুস্থ হবার পর বাবা যেহেতু বেশি লোকজন পছন্দ করতেন না তাই বাবা একটা আলাদা ঘরেই সারাদিন থাকতেন। টালা পার্কের বাড়িতে আসার পর বাবা-মা একই ঘরে ছিলেন। তবে লোকজন এলে ঘরে একটা পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হত। বাবা যে কখন ঠিক ঘুমোতেন বলা মুশকিল। সারাদিন ঝড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। আমাদের বাড়িতে কোন ঘরেই দরজা বন্ধ করা হত না। বাবা রাতে মাঝে মাঝেই উঠতেন বলে মাকে সারারাত জেগে থাকতে হত। ঘরের বাইরে বাবা গেলে মা যখনই বলতেন 'এদিকে এস', বাবা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরে এসে শুয়ে পড়তেন। সকালে আমরা ঘুম থেকে ওঠার পর মা ঘুমোতে যেতেন। এছাড়া কখনও বাবা জানালার গরাদ ধরে আকাশের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন। আবার কখনও মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ বা যে কোন কাগজ চোখের সামনে তুলে দেখতেন। কিছুক্ষণ পরেই কাগজটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলতেন অথবা গোটা কাগজটাই বালিশের নিচে রেখে দিতেন। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার! —ছাতা ও চশমা পরা লোক দেখলেই রেগে যেতেন।

বাবা বেঁচে থাকতে প্রতি বছরই তাঁর জন্মদিনে আমাদের বাড়িটা উৎসবের চেহারা নিত। জন্মদিনের ব্যাপারটা বাবা

চুরুলিয়ায় নিজের পরিবারের সঙ্গে নজরুল

খুবই ভাল বুঝতেন। সকাল থেকেই তাঁর মুখে একটা খুশির ভাব লেগে থাকত। স্নান করিয়ে যখন জামা কাপড় পরাতাম তখন নিজেই পাঞ্জাবির বোতামটায় হাত দিয়ে দেখতেন ঠিক লাগান হয়েছে কি না। অন্য সময় মুখে পাউডার মাখাতে গেলে বিরক্ত হতেন, কিন্তু জন্মদিনে হাসতে হাসতেই পাউডার মাখতেন। তারপর সভায় নিয়ে গেলে নিজে থেকেই বেশ গুছিয়ে বসতেন। বাবার জন্মদিনে (১১ জ্যৈষ্ঠ) আমাদের বাড়িটা যেন তীর্থক্ষেত্র হয়ে যেত। সকাল থেকেই জৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে দেশবাসী তাঁদের প্রিয় কবিকে একপলক দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মা বেঁচে থাকতে জন্মদিনে খাওয়ানর ব্যবস্থাও ছিল টালাও। এই টালা পার্কের বাড়িতেই মা মারা যান। আমার শ্বাশুর কাজী সব্যসাচী যেদিন বাবাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে এলেন—বাবা তখন কিছুতেই মায়ের ঘর থেকে বেরতে চাইছিলেন না। প্রচণ্ড চিৎকার করছিলেন। সিঁড়ির কাছে এসেও মায়ের ঘরের দিকে তাকাচ্ছিলেন বারবার।

নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা

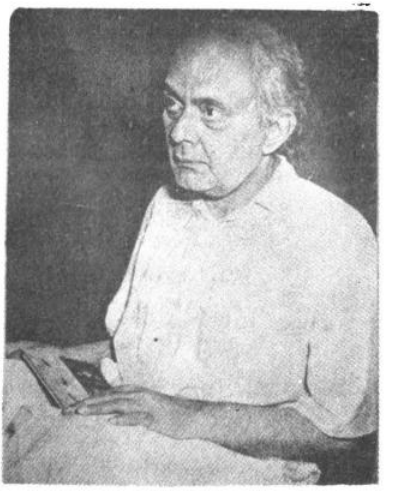

নজরুল

যখন আমার স্বামী বললেন, 'বাবা, চল গাড়ি করে বেড়াতে যাই'—তখন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলেন। সেদিন আমরা কেউই চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। আজও সেই দৃশ্যের কথা ভাবলে চোখ সজল হয়ে আসে।

টুকরো টুকরো কত কথাই ত মনে পড়ছে। বাবা গাড়ি চড়তে খুব ভালবাসতেন। একটা গাড়িও কিনেছিলেন একবার হাজারিবাগে বাবা-মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। বিকেলে বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরতাম। বাবা খুব জোরে হাঁটতেন। পাল্লা দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠতাম। গাড়িতে উঠলে গাড়ি যখন ব্যাক করান হত তখন বারেবারেই বাবা পেছন দিকে তাকিয়ে দেখতেন কিছু আছে কি না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবর রহমান যেবার প্রথম কলকাতায় ময়দানে ভাষণ দিতে এলেন, তখনই তিনি আমার স্বামী আর শ্বাশুরকে ডেকে পাঠালেন রাজভবনে। আমিও সঙ্গ নিলাম। তখন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক

স্ত্রী-পুত্রসহ নজরুল

খানময় পর্ব চলছে। শেখ সাহেব প্রস্তাব করলেন বাবার সামনের জন্মদিন (২৫ মে, ১৯৭২) ঢাকায় পালন করবার জন্য। ওঁরা দুই ভাইয়েই রাজি হলেন। ঠিক হল ১৯৭২-এর মহান একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দেব এবং সেই সময়েই বাবার থাকার জায়গা ঠিক করে আসব। সেইমত আমি, আমার স্বামী এবং ভাশুর সব্যসাচী ঢাকায় গেলাম শেখ সাহেবের অতিথি হয়ে। যে অভ্যর্থনা আমরা পেয়েছিলাম তা ভাবলে আজও রোমাঞ্চ জাগে। যাই হোক, শেখ সাহেবের বাড়ির কাছেই ধানমুণ্ডিতে একটি বাড়ি ঠিক করে আমরা ফিরে এলাম।

এরপর ২৩ মে (যতদূর মনে পড়ে) বাবাকে নিয়ে আমরা ঢাকায় পৌঁছলাম। ঢাকা বিমান বন্দরে থইথই লোকের ভিড়। ভিড়ের সেই চাপে বাবাকে কিছুতেই প্লেন থেকে নামান যাচ্ছিল না। শেষে অতিকষ্টে অ্যামবুলেন্সের গাড়িতে বাবাকে কোন রকমে ঢুকিয়ে বিমান বন্দর থেকে বার করা হল। তাতেও নিস্তার নেই। অবিরাম জনস্রোত বইতে থাকে সেই 'কবিতীর্থ' অভিমুখে। প্রত্যেকেই কবিকে একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। সেবার ঢাকায় খুবই সমারোহে কবির জন্মদিন পালিত হয়। এরপরে আমরা কয়েকদিন ছিলাম। শেখ মুজিবর রহমান, রাষ্ট্রপতি জনাব আবু সঈদ চৌধুরী ছাড়া বহু গণ্যমান্য লোক দু-বেলা কবির স্বাস্থ্যের খবর নিতেন। কিছুদিন বাদে আমরা কলকাতায় ফিরে

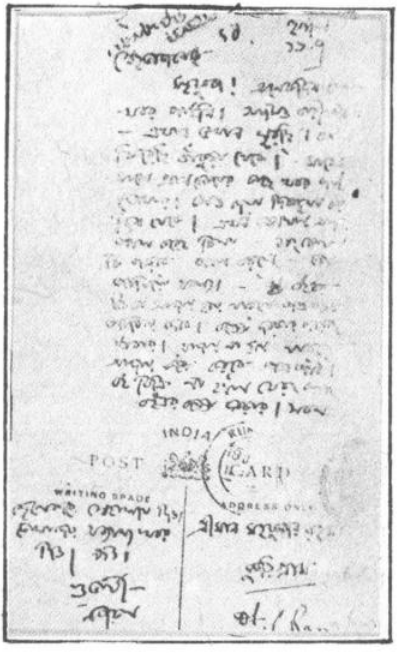

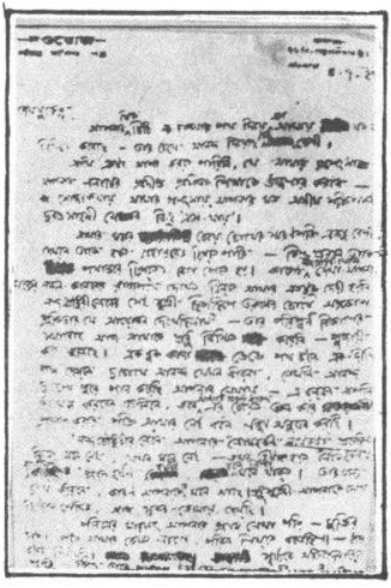

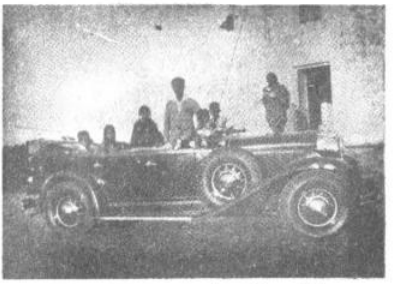

নজরুলের কেনা সেই গাড়ি

আসিস। বাবার কাছে রইলেন সব্যসাচীর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। ক্রমশই বাবার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছিল। এক সময় ঠিক হল কলকাতায় ঐ রকম একটা খোলামেলা বাড়ির ব্যবস্থা করে বাবাকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আমার স্বামী হঠাৎই মারা গেলেন ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪-এ। সে বছর কবির জন্মদিনে ঢাকা যাবার জন্য আমাদের দু-জনেরই পাশপোর্ট করা হয়ে গিয়েছিল। অনিরুদ্ধের এই আকস্মিক মৃত্যু আমায় এতদূর হতভম্ব করে দিয়েছিল যে, আমার মনে হল বাবাকেও যদি আর না দেখতে

শ্যামা-সঙ্গীত

স্তুতি-

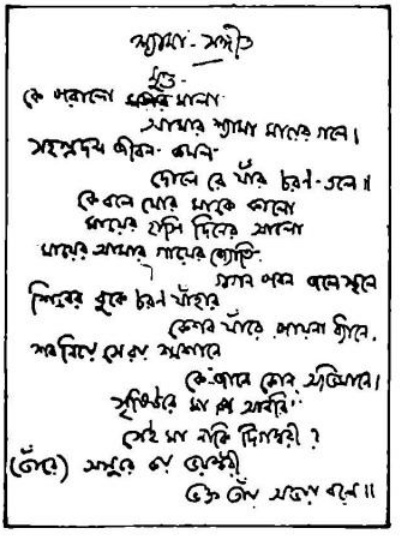

কে পরালো মুণ্ডমালা
আমার শ্যামা মায়ের গলে।
সহস্রদল জীবন-কমল
দোলে রে যাঁর চরণ-তলে॥
কে বলে মোর মাকে কালো
মায়ের হাসি দিনের আলো
মায়ের আমার গায়ের জ্যোতি
গগন পবন জলে স্থলে
শিবের বুকে চরণ যাঁহার
কেশব যাঁরে পায়না ধ্যানে.
শব নিয়ে সে রয় শ্মশানে
কে জানে কোন অভিমানে।
সৃষ্টিরে মা পালন করি
সেই মা নাকি দিগম্বরী?
(তোরে) সাধুরে ও ভিখারী
ভক্ত তাঁর সত্য বলে॥

পাই! সেই মত মনস্থির করে আমার বড় ছেলে অনির্বাণকে নিয়ে বাবার জন্মদিনে ঢাকায় গেলাম। সেই আমার শেষ বাবাকে দেখা। সেই সময় শেখ সাহেব গণভবনে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন আমরা যদি চাই তবে বাবাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তখন বাবার যাবতীয় দায়-দায়িত্বের ভার ছিল সব্যসাচীর ওপর, তাই কিছুই বলতে পারিনি।

তারপর কি ঘটনা ঘটেছিল অল্প-

ঘরের এই জানলা দিয়েই নজরুল আকাশ দেখতেন

বিস্তর তা সবাই জানেন। শেখ মুজিবের হত্যা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা —এসব ভালভাবে মিইয়ে যেতে না যেতেই বাবার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। দিনটা ছিল ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬। আমাদের পাশপোর্ট ভিসা কিছুই ছিল না। এদেশের সরকার অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আমাদের ছেড়ে দিলেন। আমি আর আমার ভাশুর যখন উদভ্রান্তের মত ঢাকায় পৌঁছলাম তখন বাবা মাটির নিচে চির ঘুমের রাজ্যে চলে গেছেন। কি আর করা! বাবার ফুলে ঢাকা সমাধি থেকে মাটি নিয়ে পরদিনই ফিরে এলাম কলকাতায়।

শেষ ছবি: অলকেশ পাত্র

অন্যান্য ছবি:

কল্যাণী কাজীর সৌজন্যে

বিদ্যালয় পরিচিতি

পড়ার সঙ্গে খেলাধূলা সমান তালে চালাচ্ছে ঃ মালদা জিলা স্কুল

তাপসকুমার ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বিনয় সরকার, আই. সি. এস করুণাকেতন সেন এবং একালের ফুটবল খেলোয়াড় সুভাষ ভৌমিক যে স্কুলটিতে পড়াশুনা করেছেন সেটি মালদা জিলা স্কুল। কিন্তু এমন স্কুলেও ১৮৫৮ থেকে ১৯৮১ এই ১২৪ বছরের মধ্যে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় মাত্র তিনবার তিনজন ছাত্র প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছে। ১৯৪৫-এ ষষ্ঠ স্থান। ১৯৫৭তে পঞ্চম স্থান এবং ১৯৮১-তে সপ্তম স্থান। তবুও প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে ৬০ থেকে ৮০ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয় তারা প্রায় সকলেই উত্তীর্ণ হয়।

পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় এক হাজার ছাত্র নিয়ে এখন স্কুলটি রাজমহল রোডের দক্ষিণে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার স্কোয়ার ফুট জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও এই স্কুলটির সূচনা কিন্তু ১৮৫৭ সালে, মহানন্দার পাড়ে এস. পি-র বাংলোর একটি ঘরে। কটি ক্লাশ ছিল, কত ছিল তখন ছাত্র, শিক্ষকমশাই বা ছিলেন কজন, এখন আর এসব কিছুই জানার উপায় নেই। বর্তমান ভবনটিতে স্কুল শুরু ১৯৫৮ সালে।

হিন্দু আর মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্র থাকার ফলে এই স্কুলে হোস্টেলও আছে দুটি। একটি হিন্দু ছাত্রদের অন্যটি মুসলমান ছাত্রদের। মুসলমান ছাত্রদের জন্য

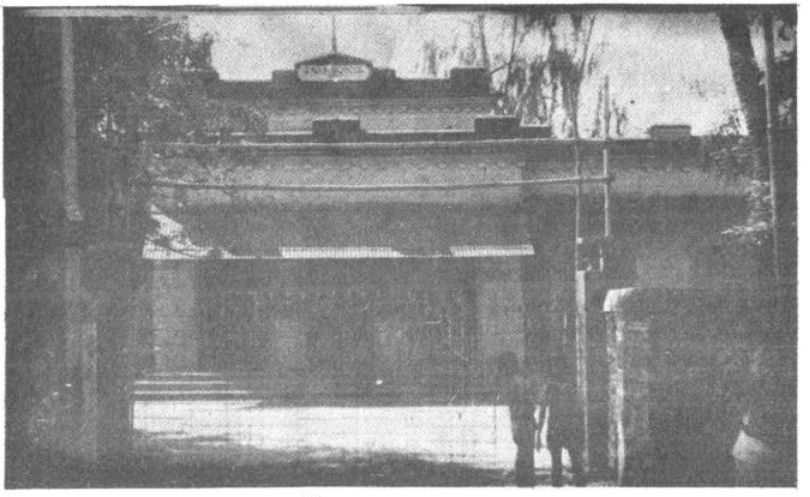

মালদা জিলা স্কুল ভবনের সম্মুখভাগ

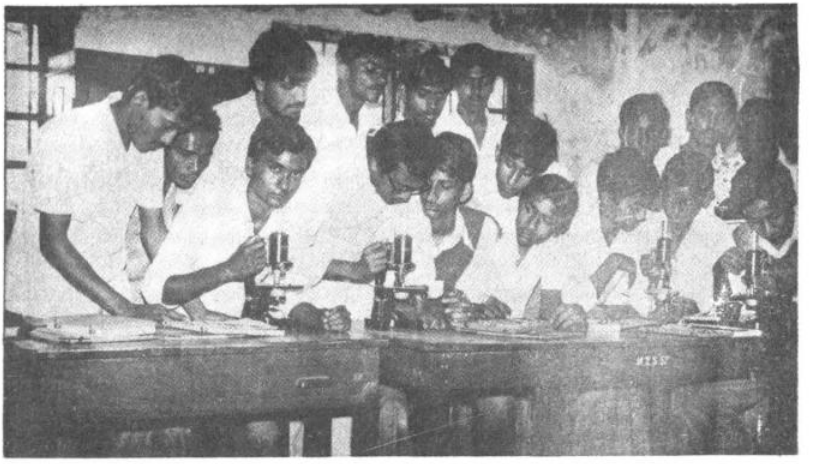

বায়োলজি ল্যাবরেটরি

এই স্কুলে আর একটি বিশেষ সুযোগ আছে। প্রতিদিনই চতুর্থ পিরিয়ডের পর ৩০ মিনিটের টিফিন হলেও প্রতি শুক্রবার টিফিনের সময় তৃতীয় পিরিয়ডের পর এক ঘণ্টা। কারণ, ঐদিন নমাজ পড়তে হয় ওদের। অবশ্য টিফিনের এই সুযোগ পায় সব ছাত্রই।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি প্রতি বছরই হয়। এবারও ২৪ ফেব্রুয়ারি ছিল অনুষ্ঠান, প্রধান শিক্ষক নির্মল চন্দ্র ভৌমিক ব্যস্ত ছিলেন তাই নিয়ে। ব্যস্ততার মধ্যেও স্কুলটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন বিস্তৃতভাবে। তবে খুঁজে পাওয়া গেল না স্কুলটির শতবর্ষপূর্তিকালের স্মরণিকাটি।

দেখলাম একজন হিতৈষী মানিঅর্ডার করে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন ছাত্রদের পুরস্কার, উপহার প্রভৃতি ব্যয় বাবদ। বার্ষিক পুরস্কারের টাকা আসে এই-ভাবেই—শিক্ষক আর জনসাধারণের সহযোগিতায় কেনা হয় বই, কাপ, মেডেল। সরকারী সাহায্যে আসে বছরে ৩৫০ টাকা। শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং স্কুলের বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও সরকারী কোন আনুকূল্য নেই, শিক্ষক আর অভিভাবকদের সহযোগিতাই ভরসা।

প্রধান শিক্ষক সহ ৩৯ জন শিক্ষক থাকার কথা, আছেন মাত্র ৩০ জন। অশিক্ষক কর্মীর ৩ জনের ১ জন নেই। ল্যাবরেটরি আছে। লাইব্রেরি থাকলেও, লাইব্রেরিয়ানের অভাবে কোনরকমে কাজ চালান হচ্ছে। বই ৪০০০।

খেলাধুলোর ব্যবস্থাটা খুবই ভাল। স্কুলের ভিতরেই মাঠ। তাছাড়াও বাইরে এই জেলার মধ্যে মাত্র বিবেকানন্দ বিদ্যা-মন্দির আর মালদা জিলা স্কুলেরই নিজস্ব ফুটবল মাঠ রয়েছে। মরশুমের সব খেলাই সেই মাঠে হয়। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি ইনডোর গেমের ব্যবস্থা আছে—চাইনিজ চেকার, লুডো, ক্যারম, বাগাডুলি প্রভৃতি। কর্মশিক্ষায় বুক বাইণ্ডিং, সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং দেওয়া হয়। এন. সি. সির দুটি গ্রুপ ছিল, এখন নেই অফিসর অবসর গ্রহণ করায়। জেলা ও রাজ্যস্তরে নানা ধরনের খেলাধুলোয় এখানকার ছাত্ররা কৃতিত্বের অধিকারী। যেমন: রণজিৎ নাথ (সাটপাট), মহম্মদ এনতাকিয়া, সনৎ

হাজরা (দৌড়)।

ভাল ছাত্ররা স্কুলে ত বটেই, শিক্ষকদের বাড়িতে গিয়েও সবরকম সহায়তা পেয়ে থাকে। পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের নানাভাবে ক্লাশেই সাহায্য করা হয়, যাতে তারা এগিয়ে যেতে পারে। ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষকের অভাবে টিউটোরিয়াল ক্লাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শুধু পড়াশোনাতেই নয়, নানা রকম সমাজসেবার সঙ্গেও ছাত্র শিক্ষকরা জড়িত। বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষে দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ছাত্ররা। এ বিষয়ে ছাত্ররা খুবই শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ন্যায়-পরায়ণ।

এই স্কুলটির আরও একটি বিশেষত্ব, এখানে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের একটি মিউজিয়ম আছে, যেখানে দেখা যাবে, চিত্রিত ইট, কষ্টিপাথরের বৃষ, পাথরে খোদাই মূর্তি। কিন্তু কর্মীর অভাবে মিউজিয়মটিকে প্রদর্শনীর জন্য খোলা রাখা যাচ্ছে না।

আর এক বছর বাদে স্কুলটির ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব। এই মুহূর্তে দেশের ছাত্র সমাজের প্রতি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কিছু বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বললেন, স্বাধীনতার পরে নীতিবোধের এবং নিষ্ঠার খুবই অভাব হয়েছে। যার ফলে আমরা

প্রধান শিক্ষক

দেখছি নানাদিকে জাতীয় চরিত্রের স্খলন। আজকের যারা ছাত্র, তারা ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিক। এরা যদি নীতিবোধসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান হয় দেশকে ভালবাসতে শেখে, আমার মনে হয় তাতে আমাদের এখন যে-সমস্ত সমস্যা আছে সেগুলো আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। আসল কথা হল, দেশের মঙ্গল, আমাদের সকলের মঙ্গল, দেশ যদি বাঁচে আমরা বাঁচব, দেশ ডুবলে আমরা সকলে ডুবব। আজকের প্রত্যেকটি ছাত্রকে এই বোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এই—আর কি!

আলোকচিত্র ঃ জগদীশচন্দ্র মল্লিক

কথার কথা

অ্যান্থোলজি (anthology) কথাটা দুটি গ্রীক কথা জুড়ে তৈরি। অ্যানথো মানে ফুল, এবং লোজিয়া মানে সংগ্রহ। পুরো কথার তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে ফুল সংগ্রহ। পরে অ্যান্থোলজিয়া কথাটা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বদলে হয় অ্যান্থোলজি। এর অর্থও বদলে যায়—কোন সম্পাদক যখন বিভিন্ন লেখকের নান লেখা একসঙ্গে জড়ো করে প্রকাশ করেন তখন তার নাম দেন অ্যান্থোলজি। সাহিত্য (ফুল) সংগ্রহ হচ্ছে তখন তার অর্থ। আবার একই লেখকের বিভিন্ন রচনা এক বা একাধিক খণ্ডে প্রকাশ করার সময় তার নামও দেওয়া হয় অ্যান্থোলজি।

(পাঁচ)

পাণ্ডে সাহেব, আবারও বললেন, জীপ ঘুমাইয়ে গুহাসাব। জান বাঁচাইয়ে। অত্যন্ত করুণ অবস্থা। জীপ ব্যাক করে সোজা করলাম। বাঘটা জীপ থেকে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল।

বাঘ দেখার উত্তেজিত আলোচনা। পাণ্ডে সাহেব, চক্রবর্তী ও বিবেকবাবুর মধ্যে শেষ হতে না হতে, ম্যাজিসিয়ান পি সি সরকারের অশেষ 'ওয়া—টা—র অব ইণ্ডিয়ার মতই 'টাইগার অফ ইণ্ডিয়ার'—আর একটি চমকে দেওয়া অনবদ্য বাঘকে পথের বাঁদিকে একটি ছোট্ট দোলার পাশে খোলা জায়গায় বসে থাকতে দেখা গেল। অটাওয়ার পৃথিবী বিখ্যাত পোট্রেট—ফোটোগ্রাফার কার্শ সাহেবই যেন তার ছবি তুলবেন এক্ষুনি। এমনি পোজ দিয়ে বসেছিল সে। কিন্তু আমরা তাকে ছবি তুলে ওবলাইজ করলাম না। বিবেকবাবু প্রথম বাঘ দেখার পর বাঘ দেখার আর সম্ভাবনা নেই সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে বাঁ-পাটাকে বের করে জীপের বাইরের পা-দানীতে রেখেছিলেন। হাত দিয়ে স্যালুট না করে, দু নম্বর বাঘকে তিনি পা দিয়ে সশব্দে একটি স্যালুট ঠুকে দিয়ে, সড়াৎ করে বাঁ-পাটাকে জীপের ভেতরে করে ফেললেন স্মার্টলী।

দু নম্বর বাঘ কথা বলল না। বাঙলা অথবা রাজবংশী অথবা নেপালী কিংবা হিন্দি কোন ভাষাতেই না। শুধু বৈঠক মারার মত এক ঝটকাতে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই, জীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি জীপ তবুও বাঁদিকে করে হেড লাইটের আলো ফেললাম ভালো করে। কিন্তু বাঘটা মনে হল একটু বদ-মেজাজী। এঞ্জিন রেস করার আওয়াজ হতেই সে একবার গরর্ করে উঠল। পাণ্ডে সাহেব আমাকে হঠাৎ স্টীয়ারিং শুদ্ধ্ জাপটে ধরে বললেন, 'এক বাঘই কাফফি হ্যায়! দো বাঘ সে হাম লোগ ক্যা করু' ?'

আমি কিন্তু কোন জঙ্গলেই বাঘেদের এমন অসভ্য ব্যবহার করতে দেখিনি। বাঘ, ডোণ্ট কেয়ার করে চলে যায়। একবারই কেবল উড়িষ্যার কালাহাণ্ডীর জঙ্গলে একটা বাঘ জীপের ওপরে প্রায় চড়ে এসেছিল। কিন্তু তার অসদ্ব্যবহারের সঙ্গত কারণ ছিল। আমার এক বন্ধুর রাইফেলের গুলি লেগেছিল তার পেটে।

পুরুষ মানুষকে কাঁদো-কাঁদো দেখে, মেয়ে বাঘটা লজ্জা পেয়ে ফিরে গেল।

মাদারীহাটের পেট্রল পাম্প থেকে তেল নিয়ে এক কাপ করে চা খেয়ে,

আমরা আবার হলং লজ-এর দিকে ফিরে চললাম। দু দুটি ঝলমলে চামড়ার বাঘ দেখার পরও নিজের চামড়া অক্ষত থাকায় পাণ্ডে সাহেব খুবই খুশী ছিলেন। কিন্তু কথায় বলে, 'খুদাহ্ যব্ দেতা, ছপ্পড় ফাড়্কে দেতা।' এক কিলোমিটার যেতে না যেতেই দেখি, পথের বাঁ পাশের হলং নদীর ডানদিকের পাড় ধরে সোজা লেজ দুলিয়ে হেঁটে চলেছে প্রকাণ্ড এক বাঘ—। এটিও টাইগার।

পাণ্ডে সাহেব আবারও বাঘ দেখে বললেন, আউর নেহী। কাফি দেখ্ লিয়া। ব্যসস্ কিজিয়ে। ব্যসস—স।

বাঘটা বোধহয় সে কথা শুনে থাকবে।

শুনে নিশ্চয়ই মনে খুব কষ্টও পেয়ে থাকবে। আগের বাঘ ও বাঘিনীকে দেখে আমরা পুলকিত হলাম, আর সে কিনা একবার দেখার ও অযোগ্য? তার লেজ ও পিঠে-পড়া হেড-লাইটের পিছনে যাওয়া আলো এবং পেট্রল-জীপের মিশ্চি আওয়াজ অগ্রাহ্য করে কোমর দুলিয়ে নদীর পাশে পাশে হেঁটে যেতে লাগল অভিমানে মুখ-নামানো ছেলেমানুষ বাঘটা।

কিছুক্ষণ বাদ আমাদের পাইলটিং করে নিয়ে গেল। পথটা যেখানে নদী ছেড়ে ডানদিকে ঢুকল, সেখানে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল আমাদের।

জঙ্গলে আমি নিজে কম ঘুরিনি এবং কম লোকের সঙ্গেও ঘুরিনি। বাঘিনীর সঙ্গে প্রায় বড় হওয়া বাচ্চা দেখেছি। কিন্তু চোদ্দ কিলোমিটার যাতায়াতের পথে আধ ঘণ্টার মধ্যে এমন বড় বাঘের মহা সম্মেলন কখনও ঘটেনি। পাণ্ডে সাহেবের বরাত খুব ভাল। এমন 'টাইগার লাক' সত্যিই দেখা যায় না।

উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে নানারকম প্রাচীন গাছ আছে। এখানে শাল-সেগুন দেখার মত। ভারতীয় এক-শিঙ গণ্ডার বড় বাঘ, চিত্রল হরিণ, শুয়োর, শম্বর, বুনো মোষ, হাতী, শজারু ইত্যাদি নানা জানোয়ারই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তোর্ষা নদের খামখেয়ালে তার ফেলে যাওয়া পুরনো নদী পথটিতে আদিগন্ত ঘাস বন। সেই পুরনো নদী পথ, নুড়ি ও বালিময়। পুড়ুণ্ডী ঘাসের বন—চওড়া সতেজ সবুজ পাতা। নল বন। শিশু গাছ সরু সরু। রাই সেগুন। আর প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড শিমুলের সটান সারি। পুড়ুণ্ডীর গোড়া তুলে স্থানীয় লোকেরা তরকারি করে খায়। পুড়ুণ্ডীর পাতাও খেতে খুব মিষ্টি।

তোমরা হয়ত জান না যে আমাদের দেশের বনজঙ্গলের লোকেরা বড়ই গরীব। তারা যে কত গরিব, তা তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের আশেপাশে ও ভেতরে যে সব মানুষজনের বাস তারাও নানারকম মূল কুড়িয়ে ও খুঁড়ে খায়. ভাল্লুক শুয়োর শজারুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, বিহার, উড়িষ্যা বা মধ্যপ্রদেশের জংলী লোকেদেরই মত। এখানে শিমুলতরু বলে একরকম মূল হয়। ছোট ছোট গাছের নিচে—সে গাছেদের পাতা আলু গাছের পাতার মত দেখতে। সোনি আলু হয়—দেখতে ওলের মত। আর চিকনি আলু হয় লাল। একরকমের মূল পাওয়া যায়, তার নাম বীজ আলু। বিষ। খুব ভাল করে ধুয়ে না খেলে মানুষ মরে যেতে পারে সে আলু খেয়ে। অনেকবার সেদ্ধ করে নিয়ে তবে ওগুলো খায়। পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা।

তোমরা কেউ হলং বা জলদাপাড়া গেছ কিনা জানি না। হয়ত কেউ কেউ গেছ। হয়ত অনেকেই যাওনি, ভবিষ্যতে যাবে। অনেকে হয়ত প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কখনই যেতে পারবে না। যারা পারবে না যেতে, তারা চল এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে, এই শীতের সকালে হাতীর পিঠে চড়ে, জলদাপাড়ায় গণ্ডার এবং অন্যান্য জানোয়ার দেখে আসবে।

কোন হাতীর পিঠে চড়বে বল ? এখানে হাতীগুলোর নাম ভারী সুন্দর। মেঘাঙ্গীনি, বাতাসী, সুলোচনা আর প্রিয়ংবদা। এরা হল মেয়ে হাতী। পুরুষ হাতীদের মধ্যে চন্দ্রচূড়, নীলকান্ত আর রাজকান্ত। তুমি কোন হাতীর পিঠে চড়ে যাবে বল ? মাহুতরাও কিন্তু কম নয়। তাদের প্রত্যেকের কাছে আছে ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প আর স্মৃতি।

সব মানুষ সকলের সঙ্গে মিশতে পারে না। বিশেষ করে দু পাতা ইংরিজী-বাঙলা পড়ে আর ধোপদুরস্ত জামা গায়ে দিয়ে আমরা এই ভদ্রলোকেরা সারা দেশের মানুষদের ছোট করে দেখি। কিন্তু যে-শিক্ষা সব মানুষকে সমান করে না দেখতে শেখায় সমান ব্যবহার, সমান মর্যাদার সঙ্গে, সেই শিক্ষা কী শিক্ষা আমার ত লেখাপড়া-জানা দাম্ভিক শহুরে মানুষদের চেয়ে এইসব জঙ্গল-পাহাড়ের মানুষদের সঙ্গে চিরদিনই মিশতে অনেক বেশি ভাল লাগে। রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ইত্যাদি ভারতীয় মহাগ্রন্থ থেকে এবং গুরুজনদের মুখে মুখে শুনে যে শিক্ষা পেয়েছে এরা, সেই শিক্ষাই মূল ভারতীয় শিক্ষা। অতিথিপরায়ণতা, বিনয়, সততা এবং সহ্যশক্তিতে এরা শহুরে লোকদের থেকে অনেকেই ভাল।

কোন মাহুতদাদার সঙ্গে যাবে বল ? শ্যামসুন্দর কর্মকার আছেন। তাঁর উত্তরপুরুষ উত্তরবঙ্গের নামী ডাকাত ছিলেন—যাঁর নাম বীরেন কাঠাম। তিস্তার পারে গভীর জঙ্গলের মধ্যের কাঠাম-বাড়ি জায়গাটা হয়ত এই বীরেন কাঠামেরই ঘাঁটি ছিল। সঠিক বলতে পারব না। ধনবাহাদুর দর্জি আছেন। কালো, নেপালী। এঁদের সঙ্গে যেতে-না-চাও ত আছে নাটুখড়িয়া আর রঘু খড়িয়া।

জলদাপাড়া রেঞ্জে সবশুদ্ধ বারটা বীট আছে। ওঃ, তোমাদের বুঝি এখনও বলিনি জঙ্গল কীভাবে ভাগ হয় বনবিভাগের নিম্নতম কর্মচারী হচ্ছেন ফরেস্ট গার্ড। তার উপরে বীট অফিসার বা ফরেস্টার। অনেকগুলো ফরেস্ট বীট নিয়ে একটি রেঞ্জ হয়। সেই রেঞ্জের দায়িত্ব যাঁর ওপর থাকে তাঁর নাম রেঞ্জার। অনেকগুলো রেঞ্জ নিয়ে হয় একটি ডিভিশান। ডিভি-

শানের গিনি মাথা, তাঁকে বলা হয় ডিভিশানাল ফরেস্ট অফিসার বা ডি-এফ-ও। ডি-এফ-ওর ওপরে থাকেন কনসারভেটর অফ ফরেস্টস। বেশ কিছুদিন হল এক এক এলাকায় এক-একজন কনসারভেটর নিযুক্ত হচ্ছেন, ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই। আগে মাত্র একজন কনসারভেটর থাকতেন। কনসারভেটরদের ওপরে থাকেন চীফ-কনসারভেটর। বনবিভাগ কিন্তু রাজ্য সরকারের আয়ত্তে। সব রাজ্যেই। যদিও কেন্দ্র কো-অর্ডিনেট করেন। তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই আই-এ-এস পরীক্ষার কথা জান এবং অনেকেই হয়ত এই পরীক্ষাতে বসবেও সময় হলে। আই-এ-এস হল ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস আর আই-এফ-এস হল ইণ্ডিয়ান-ফরেস্ট-সার্ভিস। দেরাদুনে ফরেস্ট ইনস্টিট্যুট আছে দেখার মত। অনেক কৃতী ছাত্র এই পরীক্ষায় বসে ও কৃতকার্য হয়ে বনবিভাগে যোগ দিয়েছেন।

তোমাদের মধ্যে যারা বনজঙ্গল ভালবাস এবং জীবিকা হিসেবে এমন নির্জন ও সবুজ জীবন বেছে নিতে চাও তারা এই পরীক্ষাতে বস। পরীক্ষা আই-এ-এসই। সবচেয়ে ভাল যারা করেন, তাঁদের দেওয়া হয়, ফরেন সার্ভিস। ভারতের সবচেয়ে কৃতী ছেলে-মেয়েরা এই সার্ভিসে যোগদানের সুযোগ পান। তারপর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস মানে, আই-এ-এস। আই-এ-এস এর যোগ্য নম্বর যাঁরা না পান তাঁদের রেভিনিউ, পুলিশ, ফরেস্ট ইত্যাদি সার্ভিসের মধ্যে যে-কোন সার্ভিস বেছে নিতে বলা হয়। অবশ্য যাঁরা বিদেশে যেতে চান না এবং শাসন-টাসন বেশি পছন্দ করেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আই-এ-এস-এর যোগ্য নম্বর পেয়েও অনেকে নিজের রুচি অনুযায়ী অন্য সার্ভিস নিতে পারেন। আশা করব ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে অনেকেই বনবিভাগের অফিসার হয়ে দেশের বন ও বনসম্পদকে রক্ষা এবং উন্নত করবে।

এখনও ভোর হয়নি। তোমার দরজায় ধাক্কা দিয়ে চা দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে, তৈরী হয়ে নিচে নেমে তুমি দেখলে সারি দিয়ে হাতীগুলো দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর পিছনে। দূরে, যেখানে হাতীগুলো বাঁধা থাকে, বনবিভাগের কর্মীদের কোয়ার্টারের সামনে সেখানে এখনও আগুন জ্বলছে। মাহুতরা আগুন পোহাচ্ছিল। যা শীত।

সকলে মিলে হাতীতে চড়তে চড়তে আকাশ ফর্সা হয়ে এল। কিন্তু ভোর হয়নি। শুকতারা এবং চাঁদ তখনও আকাশে। হলং বাংলোর পিছনে যে মাটির পায়ে চলা পথটি চলে গেছে সেই পথে চলল হাতীগুলো। সামনেই একটি শিমুলগাছ। অতি প্রাচীন। আমার ঠাকুর্দার জন্মেরও আগে তার জন্ম। অথচ কেমন সটান দাঁড়িয়ে আছে। গরমে যখন ফুল আসবে এই গাছে, তখন কেমন লাগবে, ভাবছিলাম। মগডালে একটি বড় সাদা-বুক ঈগল বসে আছে। শিমুল ফুল যখন ঝরে পড়ে নিচে তখন কোটরা হরিণ (বার্কি ডিয়ার) এসে সেই ফুলের গোড়া খেতে খুব ভালবাসে। আমি নিজেও খেয়ে দেখেছি। কষ কষ লাগে।

জলদাপাড়ার মধ্যে বারটা বীট একথা আগেই বলেছি। অনেকগুলো নদী বয়ে গেছে এই রেঞ্জের মধ্যে দিয়ে। বুড়ি তোর্ষা, তোর্ষা, মালঙ্গী, হলং, চুড়াখাওয়া, বেলাকোওয়া। তার মধ্যে হলং নদীটিই সবচেয়ে মিষ্টি।

হাতী চলেছে। এখনও অন্ধকার আর শ্লেট রঙা গাঢ় কুয়াশা। সামনেই একটি নদী। হাতীরা নদী পেরিয়ে যাবে। সবে যখন নদীর জলে নেমেছে হাতীদের শোভা-

যাত্রা, ঠিক তক্ষুনি প্রায়ান্ধকার ঘাসবন থেকে বাঘ ও বাঘিনীর মিলিত স্বর ভেসে এল গর-র-র-র, গর্র-র-র-র।

হাতীগুলো শুঁড় আর মুখের মধ্যে দিয়ে

লবণ তোমরা দেখেছ। সৈন্ধব, সাদা বা লালচে হয়। জঙ্গলের নুনী কিন্তু বেশির ভাগ কালোই হয়। মনে হয়, শক্ত মাটি। পাথর চেটে চেটে খাওয়াতে এবং খুরের

বিদঘুটে ভয় পাওয়া আওয়াজ করল। তারপর সব চুপচাপ আবার। জল বয়ে যাবার চুপচুপ শব্দ। নদীর জল থেকে, ফ্রিজ খুললে যেমন ধুঁয়ো বেরয়, তেমন ধুঁয়ো বেরুচ্ছে। হাতীরা নদী পেরুল। তারপর চলতে আরম্ভ করল হেলে দুলে।

আস্তে আস্তে আলো হচ্ছে। এবার দেখা যাচ্ছে চারপাশ। জঙ্গল জাগছে। রাতচরা পাখিরা এবার ঘুমোবে, জেগে উঠবে দিনের পাখি, পোকা, প্রজাপতি, পাঁপড়ি মেলবে দিনের ফুল। মাহুতরা মাইলখানেক গিয়ে বাঁদিকে একটি নুনীতে গিয়ে পৌঁছল। নুনী স্বাভাবিকও হয়, অস্বাভাবিকও হয়। এটি বনবিভাগ তৈরি করেছেন। কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে মাটিতে গর্ত করে বস্তা বস্তা নুন ঢেলে দেওয়া হয়েছে সেখানে। নুন সব তৃণভোজী জানোয়ারই খায়। কখনও মাংসাশীরাও খায়। প্রকৃতি, বনের মধ্যে স্বাভাবিক নুনের বন্দোবস্তও করে রাখেন। সৈন্ধব

চাপে চাপে ডেলা ডেলা হয়ে যায় পাথুরে মাটি। গর্ত গর্ত হয়ে যায় পুরো জায়গাটাই। নুনী অবশ্য কালো না হয়ে অন্য রঙেরও হতে পারে। সবই নির্ভর করে পরিবেশ ও সেই অঞ্চলের প্রকৃতির ওপর।

মাহুতরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নুনীর পাশের নরম মাটিতে গণ্ডারের দাগ খোঁজে। যদি কাল রাতের টাটকা দাগ পায় তখন সেই দাগকে অনুসরণ করে এগোতে থাকে গভীর বন ও ঘাস পেরিয়ে, নালা ডিঙ্গিয়ে, হাতী ডুবে-যাওয়া নলের আর কাশিয়ার জঙ্গল ঠেলে। কাশিয়ার ফুলগুলো বড় সুন্দর দেখতে হয়। এই বড় নল বা কাশিয়াকে এখানে ঢাঢ্ঢা বলে।

হাতী চলে হেলে-দুলে। হঠাৎ সূর্যের আলো পুব দিকের জঙ্গলের ফাঁক-ফোঁক দিয়ে এসে শিশির-স্নিগ্ধ কুয়াশা ঘেরা একটি চাপ চাপ সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের মধ্যে এসে পড়ে। কমলা রঙা সার্চ-

লাইটের মত। কুয়াশার চাদরকে ঠিক মাকড়সার জালের মত দেখায় তখন। সেইসব মুহূর্তে তোমার মনে হবে যদি তোমার চোখ থাকে, এই দৃশ্যটুকু দেখেই বাংলোতে ফিরে যাও হাসিমুখে। গণ্ডার দেখা হল কি না হল তাতে কী-ই বা যায় আসে!

গণ্ডার দেখেছি জলদাপাড়াতে। একবার গরুমারাতেও দেখেছিলাম। চাপড়ামারিতেও থাকার বন্দোবস্ত একবার হয়েছিল, কিন্তু বনবিভাগের বড় কর্তা অথবা পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারীয়েটের কোন হর্তা-কর্তার প্রোগ্রাম হওয়ায় সেইবার পুজোর পর আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। জলদাপাড়ায় ছাড়াও আসামের কাজিরাঙ্গাতেও বহুবার দেখেছি গণ্ডার এবং পুব-আফ্রিকার নানা জঙ্গলে—দু-খড়্গ গণ্ডার।

শুনেছি, চাপড়ামারির বনবাংলোটি উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। হাতী ও গণ্ডার দেখার সুবিধা এখানেই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু রিসার্ভেশান পাওয়া, আমাদের মত সাধারণ লোকদের পক্ষে বড়ই মুশকিল। যে কোন রাজ্যের যে কোন ভাল বাংলো, সে যে ডিপার্টমেন্টেরই হোক না কেন, আমলা এবং রাজনৈতিক নেতাদের জন্যে খালি পাওয়াই মুশকিল। এদেশের বিশ্রাম বা বনবাংলো, রেল স্টেশন, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি কোন জায়গাতেই লেখক, গায়ক বা চিত্রকররা কখনই ভি আই পি বলে গণ্য হন না। ভি আই পি কেবল আমলারা এবং রাজনৈতিক নেতারা। ছুটি-টুটিতে রিসার্ভেশন যদি বা পাওয়া যায়ও লাস্ট মিনিটে চিঠি পাবে, যে একজন ভি আই পি আসছেন, তোমার রিসার্ভেশন ক্যানসেল করা হল। কোন সভ্য, গণতান্ত্রিক দেশে এমন ঘটনার কথা ভাবাও যায় না। শুধু লেখক বা শিল্পী কেন, যে কোন মানুষকেই একবার রিসার্ভেশান দিলে তা সম্মানের সঙ্গে বজায় রাখা উচিত। গণতন্ত্রে, সকলেরই তা সমান হবার কথা। চাপড়ামারি ফরেস্ট বাংলোর মতই সুকনার বাংলো, মুকুটমণিপুরের বাংলো আরও উদাহরণ। এসব বাংলোতে সাধারণের পক্ষে গিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। মন্ত্রী এবং বড় বড় আমলাদের প্রিয় স্থান এইসব। বছরের অত্যন্ত বাজে সময় ছাড়া এসব বাংলো পাওয়া যায়ই না বলতে গেলে।

গণ্ডার সাধারণত গভীর ছায়াচ্ছন্ন কর্দমাক্ত জায়গায় থাকতে ভালবাসে। খোলা ঘাসবনেও তাদের দেখা যায়, যেমন ব্রহ্মপুত্রর পারের কাজিরাঙ্গায় এবং জলদাপাড়ায়। তবে যেসব জঙ্গলে গণ্ডার থাকে, তা সত্যিই ভয়াবহ। গা ছমছম করে সেই সব জঙ্গলে দিনের বেলাতেও ঢুকলে। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলেও একসময় অনেক গণ্ডার ছিল। ভারতীয় বাইসন বা গোউরও দেখা যায় এইরকম গভীর জঙ্গলে, হাতীর সঙ্গে। অন্য সব জানোয়ার ত দেখা যায়ই। আসলে, বিহারের হাজারীবাগ বা পালামৌ জেলার জঙ্গলকে, উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের জঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করলে ফুলের বাগিচা বলে মনে হয়। বিহারের সিংভূম জেলার সারাণ্ডার জঙ্গল অবশ্য অপেক্ষাকৃত গভীর, তবে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় নয়। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও গভীর ও প্রায় আদিম জঙ্গল আছে—তবে তাও উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের মত নয়।

(চলবে)

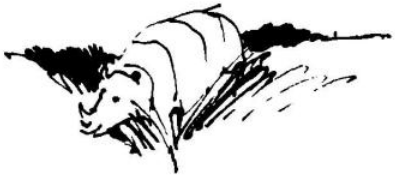

নতুন পথে এভারেস্ট শীর্ষে

অতীন সরকার

সোভিয়েত ইউনিয়নের এক পর্বত অভিযাত্রী দল বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট চূড়ায় আরোহণ করেছেন নতুন পথে। পথটি হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। সেখানে এভারেস্টের ঢাল ৪০ থেকে ৬০ ডিগ্রি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান অভিযানের সফল ছ'জনকে নিয়ে শতাধিক (১১৭) ব্যক্তি ৮৮৪৮ মিটার উঁচু এই শৃঙ্গে আরোহণ করলেন। আগেকার অভিযাত্রীরা অবশ্য উঠেছেন অন্য ছটি পথ ধরে।

২৬ এপ্রিল সোভিয়েত পর্বত অভিযান ইতিহাসে যাঁরা নতুন পাতা যোগ করলেন তাঁদের নেতা ছিলেন মস্কো মেশিন বিল্ডিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ৪৪ বছর বয়স্ক এডোয়ার্ড মিসলোভস্কি আর তাঁর সঙ্গী ছিলেন লেনিনগ্রাডের এঞ্জিনিয়ার ভ্লাদিমির ব্যালিবেরদিন। পরের দিন আবার ঐ শীর্ষে পৌছান অভিযাত্রী দলের ভ্যালেন্তিন ইভানভ, সের্গেই কেরসভ, মিখাইল তুর্কেভিচ ও সের্গেই ইয়েফিমভ। দলে ছিলেন আরও ছ'জন।

মিসলোভস্কি গত ২০ বছর ধরে পর্বতারোহণ করছেন। দেশের সবকটি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে সর্বোচ্চ সম্মান 'স্নো লিওপার্ড' পেয়েছেন। তবে নতুন পথে এভারেস্ট আরোহণ নিশ্চয়ই তাঁর অভিযাত্রী জীবনে নতুন পাতা যোগ করল।

প্রস্তুতি পর্ব

কয়েক বছর আগেই হিমালয় অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেইভাবেই অভিযাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দেশের মধ্যে অবস্থিত পামির ও তিয়েনসান পর্বতমালার সাত হাজার মিটার উঁচু চূড়ায় আরোহণ করে অভিযাত্রীরা নিজেদের রপ্ত করিয়ে নেন। তার থেকে উঁচু হিমালয়ের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য মস্কোয় সম-তাপ ও চাপের কক্ষ তৈরি করে অভিযাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৮০০০ মিটার বা তার ওপরে

সোভিয়েত অভিযাত্রী দল

মে মাসের গ্রীষ্মেও তাপমাত্রা ৩০° সেন্টি-গ্রেড প্রত্যাশা করা যায় না। কখন তা হয়ে পড়ে ৪০° সেন্টিগ্রেড। বলাবাহুল্য ০°-তে জল বরফে পরিণত হয়। আর বাতাস সেকেণ্ডে ২০ থেকে ৩০ মিটার গতিতে বয়ে যায়। আর সে বাতাসও একেবারে শুকন এবং সৌর বিকিরণও সেখানে বেশি। এমন সবকিছুই কৃত্রিম কক্ষে তৈরি করা যায় না। তাছাড়া পামির ও তিয়েনসান-এর সবচেয়ে জটিল পথেও সোভিয়েত অভিযাত্রীরা বেস ক্যাম্প থেকে একবারেই শীর্ষে পৌঁছেছেন। কিন্তু, সেই কৌশল হিমালয়ে চলবে না। তাছাড়া একটা বড় দল নিয়ে কবে আবহাওয়া অনুকূল হবে তার জন্য অপেক্ষা করাও যাবে না; এটাও তাঁরা জানতেন। তাঁরা হিসেব করে নিয়েছিলেন আগেই যে, ৪ জন করে তিনটি দলের সর্বোচ্চ শিবিরে একদিন থাকতে প্রয়োজন হবে ৩৮ কিলোগ্রাম জিনিসপত্র ও ১৫২ কিলোগ্রাম অক্সিজেন সরঞ্জাম।

হিমালয় অভিযানের উপযোগী বিশেষ ধরনের পোশাক তৈরি করা হল। অন্তর্পোশাকের ওপরে পশম যুক্ত চামড়ার কোট তার ওপর ক্যাপ্রনের ট্রাউজার্স। এই ধরনের পোশাক হাওয়া-নিরোধক। কিন্তু, সেই সঙ্গে বাষ্পীভবনের সুযোগ যুক্ত। ২টি করে জুতো ও পশমের লাইনিংযুক্ত বুট। গুরুতর ঝামেলা বেধে গেল হাত দুটোকে রক্ষা করা নিয়ে। হাত দিয়ে

এডোয়ার্ড মিসলোভাস্ক

ভ্লাদিমির ব্যালিবেরদিন

৪০° তাপমাত্রায় জটিল ও নানা ধরনের কাজ করতে হয়। সিল্ক বা পশমের দস্তানা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অকেজো হয়ে যায়। তাই হাতকে গরম রাখার জন্য ওয়ার্মিং সেট বসান হল দস্তানার নিচে।

এমনিভাবে তৈরি অভিযাত্রীদের মধ্যে নিয়মিত পর্বত অভিযাত্রী ছাড়াও ছিলেন কলেজ ইনস্ট্রাক্টর, এঞ্জিনিয়ার, গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানী। সকলেই কর্মঠ ও সক্রিয়।

অভিযান

যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে অভিযানের প্রয়োজনীয় মালপত্র ও লোকজন নিয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অভিযাত্রীরা পৌঁছাল। সেখানে প্রথম এভারেস্ট আরোহণকারী নিউজিল্যাণ্ড-এর এডমাণ্ড হিলারির সঙ্গে অভিযাত্রীরা এক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি বলেন নতুন পথে হিমালয় অভিযান উঁচু শৃঙ্গে আরোহণের ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করবে। তিনি ভাল আবহাওয়া ও অভিযানের সাফল্য কামনা করেন।

নতুন পথের কোন বিবরণ বা অভিজ্ঞতা

কারুর ছিল না বলে সোভিয়েত অভিযাত্রীরা ফটো আর মানচিত্র দেখে নিজেদের তৈরি করেন। অবশ্য গত বছর এই দল এবারের প্রস্তুতি হিসাবে হিমালয়ের ৬০০০ মিটার উঁচু পর্যন্ত উঠে ট্রায়াল দিয়ে গেছেন। আর আবহাওয়া এতই অনিশ্চিত যে, আবহাওয়া বিজ্ঞানীরাও দীর্ঘস্থায়ী-ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না।

এমনি এক মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে অভিযাত্রীরা ৫৩৪০ মিটার উঁচুতে খুম্বু গ্ল্যাসিয়ারে এক 'আইসফলের' পাদদেশে বেস ক্যাম্প স্থাপনের জন্য যাত্রা করলেন। পঞ্চম ক্যাম্প। সেখান থেকেই শীর্ষ অভিযান পরিচালিত হয়। এই ২৭০০ মিটারের প্রথম ৮০০/৯০০ মিটার পথ নরম বরফ বা কঠিন বরফে ঢাকা। আবার কোথাও বরফের টিলা। ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি ঢাল, আরোহণ অপেক্ষাকৃত সহজ। এই ধরনের আরোহণে অভিযাত্রীরা অভ্যস্ত হয়েছিলেন পামির ও তিয়েনসান পর্বতে। তারপরে ৭২০০ থেকে ৭৮০০ মিটার পথ অধিকতর জটিল। শক্ত বরফের ৫০ থেকে ৭০ ডিগ্রি খাড়া। তার থেকেও কঠিন অবস্থা ছিল ৭৮০০ থেকে

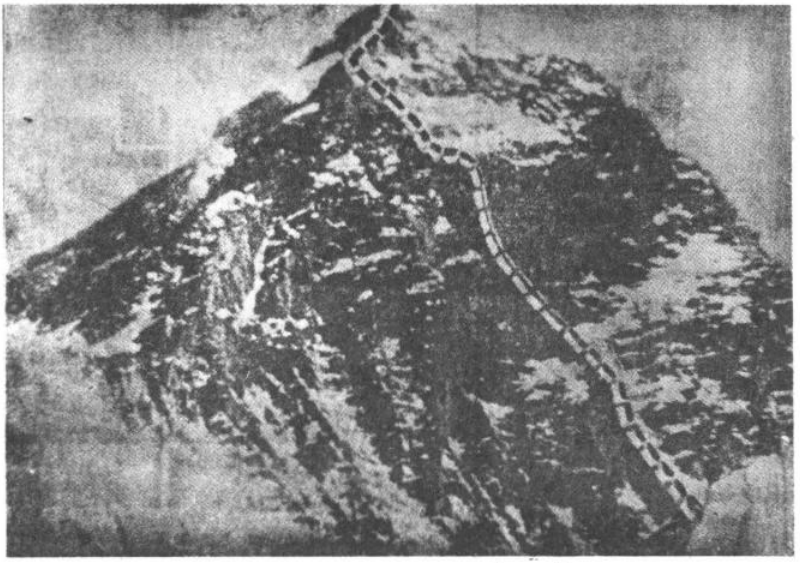

এই পথে অভিযাত্রীরা এভারেস্টে ওঠেন

কাঠমাণ্ডু থেকে ৩৫০ জন শেরপা ৯ টন ওজনের সাজসরঞ্জাম পৌঁছে দিলেন। বেস ক্যাম্প থেকে দেড় টন ওজনের সরঞ্জাম নিয়ে অভিযাত্রীরা ৬৫০০ মিটার উঁচুতে স্থাপন করলেন ফার্স্ট এসলট ক্যাম্প। এর থেকে ২৭০০ মিটার উঁচুতে (৮৫০০ মিটার) স্থাপিত হল শেষ ও ৮৫০০ মিটার পর্যন্ত। পঞ্চম শিবিরের ওপরে মানুষের ওপর স্বাভাবিক চাপ (এটমসফিয়ারিক প্রেসার) খুবই কম। ফলে অভিযাত্রীদের কাছে এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা।

বেস ক্যাম্প থেকে পঞ্চম শিবির পর্যন্ত অভিযাত্রীদের চারজনের এক একটি

দল মালপত্র নিয়ে ওঠেন। একদলের কাজের সময় অন্যরা বিশ্রাম নেন। আর একদল নিচের ক্যাম্পে নেমে আসেন। এমনিভাবে প্রস্তুত করা হয় পঞ্চম ও শেষ ক্যাম্পটি। সবার শেষে বেস ক্যাম্প থেকে মূল অভিযাত্রীরা উঠে আসেন শেষ ক্যাম্পে।

৮৫০০ মিটার স্থিত শেষ শিবিরে রাত্রিযাপন করে মিসলোভস্কি ও বালিবারদিন ২৬ এপ্রিল স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ১০ মিনিটে পৃথিবীর শীর্ষে ওঠার জন্য যাত্রা করেন। বেলা ২টা ৩৬ মিনিটে তাঁরা শীর্ষে পৌঁছান। সেখানে ৩০ মিনিট অবস্থানকালে তীব্র ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের মধ্যে ছবি তোলেন। আবার বেলা ৩টা ৫ মিনিটে পঞ্চম শিবিরের উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করেন।

প্রচণ্ড তীব্র বাতাস আর বরফের রাজ্য সেই ৮৮৪৮ মিটার উঁচু এভারেস্ট শীর্ষে সোভিয়েত অভিযাত্রীরা অন্য অভিযাত্রীদের মত রেখে এলেন জাতিসংঘ, নেপাল ও নিজ দেশের জাতীয় প্রতীক। ●

ক্ষিতিমোহন

শান্তিনিকেতনের পরম পণ্ডিত-দার্শনিক আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কথা তোমরা এই পত্রিকায় পড়েছ। ক্ষিতিমোহন সেন শুধু পণ্ডিতই ছিলেন না, তাঁর মত রসিক-পুরুষও দুর্লভ। একবার তাঁর কঠিন অসুখের সময় ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'দুধ উনি হজম করতে পারবেন না। দুধের সঙ্গে অর্ধেক জল মিশিয়ে দেবেন।'

ক্ষীণ কণ্ঠে রুগী বলে উঠলেন, 'সিডা গয়লাই কইরা রাখে।'

কথার কথা

অ্যালফাবেট কথাটা জানা, কিন্তু এর ইতিহাস? সব কথারই ইতিহাস থাকে—এটারও রয়েছে। কথাটা ইংরাজি—কিন্তু তৈরি হয়েছে দুটি গ্রীক অক্ষর দিয়ে। কেমন করে? গ্রীক বর্ণমালায় প্রথম দুটি অক্ষরের নাম অ্যালফা এবং বিটা। ল্যাটিনে এ এবং বি। এখন এই অ্যালফা এবং বিটাকে এক সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করা হয়েছে অ্যালফাবেট কথাটা। বলা বাহুল্য, বিটা কথাটা হয়ে গেছে বেট। অক্ষর এ বি সি ইত্যাদি কিন্তু হঠাৎ কারুর মাথা থেকে বেরয়নি, এগুলো এসেছে বহু পুরোন দিনের প্রচলিত চিত্র অক্ষর বা ছবি অক্ষর থেকে। এ অক্ষরটা এসেছে ঈগল পাখি থেকে। বি অক্ষর এসেছে বক থেকে! এই পুরোন দিনের অক্ষরগুলোকে বলা হয় হিয়েরো গ্লিফিক। তবে পণ্ডিতেরা অক্ষরের রূপান্তর নিয়ে সর্বদা একমত নন। কেউ বলেন এ অক্ষর এসেছে ষাঁড়ের মুখের ছবি থেকে। আগে 'এ' কথাটা অনেকটা ছিল 'ডি'-এর মত দেখতে। পরে ডি উল্টে নিয়ে ডি-এর পেট কেটে এ অক্ষর সৃষ্টি হয়। আমরা বলি ইংরাজি বর্ণমালা, কিন্তু আসলে হবে রোমান বর্ণমালা। রোমানদের কাছ থেকে ইংরেজরা গ্রহণ করেছে তাদের বর্ণমালা। যার নাম অ্যালফাবেট, আর রোমানরা ত নিয়েছিল গ্রীকদের কাছ থেকে!

সাম্প্রতিক সংবাদ

কথায় বলে, হাতির খাবার জোগাতে গিয়ে মালিক নাকি ফতুর হয়। কিন্তু হাতি যখন মালিকের মুখের কাছে খাবার জুগিয়ে দেয়, তখন সেটা খবর হয় নিশ্চয়ই। ফ্রান্সের একটি সার্কাসের হাতি আপাতত রান্নাবান্নায় একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নাম তার জাম্বো। জাম্বোর রন্ধনপটুত্ব দেখতে ভেঙে পড়ছে সারা শহর। একে রাখা হয়েছে ফ্রান্সের তুয়ে শহরের একটি পার্কে।

শুঁড় দিয়ে সসপ্যান পাকড়িয়ে ধরে জাম্বো প্যানকেক বানাচ্ছে

জলের নিচের ক্যামেরা

জলের তলা থেকে মুক্তো কুড়িয়ে আনতে মানুষ ডুব দেয় প্রাণ হাতে করে অতলে। জলের তলার খবর আনতে কী পরিশ্রমই না করতে হয়। এইসব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজকে সহজতর করার জন্যে ব্রিটিশ মার্কনি অ্যাডিওনিক্স কোম্পানী জলের নিচের ছবি তোলার জন্যে রঙিন টি ভি ক্যামেরা তৈরি করেছেন। টর্পেডোর মত দেখতে এই ক্যামেরাটি তিন হাজার মিটার নিচ থেকে ডাঙায় সরাসরি ছবি পাঠাতে পারবে, সুতরাং জাহাজের খোল সারাই করতে কিংবা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে এই টি ভি ক্যামেরা নিশ্চয়ই খুব সাহায্য করবে।

নতুন রাজধানী হারারে

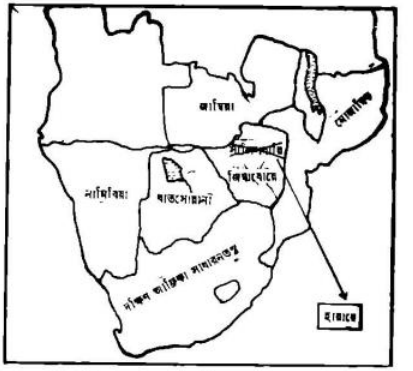

আফ্রিকার একটি ছোট্ট রাষ্ট্রের নাম জিম্বাবোয়ে। এর সাবেকি নামের সঙ্গে লোকে অনেক বেশি পরিচিত—রোডেশিয়া। তোমরা জান, আফ্রিকার এইসব দেশে বর্ণবিদ্বেষ কী তীব্র। আর তাই নিয়ে লড়াই চলছে বহুকাল। এই জিম্বাবোয়ের রাজধানীর সাবেকি নাম সালিসবারি পাল্টিয়ে শহরটির নাম রাখা হল **হারারে** (Harare)। এখন থেকে পত্রপত্রিকায় এই নামটিই দেখতে পাবে। খেয়াল রেখ।

সংশোধনী

১ জুন ৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বনের রাজা ডোরাকাটা' লেখাটিতে ব্যবহৃত বাঘের ছবিগুলো তুলেছেন ভরত নাগ। সাম্প্রতিক সংবাদের ছবি রাজীব বসুর এবং 'তুমি কী হতে চাও' লেখার ছবিগুলো অচিন্ত্য হাজরা ও শংকর নাগ দাস তুলেছেন।

তিন বিদেশী ও বাঙলা ভাষা

অনিলকুমার দলুই

'আ মরি বাঙলা ভাষা'। যে বাঙলা ভাষা নিয়ে আজ আমাদের এত গর্ব, সাহিত্যের ইতিহাস ঘাটলে আমরা কিন্তু দেখব, দৈনন্দিন আটপৌরে যে ভাষায় আমরা কথা বলি, লেখাতে সেই গদ্যের রূপ এসেছে মাত্র শ'দুয়েক বছর আগে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আগত কিছু বিদেশী মানুষের কেজো প্রয়োজনেই বাঙলা গদ্যের বলতে গেলে জন্ম হল। বাঙলা শিক্ষার সেই বিস্তার হবার সময়, যেটা বাঙলা গদ্যের গোড়ার যুগও বটে, যে কয়েকজন বিদেশী শিক্ষাবিদ এই সোনার কাঠি ছুঁইয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনজনের কথা আজ বলব।

প্রথমেই আসি কেরী সাহেবের কথায়। কেরীর বাবা ছিলেন তাঁতী আর তিনি নিজে করতেন চামড়ার কাজ। ১৭৬১ সালে নর্দামটনশায়ারে পলার্সপিউরি গ্রামে তাঁর জন্ম।

গাছপালা থেকে ভাষা সব বিষয়েই তাঁর শেখবার আগ্রহ ছিল প্রবল। বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ডক্টর রসবার্গের অকাল মৃত্যুতে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ Flora Indica গ্রন্থটি কেরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কেরী কলকাতায় এলেন ধর্মযাজক হয়ে। এ দেশে মানুষের কাছে ধর্মের কথা শোনাতে গেলে দরকার তাদের ভাষা জানা। এবং সেই তাদের ভাষাতেই ধর্মকথা বলতে পারলে উদ্দেশ্য আরও বেশি করে সিদ্ধ হবে, সেইজন্য কেরীসাহেব বাঙলা শিখতে শুরু করলেন রামরাম বসুর কাছ থেকে। এরই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সচেষ্ট হলেন বাঙলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনার। তাঁর আশ্রয়দাতা উডনি সাহেব তাঁকে দান করেন একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র যদিও সেটা নানান কারণে চালু করা গেল না। শেষ পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশনে মার্সম্যান আর ওয়ার্ডের সহযোগিতায় বাঙলা মুদ্রণ যন্ত্র চালু করা হল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ নিউ টেস্টামেণ্টের ম্যাথু লিখিত সুসমাচারের প্রথম পাতা ছাপা হল। এর পর স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। পড়বার জন্যে চাই বাঙলা বই। তিনি নিজে এবং তাঁর সহকর্মীরা লিখলেন বাঙলা বই। বাঙলা গদ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, কেরীর গদ্য খুব সহজ ছিল না। তবে সে যুগে বিশেষত একজন বিদেশীর কাছ থেকে সেটা আশা করাও অন্যায়।

কেরী সাহেবের কথা বলতে গিয়ে আর একজন বিদেশীর কথা খুব সহজেই এসে পড়ে—তিনি ডেভিড হেয়ার। জন্ম তাঁর স্কটল্যাণ্ডে। ১৮০০ সালে হেয়ার এলেন এদেশে। ঘড়ির ব্যবসা ফাঁদলেন তিনি। নিজে লেখাপড়া বেশি না জানলেও এদেশের ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নিজে খুবই সচেষ্ট হলেন। দরকার আরও পাঠ্যপুস্তকের। তৈরি হল 'স্কুল বুক সোসাইটি' যার কাজ ছিল মূলত বাঙলা ও ইংরাজি বই রচনা ও প্রকাশ করা। এ ছাড়া তিনি সেই সময় শিক্ষাবিস্তারের জন্য আরও অনেক স্কুল স্থাপন করেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে রোজ তিনি পালকি করে বিভিন্ন স্কুল ও পাঠশালা পরিদর্শন করতে বেরোতেন। ছাত্র-দরদী হিসেবে হেয়ারের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা সমাজে খুব

অল্পদিনের মধ্যেই।

আর একজন বিদেশীর কথা বলে আজকের এই আলোচনার ইতি টানছি। তিনি বেথুন সাহেব। স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের জন্য বেথুন সাহেব ছিলেন অগ্রণী যাঁকে প্রধানত সহায়তা করছিলেন বিদ্যাসাগর। অবশ্য তাঁরও আগে রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যাই হোক, বেথুনের হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বলা বাহুল্য, সে সময় ছাত্রী জোটেনি বেথুন সাহেবের। বিদ্যাসাগরের সহায়তায় জোগাড় হল দুটি ছাত্রী—মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা। এর ফলে তখনকার দিনের সমাজ তর্কালঙ্কারের ওপর নানারকম অত্যাচার করে।

হেয়ারের মত বেথুনও ছাত্রীদের ভালবাসতেন গভীরভাবে। স্কুলে আসার সময় ছাত্রীদের জন্য নানারকম খেলনা আনতেন। ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি খেলা করতেন। কল্পনা করা যায়,বেথুন সাহেব ঘোড়া হয়ে ঘরে হামাগুড়ি দিচ্ছেন আর ছাত্রীরা তাঁর পিঠের ওপর সওয়ার হয়ে বসেছে? সত্যিই এ'রা আজ স্বপ্নের মানুষ।

●

কথার কথা

ইংরাজি **Bear** কথাটার অর্থ কি? এর কি একটা অর্থ? অনেক অর্থ। তোমরা অভিধান না দেখে এর কতগুলো অর্থ বলতে পার?

বয়ে নিয়ে যাওয়া, যে বয়ে নিয়ে যায় তাকে বলা হয় বেয়ারার। পুরোন আমলে পাল্কি বহনকারীদের সাহেবরা বলত পাল্কি বেয়ারা। পরে বেয়ারা কথাটা বদলে হয়ে যায় বেহারা! বেয়ার মানে উৎপন্ন, যেমন ট্রি বেয়ারস ফ্রুট। বেয়ার মানে সহ্য করা—ক্যান ইউ বেয়ার ইট—তুমি কি সহ্য করতে পার? বেয়ার এ গ্রাজ—মানে কারুর প্রতি অসন্তোষ পোষণ করা। বেয়ার আউট—প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠা করা। বেয়ার ডউান অন—চটপট লক্ষের দিকে যাওয়া, বেয়ার অ্যাওয়ে—ছেড়ে দেওয়া (যেমন নৌকো), বেয়ার উইথ সামব্রাডি—কাউকে সহ্য করা। এছাড়াও বেয়ার-এর আরও অর্থ আছে। এই বেয়ার কথাটা ল্যাটিন **ferre**, এবং গ্রীক **pherein** কথাটির সঙ্গে তুলনীয়। বেয়ার মানে অবশ্য ভালুকও হয়—কিন্তু তার উৎপত্তি অ্যাংলো—স্যাকশন ভাষা থেকে। অ্যাংলো—স্যাকশন হল প্রাচীন ইংরাজি। ১০৬৬ সালের ইংল্যাণ্ডে ঐ ভাষা প্রচলিত ছিল।

সংসার

রামকমল ওরফে গুজে নামে একটি শিশু-দৌহিত্রকে খুব ভালবাসতেন বিদ্যাসাগর, প্রায়ই ওকে নতুন সিকি দু'য়ানি দিতেন। একদিন তিনি গুজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, তুমি কাকে ভালবাস? গুজে উত্তর করল, 'দাদামশায়, তোমাকেই খুব ভালবাসি। আর তোমার চেয়েও ঐ নতুন সিকি দু'য়ানিকে বেশী ভালবাসি।'

বিদ্যাসাগর হাসলেন, বললেন. 'সংসারে সবাই তাই করে। তুমি শিশু বলে সত্যি-কথাটি বললে, তারা বলে না।'

দেশ বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

সুরজিত ধর

মাতৃভূমি এবং জাতির স্তুতি দ্বারা যে গান গাওয়া হয়, তাকেই আমরা জাতীয় সঙ্গীত বলি। প্রত্যেক দেশেই রয়েছে তাদের নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীত। এই গান-গুলো যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের কেউ বিশ্বকবি, কেউ সাধারণ গীতিকার, কেউ বা সৈনিক। আবার এমন জাতীয় সঙ্গীত আছে যার রচনাকারীর সঠিক হদিশ আজও মেলেনি। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই রয়েছে একটি করে জাতীয় সঙ্গীত। কোন কোন দেশের রয়েছে একাধিক জাতীয় সঙ্গীত। চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় সঙ্গীত দুটি আর ছোট্ট দেশ সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত রয়েছে তিনটি।

সুইজারল্যাণ্ডে চালু আছে দুটি ভাষা— জার্মানী ও ফরাসী। তাই জার্মান ভাষীদের পছন্দ একটি গান আর ফরাসীদের মুখে মুখে চালু আছে দুটি গান। তাই সেদেশের এই তিনটি গান হল— জাতীয় সঙ্গীত। তবে সেদেশের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় গানটি হল 'Cantique Suisse'। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ইংল্যাণ্ডের খ্যাতি গোটা দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে আছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, সেদেশের জাতীয় সঙ্গীত হল 'God Save the King' নামে রাজ প্রশস্তিমূলক এক অতি সাধারণ গান। অনেকে বলেন এটি লিখে-ছিলেন জন বুল নামে এক ব্যক্তি। আবার অনেকে বলেন, ১৭৪৩ সালে ডেটিংগেন যুদ্ধ জয়ে হেনরী বেরী নামে জনৈক ইংরেজ এই গানটি লিখেছিলেন।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত হল ফ্রান্সের 'La Marseillaise' এটি ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন ও সুর দিয়েছিলেন ফরাসী সেনাপতি রুজে দ্য লীল।

কিছুদিন পরেই ঘটল আর এক ব্যাপার। ঐ সঙ্গীতই গাইতে গাইতে একদল বিপ্লবী মার্সাই শহর ছেড়ে প্যারিসের তুইলেরিজ প্রাসাদ আক্রমণ করল। সেই থেকেই গানটি 'লা মার্সাইলেজ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতীয় সঙ্গীতটি হল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে লেখা জাপানের 'কিমিগায়ো'। গানটিতে রাজার প্রশস্তিই শুধু আছে ; দেশ বা জাতির কথা বিলকুল বাদ। গ্রীসের জাতীয় সঙ্গীতের নাম হল 'এথনিকস ইম্নস' রাশিয়ার 'ইণ্টারন্যাশন্যাল' বেলজিয়ামের 'লা ব্রাবাঁসন'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে তা হল ফ্রান্সিস স্কট নামে এক সাধারণ সৈনিকের লেখা 'দি স্টার স্প্যাঙ্গলড ব্যানার' এই গানটি।

কাতারের জাতীয় সঙ্গীতে কোন শব্দই শোনা যাবে না। আছে শুধু সুর। জাপান, জর্ডান ও্যার সানমেরিনোর জাতীয় সঙ্গীত হল মাত্র চার লাইনের। দুটি রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পৃথিবীতে কেবল মাত্র এক জনই রচনা করেছিলেন। তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরু ছাড়া পৃথিবীতে আর একজন কবি আছেন, যিনি একদা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং একটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে-ছিলেন, তিনি হলেন নরওয়ের কবি ব্যোর্নস্টার্ন ব্যোর্নসন।

সন্ধানী প্রতিযোগিতা

তোমরা নিশ্চয়ই জান, এ বছর অর্থাৎ ১৯৮২ সাল মহাকাশ বিজয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষ। এই উপলক্ষে নবম দশম ১ এপ্রিল সংখ্যায় আমরা মহাকাশ বিজয়ের ওপর নানা তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছিলাম। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল এমন একটি শব্দ-ছক, যা সম্পূর্ণতই মহাকাশ, সৌরজগৎ এবং রকেট বিজ্ঞানের বিষয়-নির্ভর। একটু কঠিন মনে হতে পারে, তবে সঠিক তথ্য জোগাড় করতে পারলে তেমন সমস্যার হবে না। জগদীশ চৌধুরী এই ছকটি তৈরি করেছেন।

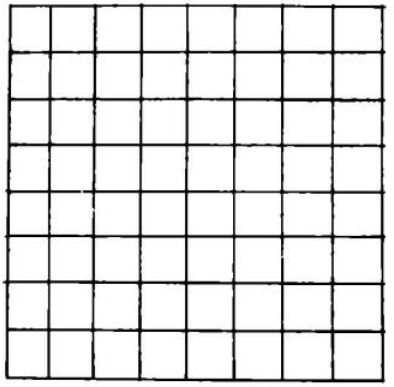

সূত্র ঃ পাশাপাশি

১. অনন্য বৈশিষ্ট্যময় গ্রহ।

৩. ষাটের দশকের প্রথম দিকের সোভিয়েট মহাকাশচারী।

৫. ১৯৬০ সালে রাশিয়া যে দুটি কুকুরকে মহাকাশে পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়, তাদের একটির নাম।

৬. ১৯৫৭ সালে ৩ নভেম্বর স্পুৎনিক-২ করে মহাকাশে প্রেরিত জীবন্ত প্রাণীটির নাম।

১০. একজন ডেনিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। প্রায় চারশো বছর আগে, ইনি সূর্যের চারিদিকে গ্রহদের পরিক্রমণ বিষয়ে তিনটি সূত্রের উদ্ভাবন করেন।

১২. কেপ ক্যানভিয়েল থেকে উৎক্ষেপিত ভারতীয় উপগ্রহ।

১৫. কক্ষপথে পরিক্রমার সময় উপগ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে।

১৭. ভূসমনেয় কক্ষে স্থাপিত ভারতের

সন্ধানী প্রতিযোগিতা
উত্তরপত্রের কুপন

নাম.....

বাড়ির নাম ও রাস্তা.....

গ্রাম ও পাড়ার নাম.....

ডাকঘর.....

জেলা.....

প্রথম উপগ্রহ।

১৯. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আমাদের এই পৃথিবী, অন্যেরা পরিক্রমা করে চলেছে তাকে—এই মতবাদের প্রবর্তক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

২০. গ্রহ উপগ্রহের মধ্যেকার এক কাল্পনিক রেখা, যার ওপরে ওরা লাট্টুর মত পাক খায়।

সূত্র ঃ ওপর-নিচ

১. পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক।

২. ১৯৬০ সালে রাশিয়া যে দুটি কুকুরকে মহাকাশে পাঠিয়ে ফেরৎ আনে, তাদের অন্যটির নাম।

৪. পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের এই জিনিসটি তিন লক্ষ গুণেরও বেশি, চাঁদের ক্ষেত্রে ১/৮০ অংশ।

৭. মহাকাশ-গবেষণায় ব্যবহৃত একটি যন্ত্রাংশ।

৮. সূর্যের আলোর ওপর নির্ভরশীল এমন জিনিস যা চাঁদ ও কিছু গ্রহের ক্ষেত্রে বাড়ে এবং কমে।

৯. মঙ্গলের উপগ্রহের সংখ্যা।

১১ সৌরজগতে সবচেয়ে শক্তিশালী বস্তু।

১৩. সূর্যের গ্রহের সংখ্যা।

১৪ যুদ্ধের জন্য নির্মিত ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য রকেট ব্যবস্থার নাম-সংক্ষেপ।

১৫. কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে উপগ্রহ যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে যায়।

১৬. সূর্যের সবচেয়ে দূরের গ্রহ।

১৮. যে-পথে গ্রহ উপগ্রহ পরিভ্রমণ করে।

★

১৬ মে সন্ধানী প্রতিযোগিতা ঃ ১০-এর উত্তর

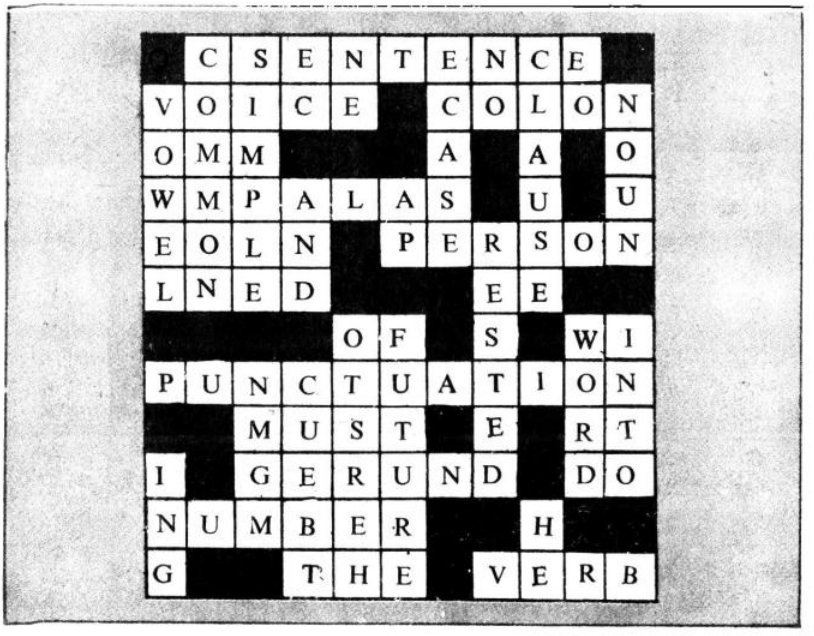

১৬ মে ৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত সন্ধানী প্রতিযোগিতার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

প্রথম ঃ অরিন্দম সেন, উলুবেড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়, হাওড়া।

নিবেদিতা ঘোষ, কলকাতা। সঞ্জয় হাঁসদা, বালুরঘাট। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাটপাড়া। চন্দনা বেরা, মহিষাদল। সুজয় ঘোষ, কাটিহার। মণিকা সিংহ, মালদহ। প্রকাশ ভাদুড়ী, মুর্শিদাবাদ। বনজা ভাদুড়ী, সোদপুর। কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, বর্ধমান। সবিতা দত্ত, ইছাপুর। দুর্জয়-কুমার রায়, কাটিহার। জয়া রায়, সোদ-পুর। সঞ্জীব নন্দী, কলকাতা। মন্দিরা বসু, কুলটি। বিজয়েশ গোপ, কাটিহার। সঞ্জয়কুমার নিয়োগী, কাটিহার। আশিস-কুমার রায়, কাটিহার। মলয় সাহা, কলকাতা। হারুকুমার দাস, ধূলাসিমলা। সুবিনয় বাগচী, রায়গঞ্জ। সৈকত বসু, বর্ধমান। দেবাশিস চ্যাটার্জি, হুগলী। অদিতি মুখোপাধ্যায়, হুগলী। প্রভাতকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা। কুন্তল কর্মকার, ধূলাসিমলা। সৌম্যাপর্ণা মেদ্দা, কলকাতা। তনুশ্রী সেন, কলকাতা। সুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, সালিখা। পিনাক দত্ত, দুর্গাপুর। সুব্রত পাল, কলকাতা। তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর। দোলন নায়ক, বাঁকুড়া। পল্লবী বসু, সাঁত্রাগাছি। প্রীতি মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ। নভোনীল কর, নন্দীগ্রাম। জয়ন্তকুমার ঘটক, পুরুলিয়া। মলয় গড়াই, হাওড়া। জয়দীপ সেন, কলকাতা। রিন্তা ঘোষ, ঝালদা। পীযূষকান্তি ঘোষ, ঝালদা। স্বরূপ ঘোষ, উত্তরপাড়া। রুবি রায়, কলকাতা। রাতুল দাস, বালুরঘাট। অনুপকুমার সরকার, বালুরঘাট। অমিত দাস, কলকাতা। অজন্তা সরকার, কৃষ্ণনগর। সঙ্গীতা রায়, কলকাতা।

কথার কথা

বেনারসে ত কত জিনিসই পাওয়া যায়, তৈরিও হয়—সেগুলোর সবই ত বেনারসী, কিন্তু তবু বেনারসী বলতে আমরা সকলেই বুঝি একটি জিনিসকেই—সেখানকার সিল্ক শাড়ি! এই রকম জায়গার নাম থেকে অনেক জিনিসের নাম পাকাপাকিভাবে এসে গেছে ভাষার মধ্যে। সে কেবল আমাদের ভাষাতেই নয়, অন্য ভাষাতেও। যোধপুরে ছিল ইংরেজদের আমলে সৈন্যদের ঘোড়ায় চড়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র—সেখানে ঘোড়ায় চড়ার সুবিধের জন্য এক রকম প্যান্ট। এটা ওপরের দিকে ঢিলেঢালা, কিন্তু হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বেশ আঁটসাঁট। যোধপুরী বললে যোধপুরের আর কিছুই বোঝায় না, বোঝায় কেবল ঘোড়ায় চড়ার বিশেষ ধরনের পোশাক। আবার মাদুর বলতে আমরা বুঝি নারকেল পাতার চাটাই—কিন্তু আসলে আগে মাদুরই থেকে এই চাটাই আসত বলে এর নামই হয়ে গেছে মাদুর! বাটাভিয়া থেকে আগে এ দেশে আসত বড় বড় লেবু—তার নামই হয়ে গেল বাতাবী লেবু! আর মুসুম্বি? এও লেবু—কিন্তু এ কথাটা এসেছে দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকার মোজামবিক বা মুজামবিক থেকে! এই রকম আরও কত নাম আছে—যেমন পর্তুগালের ওপোরতো বন্দর থেকে যে ওয়াইড আসত তার নাম হয়ে গেছে পোর্ট ওয়াইন। একটু খেয়াল করলে এরকম নাম তোমরাও কিছু কিছু বার করতে পারবে।

বুদ্ধির খেলা

নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন সমস্যার জট খোলার মজা আলাদা। 'বুদ্ধির খেলা' বিভাগের অবতারণা এইজন্যই। এর প্রতিটি ধাঁধা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে ছোটরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে একটু ভেবে এর উত্তরগুলো বলে দিতে পারে। বড়দের সাহায্য নিতে হবে না। সময়, ধর প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ মিনিট। না পারলে, আরও ৩ মিনিট। পারলে আমাদের জানাও। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও উত্তর প্রকাশ করা হবে আগামী দ্বিতীয় সংখ্যায়।

১. কোন পাখিটিকে আলাদা করতে হবে ? কেন করছ আলাদা ?

ময়না	টিয়া	চন্দনা	যাত্রী পায়রা

২. কে বড়

এমু	অস্ট্রিচ

৩. কে ভিন্ন কেন ভিন্ন বলছ তাকে ?

এমু	অস্ট্রিচ	পেঙ্গুইন	শকুন	রেয়া

৪. কে আলাদা আলাদা হয়ে যাবার কারণটা কি ?

সিংহ	চিতা	হায়না	জাগুয়ার	জলহস্তী

৫. কোন ফুলটি পৃথক কেন পৃথক বলছ

সূর্যমুখী	জবা	করবী	রঙ্গণ

৬. কাকে ভিন্ন বলবে ? কেন

সেনটর	ড্রাগন	ইউনিকর্ণ	ওরাংওটান

৭. ভিন্ন কে ? কেন ?

স্যালামাণ্ডার	ক্যামেলিয়ন	কুমীর	ইগুয়ানা	শুঁয়াপোকা

৮. 'খ' ঘরের জীবদের মধ্যে কে 'ক'-এর কোন ঘরে যাবে।

ক	খ
অস্ট্রেলিয়া	ক্যাঙ্গারু
আফ্রিকা	ওকাপি
দক্ষিণ আমেরিকা	গরিলা
	কাকাতুয়া
	লামা
	আলপাকা

১৬ মে '৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধির খেলার উত্তর এখানে প্রকাশ করা হল।

১. নৈনিতাল, ইউরেনিয়াম, রামের সুমতি, হিরণ্যকশিপু
২. সঞ্জীবনী
৩. ক. ভৃগু, খ. শতদ্রু
৪. বল
৫. ডুবোজাহাজ

১৬ মে ৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধির খেলার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ঃ

ছায়া পান, চাকদহ। বনজা ভাদুড়ী, রহড়া। সুজয় চট্টোপাধ্যায়, বেহালা। চন্দন দে, শিবপুর। আদিত্য বর্মন, কলকাতা। পার্থসারথি দাস, বাঁকুড়া। অশোক চ্যাটার্জি, বেহালা। অতনু চট্টোপাধ্যায়, আসানসোল। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, মুর্শিদাবাদ। পুষ্পেন্দু চৌধুরী, আগরতলা। সুজয় দাস, শ্রীরামপুর। চন্দন পাল, তমলুক। রুম্পা বরাট, কলকাতা। সুব্রত রায়, কলকাতা। স্বরূপ ঘোষ ও অরূপ ঘোষ, উত্তরপাড়া। সুজাতা নন্দী, বাঁকুড়া। সৈকত রায়, কলকাতা। শুভ্রা চক্রবর্তী ও সুদীপ্ত চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর। লীলাবতী আগরওয়ালা, চাঁচল। সুকান্ত সরকার, ২৪ পরগণা। অংকিতা নাথ, দুর্গাপুর। স্বদেশরঞ্জন গোস্বামী, দুর্গাপুর। সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পরগণা। নীলাদ্রি সরকার, নৈহাটী। দিলীপ বাসুপ, দুর্গাপুর। সুব্রত পাল, কলকাতা। টুলটুল ভট্টাচার্য, কলকাতা। সোনালী শীল, বহরমপুর। সমীরণ ঘোষ, মুর্শিদাবাদ। শিউলি ঝা, বর্ধমান। প্রশান্ত সেনগুপ্ত ও স্নিগ্ধা সেনগুপ্ত, কল্যাণী। আশিস দেব, সাঁতরাগাছি। পুষ্পেন্দু লাহিড়ী, কলকাতা। নিরঞ্জন সাহা, কলকাতা। আইভি সেন, হলদিয়া। অরিন্দম সেন, ফুলেশ্বর। হারুকুমার দাস, হাওড়া। দোলন ও চঞ্চল নায়ক, বাঁকুড়া। অনন্যা পুরকায়স্থ, আসানসোল। সত্য-নারায়ণ দত্ত, বাঁকুড়া। আশিস দেব, বর্ধমান। সুরজিৎ কর, বালুরঘাট। নন্দিনী ব্যানার্জি, দুর্গাপুর। বোধিসত্ত্ব দাসগুপ্ত, শ্রীনিকেতন তাপসকুমার মণ্ডল, ২৪ পরগণা। পুলক চন্দ, মুর্শিদাবাদ।

●

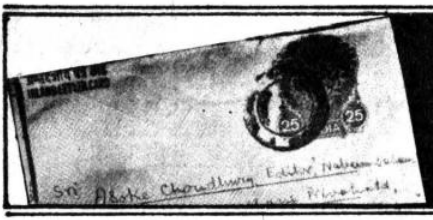

এবং জবাব

দেবাশিস নন্দী, জলপাইগুড়ি

● প্রথমেই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার নামের বানানটি শুদ্ধ লিখবার জন্য। বেশির ভাগ ছেলে 'দেবাশীষ' লিখে থাকে। নিজের নামটিতেই যারা ভুল করে, তারা যে জীবনে কত ভুল করবে এবং করছে তার হিসাব কে দেবে ?

● তুমি নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের রচনা ছবি ইত্যাদি ছাপাতে বলেছ। আমরা ত কোথাও বলিনি যে তা ছাপাব না। তবে 'হাত পাকাবার দপ্তর' গোছের কোন পাতা রাখবার ইচ্ছে আমাদের নেই। পাতা আমাদের অল্প। তার সবচেয়ে ভাল ব্যবহারই করতে চাই। দেখ না, এরই জন্য 'ইতিহাসের চোখে, এই পক্ষ' বাদ দিতে হয়েছে।

স্বাগত সরকার, উলুবেড়িয়া

● ভাই স্বাগত। কোন ব্যাপারেই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিও না। জ্যামিতি মুখস্থ হয় না—কেন ? আগে যুক্তিগুলো বুঝে নাও। বুদ্ধি এবং মন দুইকে একত্রে কাজ করাও। না বুঝে মুখস্থ করতে গেলে বিপদ বাড়ে—সময় নষ্ট হয়, কাজও হয় না।

এমন হতে পারে যে প্রথমটা বুঝতে সাতদিনের ক্রমাগত চেষ্টা লেগে গেল। কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। দেখবে, পরেরগুলো বুঝতে ক্রমেই কম সময় লাগছে। একটা সময় আসবে যখন আর মুখস্থ করা কোন সমস্যাই থাকবে না।

অশোক দে,
মাধব লেন, কলকাতা-২৫

● যতীন্দ্রনাথের কবিতার যে সামান্য অংশগুলো আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম তা তোমাকে আধুনিক কবিদের সম্পর্কে উৎসাহী করেছে জেনে খুবই খুশী হলাম। সাহিত্য পড়াবার অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হল সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী করা। তা আমরা পেরেছি।

'অনুলিখন'—কথাটির অর্থ বোঝনি ? অনেক সময় যাঁর কথা তিনি বলে যান, আর একজন সেটা লিখে নেন—কখনও বা ওঁর বক্তব্য পরিমার্জিতও করেন। এমন ব্যক্তিকে বলা হয় অনুলেখক। কাজটি হল অনুলিখন।

রজত মজুমদার, দুর্গাপুর

…আমাদের বিদ্যালয়ের 1st terminal examination হয়ে গেল ; রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। তাতে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমার ফার্স্ট হওয়ার পিছনে 'নবম দশমে'র অবদান অনেক।…

● তোমার এই সাফল্যের জন্য আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

●● এক এক বিদ্যালয়ে এক এক গতিতে পড়ায়। তাই সব বিদ্যালয়ের সঙ্গে কোথাও আমাদের পাঠনে মিলবে না। তবে যথাসময়ে আমরা সিলেবাস শেষ করব। তুমি উপযুক্ত সাফল্যও পাবে।

রজত ঘোষ, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা

● তোমার অভিযোগ সত্য। এজন্য বুদ্ধির খেলা ও সন্ধানী প্রতিযোগিতার

উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশের ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হল।

সুব্রত মহাপাত্র, বিনোদপুর

● ভাই সুব্রত। পাঠ সংকলনের পাঠগুলো পড়বার সময় সর্বদাই 'পরিচয় পঞ্জী' মিলিয়ে পড়া উচিত। তা যে তুমি পড়ছ, তোমার চিঠিটিই তার প্রমাণ। তবে তোমার সংশয়ের দায় সম্পূর্ণ পাঠ সংকলনের মুদ্রণ কর্তাদের। ওটা ওঁদের মুদ্রণ প্রমাদ। যে বই থেকে ভানুসিংহের পত্র নেওয়া হয়েছে, তা গদ্য গ্রন্থ; নাম 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' আর **'ভানুসিংহের পদাবলী'** হচ্ছে কবিতা (গান) গ্রন্থ।

আমাদের আলোচনা ভাল করে পড়লে তুমি পর্ষদের ভুলটা নিজেই ধরতে পারবে।

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর

● সালোকসংশ্লেষের আরও ডিটেলে তোমার কি প্রয়োজন? এ সম্পর্কে এক লাইব্রেরী বইও দেওয়া যায়। আমরা তোমাদের প্রয়োজনের জন্যই আয়োজন করেছি। অন্য যে বিষয়গুলোর কথা তুমি বলেছ তা যথাসময়ে আসবে। আমরা ছাত্রছাত্রীকে শেখাবার মত করে একটা সূচী স্থির করে এগুচ্ছি—কোনক্রমে কোর্স শেষ করা আমাদের লক্ষ্য নয়।

● তোমার বানান ভুল বড্ড বেশি। 'ভুল' বানানও অশুদ্ধ লিখেছ।

শুভেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, কলকাতা-১২

নব কিশলয়ে জ্ঞানের মলয়ে আমি
জাগাই শিহরণ
বড় করব দৃঢ় করব এবং করব জ্ঞানী—
এই মোর দৃঢ় পণ ॥
মজার ফানুস উড়াইয়া দেই—
জ্ঞানের আকাশে বাতাসে।
দন্তস্ফুটন তাই তো সহজ প্রশ্নে
অঙ্কে সমাসে।
শশীকলার মতন বেড়ে, হয় যেন সে
জ্ঞান ও গুণের ভাণ্ডারী।
মনুষ্যত্বের নৌকাখানার হোক না সে
পাকা কাণ্ডারী।

প্রেমাংশু দেব, দুর্গাপুর

● দুর্গাপুরে নবম দশম না পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। তবু যদি না পাও, তবে কেউ কলকাতায় এলে, তাঁকে আমাদের অফিস থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলো কিনে নিয়ে যেতে বল।

সোমেন চক্রবর্তী, বেলঘরিয়া

আমি লক্ষ্য করিতেছি যে নবম দশম বইখানি অনুসরণ করিতে গেলে আমাকে অন্যান্য বিষয়বস্তু এবং বিদ্যালয়ের পাঠে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার উপদেশ চাই।

● আমরা তোমাদের পাঠ্যসূচীকে সারা বছরের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে মোট ২০টি সংখ্যায় আলোচনা করব বলে স্থির করেছি। জুন এবং ডিসেম্বরের চার সংখ্যায় হবে পুনরনুশীলন। কিন্তু স্কুলে তা হয় না। পুজোর ছুটি, গরমের ছুটি, পরীক্ষার সময় ইত্যাদি বাদ দিলে সামান্য যে সময়টুকু স্কুল খোলা থাকে, সেই সময়ে তাঁরা কোর্স শেষ করতে চান। তাই ডান-বাঁ না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ন ছাড়া বিষয় শিক্ষকের উপায় থাকে না। এজন্যই স্কুলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা একেবারে এক হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব, তুমি বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাল রেখেই এগুবে। পরে নবম দশমে বনিয়াদ পাকা করবে। তোমার চিঠি গুরুচণ্ডালী দোষে বোঝাই। এ হলে যে একেবারেই পিছিয়ে পড়বে ভাই। ঐ দোষ মুক্ত হতে চেষ্টা কর।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সারগাছি

● তোমার স্কুলের মাস্টারমশাইরাও যে নমব দশমের এত গুণগ্রাহী তা জেনে খুবই আনন্দ হল। তুমি কোন লোক মারফৎ আমাদের অফিস থেকে সংখ্যা দুটি সংগ্রহ কর।

প্রবাল সেনগুপ্ত, যাদবপুর

● রাগ না করে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। তুমি যে কোন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র তার ইঙ্গিত কি তোমার পত্রে ছিল? এমন চিঠিকে আমরা কোন অভিভাবক বা বয়স্কের চিঠি না ভাবব কেন? জেন চিঠি এমনই হবে যে পত্র প্রাপক তার মাঝে তোমার সামগ্রিক মূর্তিটি দেখতে পাবেন। তোমার চিঠিতে সে গুণ ছিল না। অতএব পত্র লেখায় তুমি গোল্লা পেলে।

ভাই এখনই 'সমস্যা জর্জরিত সমাজের একটি সমস্যা' নিয়ে মাথা ব্যথা না করে আগে নিজেকে গড়, বড় হও, জান—তারপর শুধু 'সাধারণভাবে তুলে ধরা' নয় সমস্যা সমাধানে লেগে পড়। এখন তোমার সবটাই যে Mal-observation হয়ে যাচ্ছে।

সৈকত রায়, কলকাতা-৩৩

● পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক খবর যথাসম্ভব ত থাকছে।

তোমার পত্র পড়ে মনে হচ্ছে বহু বৈজ্ঞানিক খবর আমরা সংগ্রহ করতে পারছি না, এবং আমাদের এ অক্ষমতা তুমি ধরে ফেলেছ। এবার থেকে ঐসব বাদ পড়া সংবাদগুলো তুমিই লিখে পাঠাও না ভাই। আমরা ওগুলো দেখিয়ে আমাদের ফাঁকিবাজ সাংবাদিকটির নাকে ঝামা ঘষে দিই।

অরিজিৎ ঘোষ, রামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ, ইন্দ্রনীল সরকার, নন্দিগ্রাম, মেদিনীপুর, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর

● তোমাদের প্রশ্নের উত্তর 'এবং জবাবে' ইতঃপূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

জয়দীপ রায়, আন্দুল মৌড়ী, হাওড়া

● নবম দশম (১৬ এপ্রিল) কভার তোমার মনমত হয়েছে জেনে খুশি হয়েছি। ডাকটিকিট সংগ্রহ কি কি উপায়ে সম্ভব তা'ত আমাদের প্রবন্ধেই বলা হয়েছে। ভাল করে পড়ে নাও। তবু কলকাতার কয়েকটি জায়গার নাম করছি যেখানে ডাকটিকিটের দোকান আছে। গ্রাণ্ড হোটেলের আশেপাশে একটি দোকান আছে, চাঁদনী চকেও দুটি বিক্রয়কেন্দ্র আছে, এছাড়া GPO-র সামনে প্রায় প্রত্যেক দিন ফুটপাতে কিছু Stamp dealer বসে। নতুন ডাকটিকিট প্রকাশের দিন এদের সংখ্যা বাড়ে। তাছাড়া ভারতীয় ডাক-টিকিটের জন্য GPO-তে অবস্থিত ফিলাটেলিক ব্যুরো ত শুধু তোমাদের মতন সংগ্রহকারীদের সাহায্য করতেই খোলা হয়েছে, সেখানে গেলেই অনেক কিছু জানতে পারবে।

দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড প্রেস ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩ (ফোন ২৪-৫৫২০) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭২ (ফোন ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১) থেকে প্রকাশিত।

শিলাদিত্য

বিমল করের সম্পাদনায়

আগামী জুনে শিলাদিত্য-র সম্পাদকের দায়িত্ব নিচ্ছেন একালের বিখ্যাত কথাশিল্পী বিমল কর। আর জুলাইয়ে শিলাদিত্য পড়ছে দ্বিতীয় বর্ষে। বিমল কর তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে শিলাদিত্যকে নতুন করে সাজাবেন দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ জুলাই থেকে। বিষয় বৈচিত্র্যে, অঙ্গ সজ্জায় শিলাদিত্য পাঠকের কাছে চমক আনবে।

পাঠকরা আজই স্টলে বা হকারকে বলে রাখুন।

M DASAM 16 June 1982 Registration No. 37807/82 WB/CC 164 Rs. 5·

রত্নখচিত টিকলির মত দেখতে
গভীর সমুদ্রের এক বিচিত্র
কিন্তু বিষাক্ত প্রাণী।